প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮

পি. কে. বোস য়্যাণ্ড কোং, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা—৩১ হইতে প্রফুল্ল
কুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিচয় প্রেস, ৮বি দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা হইতে শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক মুদ্রিত

নিবেদন

তোমাকে স্মরণ করে, আমার এই গ্রন্থের সূচনা হলো।

পৃথিবীর এপারে হোক্ কিম্বা ওপারে, যেখানেই থাক, তোমাকে প্রণাম।

·

প্রণাম তোমাকে, বাংলার যৌবনের হে দিব্য দীপ্তবিকাশ,—

যেদিন তোমার এই জন্মভূমি···নেতাহীন, পরিচালকহীন,

যেদিন বাংলার প্রতিভা ম্লান মুমূর্ষু হয়ে ভারতের অন্য প্রদেশের মুখের দিকে অসহায়ভাবে চেয়ে ছিল,

যেদিন বাংলার নাম, বাঙালীর নাম, লোকে উপহাস করে উচ্চারণ করতে আরম্ভ করেছে···যেদিন আতঙ্কে, অবিশ্বাসে, আত্মকলহে, লোভে, মোহে, চৌর্য্যে, অপবাদে, অগ্নিদগ্ধ ভীরু মেষ-শাবকের মত তোমার স্বদেশবাসী পরস্পর পরস্পরকে পদ-দলিত করে কোন রকমে জীবন-ধারণ করে থাকবার উদগ্র কুৎসিত আগ্রহে উন্মত্ত,

সেদিন, সেই নিদারুণ লজ্জার হাত থেকে, জাতীয় আদর্শের ঘোর বিচ্যুতির দৈন্য থেকে, সমগ্র জাতির সমষ্টিগত দৈন্যের, ভীরুতার, অসহায়তার অধঃপতন থেকে,

তুমি একা, তোমার চরিত্রে, তোমার কর্ম্মে, তোমার বাচনে, তোমার পরম-আহ্বানে, তোমার জন্মভূমির মর্য্যাদাকে রক্ষা করেছ, তোমার স্বদেশবাসী সকলের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছ···

মহা-অপমৃত্যুর হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করেছ। বিশীর্ণ তারুণ্যের অকাল-জরা বিমোচন করে, বাংলার তারুণ্যকে আবার নব-যৌবনের মহিমায় সঞ্জীবিত করে তুলেছ, তোমাকে প্রণাম! কোটি কোটি প্রণাম!

সুভাষচন্দ্র

প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে এমন একটা লগ্ন আসে, যখন একটি মানুষের মধ্যে সমগ্র জাতি আবার বেঁচে ওঠে।

বাংলার ইতিহাসের সেই মহা-লগ্নে, তুমি সেই একটি মানুষ···

প্রত্যেক বিপন্ন জাতির জীবনে, শত সহস্র নামের মধ্যে, একটি নামে অসঙ্কোচে সকলে সাড়া দিয়ে ওঠে।

বাংলার এই বিপন্ন জীবনে তুমি সেই একটি নাম ঃ

যে-আশা সকলের মনে মূক হয়ে পড়ে ছিল···যে-স্বপ্ন ভয়ে কেউ করেনি প্রকাশ···যে-কথা অব্যক্ত হয়ে কোটি চিত্তে ঘুরে মরেছে, অথচ পায়নি বাণী-রূপ···যে পথ ছিল অন্ধকারে ঢাকা, পড়েনি যাতে কারুর চরণ-চিহ্ন—সে-আশাকে তুমি করেছ সফল···সে-স্বপ্নকে তুমি করেছ সত্য, সে-অব্যক্ত অন্তরকে প্রাণের শঙ্খে তুমি করেছ বাঙ্‌মুখর, সে-পথে পড়েছে তোমারই বলিষ্ঠ চরণ-চিহ্ন···

দিল্লীর পথে তোমার আহ্বান···ভারতের ইতিহাসের আহ্বান··· তোমার স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরই বিজয়-আহ্বান···

তোমার মধ্যে পেয়েছে সে সত্য-প্রকাশ, তোমাকে প্রণাম···কোটি কোটি প্রণাম!

তোমার মৃত্যু-সংবাদে সমস্ত জাতি আজ মুহ্যমান।

মুহ্যমান অন্তর বিশ্বাস করে না সে-সংবাদ!

তুমি জীবিত আছ···তুমি আবার একদিন আবির্ভূত হবে··· এই আশায় সমগ্র জাতি আজ সমস্যাসঙ্কুল মহাদুর্দ্দিনে পথ চেয়ে আছে।

তোমার যে-জন্মভূমিকে অপমৃত্যুর হাত থেকে তুমি রক্ষা করেছ, সে-দেশ আজ আবার অনায়াস লোভের আর অলস আত্মদ্বন্দ্বের খেলায় নিজেকেই নিজে বিপন্ন করতে চলেছে,

যুগ-সিন্ধু মন্থন করে উঠেছে আজ মহা-হলাহল, এ হলাহলে দেবতা দৈত্য দুই-ই হয়ে যাবে নিঃশেষ, তাদের কারুরই নেই শক্তি সে-বিষকে নিষ্ক্রিয় করতে, একমাত্র নীলকণ্ঠ তুমি···তুমিই পার আত্মস্থ করতে এই কাল-কূটকে···

তাই আজ দেবতা ও দৈত্য, দুই-ই আর্ত্ত চীৎকারে তোমাকেই আহ্বান করছে, এসো, এসো, হে নীলকণ্ঠ মহাপুরুষ!

এসো হে তরুণ বাংলার মুকুটহীন রাজা!

(১)

পাঁচ বৎসরের শিশু আজ প্রথম স্কুলে ভর্ত্তি হবে। তার আনন্দ দেখে কে ?

প্রতিদিন তার অগ্রজেরা তাকে বাড়ীতে রেখে স্কুলে চলে যায়··· বাড়ীতে সে পড়ে থাকে দলভ্রষ্ট একলা। আজ···সে তাদের সমকক্ষ হ'তে চলেছে···

সেজেগুজে স্কুলে যাবার জন্যে শিশু প্রস্তুত হয়েছে। বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়ে স্কুলের নতুন জগতে পদার্পণ করবার জন্যে অন্তরে তার দুর্বার কৌতুহল।

বাইরে গাড়ী প্রস্তুত।

আনন্দের আতিশয্যে শিশু ছুটতে আরম্ভ করে। কিন্তু গাড়ীর কাছে পৌছবার আগেই পা পিছলে পড়ে যায়। কপাল কেটে রক্ত ঝরে পড়ে। তাড়াতাড়ি বাড়ীর লোকেরা এসে শিশুকে বিছানায় টেনে নিয়ে যায়। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের বেদনা নিয়ে শিশু শুয়ে থাকে। বিছানা থেকে শুনতে পায় সৌভাগ্যবান্ অগ্রজদের নিয়ে গাড়ী সশব্দে চলে গেল।

নতুন পৃথিবীর প্রবেশ-মুখে এলো ব্যাঘাত।······

পরের দিন ধীর মন্থর গতিতে সাবধানে শিশু গাড়ীতে বসলো।

কটকের প্রোটেষ্টাণ্ট য়ুরোপীয়ান্ স্কুলের দ্বারদেশে শিশুকে পৌঁছে দিয়ে গাড়ী ফিরে এলো।

মিশনারীদের স্কুল...ইংরেজ শিক্ষক। স্কুলের ছেলেরা সব ইংরেজীতে কথা বলে। শিশু সুভাষচন্দ্রের মনে আশঙ্কা জাগে, ইংরেজীতে কি করে সে কথা বলবে? কিন্তু আর সব ছেলেরা যখন বলছে, সে বলতে পারবে না কেন?

আত্মমর্য্যাদাবোধে আঘাত লাগে।

কাগজ নয়, শ্লেট আর শ্লেট পেনসিল্। ঘসে ঘসে পেনসিলের ডগা সরু করে নিয়ে লিখ্তে হয়। পাশেই ছোট মামা রণেন্দ্র। সমবয়সী। শ্লেটে লেখবার জন্যে দুজনে পেনসিল সরু করবার কসরৎ করছে। এমন সময় মিশনারী শিক্ষক দেখতে এলেন, তারা কি করছে। ইংরেজী বলবার উৎসাহে শিশু সুভাষচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধ ইংরেজীতে শিক্ষককে বিস্মিত করিয়ে বলে উঠলো, রণেন্দ্র মোট্ আই সোর্!

মোটা-কে 'মোট্' আর সরু-কে 'সোর' করে শিশু সুভাষচন্দ্র ইংরাজ-শিক্ষককে জানিয়ে দিল যে বিশুদ্ধ ইংরেজী বলতে সে অপারগ নয়!

কিন্তু পড়ার চেয়ে খেলাধূলার দিকেই মিশনারী স্কুলে শিক্ষকেরা বেশী নজর দেন। তার চেয়ে বেশী নজর দেন, ছাত্রের স্বভাব-চরিত্র, রীতি-নীতির ওপর। বাংলা ভাষা ভোলার ক্ষতিটুকু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জ্জনে পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু বাংলাভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভুলতে হয়, নিজের দেশের ইতিহাসের কথা, পড়তে হয় রাজার দেশ ইংলণ্ডের ইতিহাস; শিখতে হয় ভাল করে রাজার ভাষা। রামায়ণ মহাভারতের বদলে রোজ পড়তে হয় বাইবেল। এবং শেষোক্ত ব্যাপারটী শিশু ভালভাবে পরিপাক করতে পারে না। বাইবেল শুধু পড়া নয়, বোঝ আর নাই বোঝ মন্ত্রের মতন মুখস্থ করতে হবে। বাইবেল সম্বন্ধে এইভাবে শিশুর মনে যে আতঙ্ক জেগে ওঠে,

পরে পরিণত বয়সে যতক্ষণ না তার অন্তর্নিহিত বেদনার মহাকাব্য উপলব্ধি করতে শিখেছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তা স্থায়ী হয়ে থাকে।

তার ওপর ছিল, প্রতিদিন গড্ সেভ্ দি কিং!

বিপ্লবীর মানসিক-শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত আবহাওয়া।

শৈশব দিনের সম্পূর্ণ সাতটি বৎসর অতিবাহিত হয় এই বিরূপ জগতে। যে-বৃক্ষের সুকুমার শিকড়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল নরম গঙ্গামাটীর, তাকে সাত বছর ধরে পাথুরে কাঁকর থেকে রস-আহরণের বৃথা চেষ্টা করতে হয়।

(৩)

ক্রমশ বালকের অনভিজ্ঞ দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে সেই মিশনারী স্কুলের মধ্যে দুটো আলাদা জগৎ। একটা জগৎ হলো সে আর তার মতন ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে আর একটা জগৎ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আর খৃষ্টান ছাত্রদের নিয়ে। মিশনারীরা যতই কেন উদার হয়ে সকলকে এক পিতৃ-বক্ষে টেনে নেবার আহ্বান ঘোষণা করুক, বালক সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারে, কোথায় যেন একটা মস্ত বড় তফাতের পাঁচিল তাদের আলাদা করে রেখেছে। খুব স্পষ্টভাবে তার চেতনা জাগে না কিন্তু মনের মধ্যে তার অস্পষ্ট আলোড়ন একটা দাগ রেখে যায়। বৃত্তি পরীক্ষার জন্যে ভারতীয় ছাত্ররা বসতে পারে না, যদিও ক্লাসের পরীক্ষায় তারাই প্রথম স্থান অধিকার করে। ভলান্টিয়ারের দল আছে কিন্তু সে-দলে ভারতীয় ছাত্রেরা যেতে পারে না। এইভাবে একই স্কুলের মধ্যে দুটো দল স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মধ্যেমধ্যে রীতিমত ঘুষোঘুষিতে এই দুদলের শক্তি-পরীক্ষা হয়ে যায়।

বালক সুভাষচন্দ্র কিন্তু এই ঘুষোঘুষির বাইরে দাঁড়িয়ে তার ফলাফল লক্ষ্য করে। খেলাধূলা বা ঘুষোঘুষিতে সে যোগদান করতে পারে না। তার মন যায় না। তার জন্যে অবশ্য সহ-পাঠীরা ব্যঙ্গ করে! ফলে নিজের সম্বন্ধে বালকের ধারণা ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসে। নিজের অযোগ্যতার কথা ভেবে বালক মনে মনে বিমর্ষ হয়ে ওঠে। মনে হয়, সে যেন সকলের ছোট, সকলের চেয়ে অপদার্থ। নিজের সম্বন্ধে নিজের এই ধারণায় সে ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। ভাল লাগে না এই অজানা পরিবেশ।

সাহেবী-পোষাক-পরা ছাত্রের দল—বাইবেল্...গড্ সেভ্ দি কিং...
ক্রমশ শিশু প্রতিবাদ জানাতে সুরু করে।

অকারণ আবদার মনে করে জান্কী-সাহেব তা কাণে তোলেন না। যদি মানুষ হতে হয়, তাহলে পাকাপাকিভাবে ইংরেজী-শিক্ষা আয়ত্ত করতে হবে...এবং তার জন্যে ছেলেবেলা থেকেই চেষ্টা করা দরকার। এবং এই মিশনারী স্কুলের পরিবেশই তার উপযুক্ত ক্ষেত্র —এই জাতীয় ধারণাই জানকী-সাহেবের ছিল।

দেশী-স্কুলের অতি-সাধারণ ছেলেদের গড্ডালিকা স্রোতের মধ্যে জানকী-সাহেব তাঁর ছেলেকে ভাসিয়ে দিতে চান না।

তাই বিশেষ করে লক্ষ্য রাখেন, স্কুলের বাইরে তথাকথিত পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে যাতে সুবি না মেশে।

তাই শিশুর প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয় না।

কিন্তু শিশুও ক্রমশ জিদ্ ধরলো, ও স্কুলে আর সে যাবে না।

তার নরম শেকড় সেই কাঁকর থেকে বিন্দুমাত্র রস আহরণ করতে পারছে না।

অবশেষে একদিন শিশুর জিদই বজায় রইলো। জানকী সাহেব তাকে র‍্যাভন্‌স কলিজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

প্রথম শৈশবের সেই সাতটী বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে যেদিন বালক সুভাষ দেশী স্কুলে চলে এলো, সেদিন সেই সাত বছরের পরিচিত জগৎকে ত্যাগ করে আসতে শিশু মনে কোথাও এতটুকু বেদনার কম্পন দেখা গেলো না, এই সাতবছরের মধ্যে সেখানে তার একটীও বন্ধু গড়ে ওঠে নি, যার জন্যে তার মন-কেমন-করবে।

কলিজিয়েট স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে বালকের মুখে সহজ হাসি ফুটে ওঠে।

যে-গাছের যে-মাটী···

(৪)

মাতৃ-মৃত্তিকার স্পর্শ পেয়ে তরুণ চারা সচেতন হয়ে ওঠে।

কিন্তু নতুন পরিবেশের মধ্যে এসে বালক দেখে, আশে-পাশের ছেলেদের সঙ্গে বাইরের দিক থেকে তার একটা মস্তবড় তফাৎ রয়ে গিয়েছে। তার সাহেবী পোষাক।

আর সব ছেলের পরণে কাপড় আর আধ-ময়লা শার্ট, সে-ই শুধু আসে ধোপ দোস্ত প্যাণ্ট আর কোট পরে।

এ তফাৎ তার ভাল লাগে না।

সে নিজেই নিজের পোষাক পরিবর্ত্তিত করে স্কুলে আসে যায়।

হঠাৎ একদিন জানকী-সাহেবের নজরে তা পড়তে তিনি ছেলেকে ডেকে এই-হঠাৎ-বেশ-পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

বালক শক্তি-সঞ্চয় করে উত্তর দিল, এই পোষাকেই তো স্কুলের অন্য ছেলেরা আসে! এই তো আমাদের পোষাক!

পুত্রের উত্তরের ভঙ্গীতে পিতা আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

এই ব্যাপার সম্পর্কে তাঁর বন্ধু রায়বাহাদুর গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলীকে বলেছিলেন, সুবি এমন ভাবে কথাটা বল্লো যে তার কথাতেই আমাকে সায় দিতে হলো!

রায়বাহাদুর হেসে বল্লেন, উঠন্তি গাছ পত্তরেই চেনা যায়! সুবিকে লক্ষ্য করে যাবেন!

(৫)

কিন্তু নতুন পরিবেশের মধ্যে এসে পড়ে সুবিকে প্রথম প্রথম বড়ই অপ্রস্তুত হতে হতো। মিশনারীদের স্কুলে বাংলা ভাষার প্রবেশ নিষেধ ছিল, সেখানে কোনরকমে বালক মোটাকে 'মোট্' করে আর সরুকে 'সোর'-করে নিজের মর্য্যাদা বজায় রেখেছিল, কিন্তু এখানে এসে উল্টো বিপত্তি হলো। মাষ্টার মশাই গরু সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে দিলেন। প্রবন্ধটী যখন মাষ্টার মশায়ের হাতে গিয়ে পড়লো, তিনি পড়েই হেসে উঠলেন। এমন বিচিত্র বানান আর বাংলা-ভাষা ইতিপূর্ব্বে তিনি আর দেখেন নি। তাই ক্লাসের ছেলেদের শোনাবার লোভ তিনি সম্বরণ করতে পারলেন না! ক্লাস শুদ্ধ ছেলে হেসে উঠলো। বালক সুভাষচন্দ্রের মাথা লজ্জায় নত হয়ে গেল।

সেইদিন থেকে বালক মনে মনে কঠিন পণ নিলো, যেমন করে হোক্ এই নিদারুণ লজ্জার হাত থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে হবে। সাত বছর ধরে মিশনারীরা মাতৃভাষা ভোলোবার জন্যে যে চেষ্টা করেছিল তাকে রাতারাতি তো আর ব্যর্থ করে দিতে পারা যায় না।

স্বভাবতই খেলাধুলায় বালকের কোন বিশেষ আকর্ষণ ছিল না,

সেইজন্যে সহপাঠী-মহলে সে নিজেকে খানিকটা অপদার্থ মনে করতো, তার ওপর বাংলা ভাষার এই দৈন্যের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ায় নিজের সম্বন্ধে তার প্রত্যয় ক্ষীণ হয়ে এলো। এই ত্রুটি সংশোধন করবার জন্যে বালক উঠে-পড়ে লেগে গেল। সে-বছর বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল যখন প্রকাশিত হলো তখন, আশ্চর্য্যের ব্যাপার, দেখা গেলো যে সেই অদ্ভুত মিশনারী-বাংলার প্রবন্ধলেখকই বাংলায় সব চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে।

বালকের আত্ম-প্রত্যয় ক্রমশ ফিরে আসতে লাগলো।

এই আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবের দরুণ বালককে নিজের মধ্যে সেদিন প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়। তার সমগ্র কিশোর-কালের ইতিহাস হলো, এই হারানো আত্ম-প্রত্যয় পুনরুদ্ধারের ইতিহাস। একদিন যে-বালক নিজেকে অসহায় ও অপারগ বিবেচনা করে মনে অসীম যন্ত্রণা পেতো, ক্রমশ সে নিজের চেষ্টায় ভেতর থেকে আত্ম-বিশ্বাসের স্থির শক্তি অর্জ্জন করেছিল। যে ছিল প্রধানত পরমুখাপেক্ষী, অবনত আর লাজুক ক্রমশ সে হয়ে উঠলো আত্মবিশ্বাসী বলিষ্ঠ, বিদ্রোহী·····

এই আত্ম-প্রত্যয় হারাণোর ইতিহাসের মূলে, এমন একটী বিষয় আছে, যা প্রত্যেক বাঙালী শিশুকে তার জীবন-আরম্ভের মুখে ভোগ করতে হয়। মস্ত বড় একটা সামাজিক রীতির ত্রুটি···যা মনোহর ছদ্মরূপে মাতৃ-ক্রোড় থেকে বাঙালী শিশুকে সকলের অগোচরে আক্রমণ করে···এবং যার দন্তহীন আঘাতের চিহ্নহীন বিষ পরিণত জীবনের বহু অধ্যায়কে সংগোপনে পঙ্গু করে দেয়। সেই সনাতন সামাজিক রীতি হলো, ছেলে-ভুলোনো ছড়া আর ঘুম-পাড়ানো ভূতের ভয়।

বাঙালী শিশু যখন মাতৃ-ক্রোড় থেকে মাটির পৃথিবীতে পদার্পণ করে, তখন থেকেই তার মনের পেছনে ছায়ার মতন ঘুরতে থাকে অশরীরী প্রেতাত্মার ভয়, তখন থেকেই তার মনের পেছনে ধ্বনিত হতে থাকে ঘুমপাড়ানি বর্গীর ভয়ের সুর। বালক সুভাষচন্দ্রকেও একদিন এই ভূতের ভয় রীতিমত তাড়া করেছিল এবং তাঁর শৈশব আর কৈশোরের আত্মপ্রত্যয়ের অভাবের মূলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল এই অশরীরী ভয়ের ছায়া।

তাঁদের বাড়ীর সামনে একটা বৃহৎ বট ছিল। বাড়ীর অভিভাবিকা এবং পরিচারিকারা সকলেই বালককে বিশেষভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে, বালককে শাস্তি দেবার জন্যে ঐ গাছেতেই বিশ্বের যত ভূত-প্রেত যে যার মারণ-অস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বালকের আদি চেতনার প্রান্তরভূমিতে বহুদিন ধরে সেই পুরাতন বৃহৎ বট বিপুল ভয়ের প্রতীকরূপে জীবন্ত দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে উৎপাটন করতে কিশোরকে অনেক নিঃশব্দ সংগ্রাম করতে হয়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, একদিন মহাত্মা গান্ধীকেও বালক-কালে এই অশরীরী ভয় সন্ধ্যার অন্ধকারে একলা ঘরে থাকতে দিতো না; বালিকা বধূর কাছে এই ত্রুটি ধরা পড়বার একান্ত লজ্জায় গান্ধীজী অবশেষে বাড়ার বৃদ্ধা পরিচারিকার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন এবং সেই পরিচারিকা তাঁকে রাম-নামের রক্ষা-কবচের সঙ্গে প্রথম পরিচিত করিয়ে দেয় যার ফলে তিনি সেই ভয়ের হাত থেকে নিজেকে অবশেষে উদ্ধার করতে পারেন। সুভাষচন্দ্রকেও এই ভয় বহুদিন পর্য্যন্ত তাড়া করে বেড়ায়। তিনিও অবশেষে একদিন বিবেকানন্দের অভয়-বাণীর রক্ষা-কবচের সন্ধান পেয়ে, এই ভয়ের হাত থেকে রক্ষা পান।

তাই দেখি, সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে এই "ছেলে-ঘুমুলো পাড়া-জুড়োলো" ছড়ার সনাতনী সুরের বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষ ভাবে সজাগ করে দিয়েছেন।

৬

সুভাষচন্দ্রের বয়স তখন বারো। যাকে আমরা সাধারণত বলি 'ভাল' ছেলে, সুভাষচন্দ্র অক্ষরে অক্ষরে তাই ছিলেন। মুখ তুলে জোরে কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারতেন না। স্বভাবতই খুব কম কথা বলতেন। বাড়ীর কড়া শাসন ছিল, যাতে পাড়ার যা-তা ছেলের সঙ্গে না মেশেন। মিশতেন না। মেশবার সুযোগ জুটতো না কারণ খেলাধূলোর মাঠে যেখানে স্বভাবতই ছেলেদের মন ছুটে যায়, সেই খেলাধূলোর প্রতি তাঁর বিশেষ কোন স্বাভাবিক প্রীতি ছিল না। প্রীতি থাকলেও যে খেলার মাঠে হুল্লোড় করতে যেতে পারতেন, তা নয়।

দাদারা অবশ্য শাসনের বেড়া ডিঙ্গিয়ে যেতেন, কিন্তু একান্ত

সতর্কভাবে বাবা-মাকে লুকিয়ে। বালক সুভাষচন্দ্র তখন বাড়ীতে থেকে মা-বাপের সুবোধ ছেলের মতন বাড়ীর বাগানে ফুলগাছ নিয়ে খেলা করতেন। এবং সন্ধ্যে হলেই ভাল ভাল সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করতেন, যে-সব শ্লোকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ছেলেদের ঘরমুখো করবার জন্যে ভাল-ছেলের একটা বিশিষ্ট আদর্শ প্রচার করে গিয়েছেন। সুশীল-সুবোধ বালক তৈরী করবার সেই সংস্কৃত শ্লোকগুলি বালক একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মুখস্থ করতো এবং সেই মত চলবার প্রাণপণ চেষ্টা করতো।

সেই সব শ্লোকের মধ্যে যে শ্লোকগুলি বালককে সব চেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত করে, তাতে বলা হয়েছে যে, পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, এবং পিতাই পরম তপস্যা এবং পিতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে সকল দেবতাকে সন্তুষ্ট করা হয়। বালক অক্ষরে অক্ষরে এই শ্লোককে সত্য বলে ধরে নিয়েছিল এবং সেইজন্যে পিতার অবাধ্য হয়ে বাড়ীর বাইরে বেরুতে চাইতো না। সব সময়ই বালক চেষ্টা করতো যাতে পিতামাতার অবাধ্য না হতে হয়। তাই বাড়ীর বাগান আর চাণক্য শ্লোক নিয়েই সুবোধ সুশীল বালক সন্তুষ্ট ছিল।

তার ফলে সেই অল্প বয়স থেকেই বালকের দৃষ্টি বাইরের জগৎ থেকে সরে এসে তার নিজের মনের ভেতর প্রতিফলিত হয়। সেই অল্প বয়সে, যখন অধিকাংশ ছেলে মনের অস্তিত্বের কোন খবর রাখে না, সুভাষচন্দ্র একলা বাড়ীর মধ্যে একা সেই মনের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠলেন।

প্রকৃতির নিগূঢ় খেয়ালে এক একটা গাছের ফল সময়ের বহু আগেই পরিপক্ক হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্রও এক নিগূঢ় ভবিতব্যতার নির্দ্দেশে সেই অল্প বয়সে দার্শনিকের মতন নিজের মনের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন। এবং সেই বয়স থেকেই তিনি নিজে মনের মধ্যে বাস করতে শিখেছিলেন। সাধারণ ছেলে যখন খেলাধুলো আর দুরন্তপণায় মত্ত থাকে, বালক সুভাষচন্দ্র তখন অতিবিজ্ঞের মতন কি করা উচিত, কি করা অনুচিত, এই নিয়েই বিব্রত হয়ে পড়তেন। জল যেমন স্বভাবতই আধার অন্বেষণ করে, এই জাতীয় মন তেমনি

স্বভাবতই একটা জীবন্ত আদর্শের অনুসন্ধান করে—যাকে আশ্রয় ক'রে, যাকে অবলম্বন ক'রে সে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় অগ্রসর হতে পারে।

নতুন স্কুলে প্রবেশ করার সঙ্গেসঙ্গে বালকের কানে নানাদিক থেকে একটি নাম বারেবারে এসে পৌঁছয়, স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নাম, বেণীমাধব দাশ। বালক যে-শ্রেণীতে এসে ভর্ত্তি হলো, সে-শ্রেণীতে প্রধান শিক্ষক পড়াতে আসতেন না। তাই দূর থেকেই তাঁকে দেখতে হতো। কিন্তু সেই দূর থেকে দেখার মধ্যে দিয়েই বালকের মনে একটা তড়িৎ-সংযোগ হয়ে যায়। সেই সৌম্য-দর্শন লোকটি নিঃশব্দে বালকের অন্তরকে আকৃষ্ট করে।

বাংলাদেশে স্কুল-শিক্ষকের প্রাণহীন জগতে মাঝে মাঝে এক-আধজন লোক এসে পড়েছেন, যাঁরা সেই ধন্যবাদহীন অন্নহীন বৃত্তির ঊর্দ্ধে নিজেদের মনকে বাঁচিয়ে রাখতে শিখেছিলেন, যাঁরা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ অনুযায়ী ছাত্রের মনের দায়িত্বকে স্বচ্ছন্দে সানন্দে বহন করতেন বেণীমাধব ছিলেন সেই স্বল্পসংখ্যক নামহীন কৃতীপুরুষদের একজন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে সুভাষচন্দ্র যখন বেণীমাধবের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এলেন, তখন আধার-সন্ধানী কিশোর মন উদ্‌গ্রীব আগ্রহে বেণীমাধবকেই তার চরম আদর্শ বলে গ্রহণ করে নিলো। বেণীমাধবও সেই স্বল্পবাক্ ছাত্রের অনুরাগ-প্রবল অন্তরকে স্বচ্ছভাবে দেখতে পেলেন এবং নিজের সমস্ত আদর্শ-অনুরাগ দিয়ে সেই কিশোর ছাত্রের অন্তরকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। এতদিন অবলম্বনহীন যে লতা গতিহীন হয়ে পড়ে ছিল, আশ্রয়-অবলম্বন পেয়ে তা গতিশীল হয়ে উঠলো। জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে, মানুষের চরিত্রের একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে, সুপবিত্রতার একটা নিজস্ব চরম দাবী আছে জীবনের ওপর, এই সব নীতি জীবন্ত বাণীর মতন গুরুর কাছ থেকে শিষ্যের অন্তরে প্রবেশ করে, প্রভাব বিস্তার করে। সেই কিশোর বালক চরম সত্যের মতন সেই সব নীতিকে গ্রহণ করে এবং সেই নীতির আদর্শে জীবনকে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়। জীবনের মধ্যে সুরু হয় এক নব-উজ্জীবন।

যখন গুরু-শিষ্যের এই সম্বন্ধ নিবিড় হয়ে উঠেছে, হঠাৎ সেই সময়ে এলো বেণীমাধবের কর্ম্মান্তরের আদেশ, কটক ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে

হবে। এই সংবাদে সেদিন কলিজিয়েট স্কুলের বহু ছাত্রের মন বেদনাতুর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সকলের চেয়ে ব্যথিত হয়ে ওঠে কিশোর সুভাষচন্দ্রের মন।

বেণীমাধবকে বিদায়-অভিনন্দন জানাবার জন্যে ছাত্ররা সমবেত হয়েছে। তাদের স্নেহ-সম্ভাষণের উত্তরে বেণীমাধব অশ্রু-নিরুদ্ধ কণ্ঠে বিদায়-অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণের শেষে বল্লেন, যাবার সময় শুধু ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানাই, তিনি তোমাদের কল্যাণ করুন।

সভার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের চোখ অশ্রু-উদ্বেল হয়ে উঠলো। বাষ্পের আকারে সমস্ত কান্না কণ্ঠে এসে জমা হলো। পাছে কেউ দেখে ফেলে সেইজন্যে বহুচেষ্টায় উদ্গত-প্রায় অশ্রুকে বালক রোধ করলো। সভা-অন্তে বারাণ্ডা দিয়ে যাবার সময় বালক দেখে বেণীমাধব স্থির হয়ে একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন, হঠাৎ গুরু-শিষ্যের দৃষ্টি-বিনিময় হতে এতক্ষণের নিরুদ্ধ অশ্রু বন্যার মত বালকের চোখ ভেঙ্গে ঝরে পড়ে...নীরবে বেণীমাধবের চোখ দিয়েও অশ্রু ঝরে।

৭

সেই স্কুল...সেই সব ছাত্র...কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মনে হয় একজন মানুষের অভাবে সব যেন হঠাৎ বদলে গিয়েছে। পড়াশোনা, পরীক্ষা সব যেন কঙ্কালের মতন বিঁধতে থাকে।

নিঃশব্দে গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেদিনের বিদায়ে তা কিন্তু ছিন্ন হয়ে গেল না! পত্রের মধ্যে দিয়ে সুভাষচন্দ্র বেণীমাধবের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখলেন। বেণীমাধবও পত্রের সাহায্যে ছাত্রের জাগ্রত মনকে দূর থেকে পরিচালনা করতে লাগলেন। নতুন নতুন আদর্শের অনুপ্রেরণায় তিনি কিশোর ছাত্রের মনকে সজাগ করে তুলতে লাগলেন।

শিষ্য উদ্গ্রীব আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে গুরুর পত্রের জন্যে। গুরু লেখেন, প্রকৃতিকে ভালবাস...ভাল করে প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখ...সেখানে দেখতে পাবে চরম সৌন্দর্য্যের বিকাশকে...প্রকৃতির কোলে নিজেকে দাও ছেড়ে!

শিষ্য নিষ্ঠাসহকারে সেই বাণীকে অনুসরণ করে। সহপাঠীদের

সঙ্গ ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় অরণ্যে, বনে, পুষ্পিত উদ্যানে। তার গ্রহণ-উন্মুখ মন প্রকৃতির মনোরম নিঃসঙ্গতার মধ্যে খোঁজে অন্তরের আনন্দের উপকরণ।

কিন্তু সহসা শৈশবের সেই সুস্নিগ্ধ জগতে কোথা থেকে দেখা দেয় এক নতুন অনুভূতি, জেগে ওঠে এক তীব্র অগ্নি-শিখার জ্বালা, নিজেকে ক্ষয় করবার অসহ্য আনন্দ। জীবনের প্রথম যৌন-চেতনা। একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দের ইঙ্গিতে কেঁপে ওঠে দেহমন। সমস্ত মাংস-পেশী সেই সদ্য-জাগ্রত চেতনায় ভারাতুর হয়ে ওঠে। সেই অব্যক্ত অসহ্য ভার থেকে নিজেকে আনন্দে মুক্ত করে পুনরায় সেই-অভিজ্ঞতার পুনরুক্তির জন্যে সমস্ত দেহ-মন সজাগ হয়ে থাকে। সহসা জীবনে এই নতুন চেতনার অভ্যুদয়ে কিশোর আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

কিশোর-কালের স্বাভাবিক খেলা-ধূলার আনন্দ-মত্ততা থেকে দূরে, বালক নিজের মনকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে। সেই সদ্য-জাগ্রত যৌন-চেতনার ভারে উদ্বিগ্ন আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। ছেলেবেলা থেকে সংস্কৃত নীতি-শ্লোকের আবহাওয়ায় ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা বালকের মনের মধ্যে তখন থেকেই জাগ্রত হয়ে ছিল। বীর্য্যক্ষয়ের সঙ্গে একটা অধঃপতনের আতঙ্কিত ধারণা মনের মধ্যে জাগরূক হয়ে ছিল। অথচ সেই সঙ্গে জীব-ধর্ম্মে দেহের মধ্যে তার একটা স্বাভাবিক আনন্দ-অনুভূতিও ছিল। এই দোটানার মধ্যে কিশোর সকলের অজ্ঞাতে এক ভয়াবহ অন্তঃসংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কে তাকে পথ দেখাবে? কে তাকে বলে দেবে, কোন্ পথ হলো শ্রেয়?

সৌভাগ্যবশত এই সময় কিশোর সুভাষচন্দ্র তাঁর এই জটিল প্রশ্নের উত্তরদাতার হঠাৎ সন্ধান পেয়ে গেলেন। তাঁর এক আত্মীয় তাঁদের বাড়ীর পাশেই বাস করতেন, সেখানে একদিন তিনি বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর সাক্ষাৎ পেলেন। একখানা বই খুলে কয়েকপাতা পড়তে গিয়েই দেখতে পেলেন, তিনি যে সব প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে চঞ্চল আর বিব্রত হয়ে উঠেছেন, সেইসব প্রশ্নেরই উত্তর অপরূপ স্বচ্ছভাবে এই মহাপুরুষ তাঁর জন্যে যেন লিখে রেখে গিয়েছেন। তৃষ্ণাতুর সুশীতল জলের সন্ধান পেলে যেমন উল্লসিত হয়ে ওঠে কিশোর সুভাষচন্দ্রও তেমনি বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বেণীমাধব তাঁর মধ্যে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য আর নীতিবোধকে

জাগ্রত করে দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ তাঁকে জীবন্ত আদর্শের সন্ধান এনে দিলেন। বেণীমাধব কিশোর সুভাষচন্দ্রকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, জীবনের একটা স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে, বেঁচে থাকার একটা স্বতন্ত্র আনন্দ আছে; বিবেকানন্দ এসে তাঁকে দেখিয়ে দিলেন কি করে সে সার্থকতাকে জীবনে সত্য করা যায়, কি করে শুধু বেঁচে থাকাকে অমর করে বাঁচিয়ে রাখা যায়।

মাত্র তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে···তার হাতের কাছে খেলার মাঠ, অবাধ আনন্দ হট্টগোল···সঙ্গীদের সঙ্গে ছুটোছুটি, নির্ভাবনা জীবনের নিশ্চিন্ত ভেসে-যাওয়া। কিন্তু কিশোরকে মোটেই তা আকর্ষণ করে না। সেই অল্পবয়সে মুখোমুখি সে দেখেছে তার নিজের মনকে—তাকে নিয়েই নাড়াচাড়া, সেই তার খেলা। বাইরের প্রকাশ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তাই কিশোরের মন স্বভাবতই নিজের ভেতরের দিকে ফিরে যায়। সেই বয়সে অস্বাভাবিক। সচরাচরের ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম হিসেবেই বালক তার বয়সের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ভাবতে শিখেছে।

ভাবে, এই টাকা-পয়সা, ঐশ্বর্য্য, সংসারের সব সুখ-বিলাসিতা, বড়লোক হওয়ার দরুণ যা কিছু পাওয়া যায়, তা নিয়ে কি লাভ? কে যেন ভেতর থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে বিষণ্নভাবে মাথা নাড়তে থাকে, বলে, তার চেয়ে বড় কিছু আছে, তোমাকে তাকেই বরণ করতে হবে। কি তা? কেমনধারা তার চেহারা? কি বা তার দাবী? অস্বাভাবিক কিশোর রাতদিন ভাবে আপনার মনে।

সেই সঙ্গে কণ্টক-আঘাতের মত সকলের অগোচরে মনে রাত-দিন ফোটে সেই বিচিত্র নতুন চেতনা! কাউকে বলাও যায় না সেই কৈশোরের প্রথম যৌন-জাগরণের কথা। সকলের কাছে স্বাভাবিক ভাবে যা আসে, স্বাভাবিকভাবে সকলেই যা স্বীকার করে নেয়, বালক তা পারে না। বালকের কাছে সেই সব চেয়ে-স্বাভাবিক জিনিস সব চেয়ে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়···শুধু অস্বাভাবিক নয়, অন্যায়, অশ্লীল···তাকে রোধ করতে হবে, তার ঊর্দ্ধে উঠতে হবে....

কিন্তু অতর্কিতে আবার কখন আসে তারই আক্রমণ... বালক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। মনের মধ্যে · সুরু হয় নিদারুণ

সংগ্রাম। মনের নির্জনতায় চলে নিদারুণ দ্বন্দ্ব। বালকের মন উদ্‌ভ্রান্তভাবে খোঁজে, একটা কিছু অবলম্বন, একটা নিশ্চিন্ত নির্ভর··· অসংখ্য 'না'-র ভগ্নস্তূপের মধ্যে একটা জীবন্ত আস্ত 'হাঁ'...

এ হেন মানসিক অবস্থায় বালক সন্ধান পেলো বিবেকানন্দের। তাঁর অগ্নি-বাণীর মধ্যে বালক দেখা পেলো, নিজের অজ্ঞাতে মনে মনে যাকে খুঁজছিল, সেই নিশ্চিন্ত পরম-নির্ভর, জীবনের সব চেয়ে বড় 'হাঁ'।

বালকের সমস্ত মনকে আকর্ষণ করে নেয় সন্ন্যাসীর সেই অগ্নি-বাণী....বালকের দেহ-মনের ভেতর থেকে কে যেন চীৎকার করে বলে ওঠে, পেয়েছি, পেয়েছি! প্রতি রোমকূপে-কূপে আনন্দ-শিহরণ জেগে ওঠে, এই তো আমার আপনার লোক....আমার পরমাত্মীয়··· বন্ধু···প্রিয়....ইষ্ট।

মনে হয় সন্ন্যাসী যেন তাঁর লেখার মধ্যে সেই বালকের জন্যেই তাঁর ডাক থুয়ে রেখে গিয়েছিলেন। নিমেষে বালক তাকে চিনতে পারে।

অন্তরের পরিচয়ের জন্যে লাগে একটা মুহূর্ত্ত, একটা ইঙ্গিত, একটুখানি আভাস। অমনি কত শত বর্ষের বিচ্ছেদের সংযোগ হয়ে যায়। একটা মুহূর্ত্তের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে নিখিলের ব্যঞ্জনা। জীবনের মহামুহূর্ত্ত।

বালক বইখানিকে আর ছেড়ে যেতে পারল না। আত্মীয়ের কাছে চেয়ে সঙ্গে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল তার প্রতিদিনে, প্রতি-রাত্রিতে, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে, কিশোর জীবনের শ্বাসে-প্রশ্বাসে, হৃৎস্পন্দনে···

একে একে কে যেন মুছে দিয়ে যায় সব দুর্ভাবনার দাগ···অসীম স্নেহে কে যেন খুলে দেয় একটার পর একটা স্বর্ণ-দ্বার—কোন্ অদৃশ্য উৎস থেকে সব অন্ধকার ভেদ করে মনে এসে লাগে আলোর আশীর্ব্বাদ···

জয় আলোকের জয়! জয় হোক্ জীবন থেকে জীবনে, দীপ থেকে দীপে আলোকের এই অবিচ্ছেদ শোভাযাত্রা···

আর এক যুগের কথিত বাণী, প্রাণ-মন্ত্র-বাণী, আবার সত্য হয়ে ওঠে এই যুগের এক বালকের মনে,

···হে ভারত ভুলিও না, তোমার আদর্শ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর!

ভুলিও না তোমার জীবন, তোমার যৌবন, তোমার সর্ব্বস্ব মায়ের কাছে বলি-প্রদত্ত!

অদৃশ্য মহাশূন্য থেকে আবার উচ্চারিত হয় যুগমন্ত্রবাণী,

…আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর কাল, তোমার একমাত্র দেবতা, তোমার জন্মভূমি…তাহার সেবাই তোমার একমাত্র ব্রত…

…বহুরূপে তোমার সম্মুখে তোমার ভগবান জীবদেহ ধারণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন…সেই জীবের সেবা, মানবের সেবা, সেই তো তোমার ভগবানের আরাধনা…

যা ছিল নিষ্প্রাণ অক্ষর, আবার তা জ্বলে ওঠে প্রাণ-বহ্নিতে,—

…অতীতের জীর্ণ কঙ্কাল শূন্যে বিলীন হোক…বেরুক নতুন ভারত…বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে….জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে থেকে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে…বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে…

বীর-সন্ন্যাসীর অমর প্রাণ-বাণী মহাকাশ থেকে নেমে আসে কিশোরের চিত্তে…

…আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়…

নিজের মুক্তি…জগতের কল্যাণ…এই জীবনের চরম ব্রত… তারি জন্যে এ জীবন বলি-প্রদত্ত…

কিশোরের চিত্ত নিঃসংশয় আনন্দে সাড়া দিয়ে ওঠে।

৮

বেণীমাধব জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে বৃহত্তর অস্তিত্বের চেতনা বিবেকানন্দ এসে সেই জাগ্রত চেতনার সামনে তুলে ধরলেন, চরম লক্ষ্য, জীবনের আদর্শ।

এতদিন ধরে কিশোর নিজের মনে যে অনিশ্চয়তার সংশয়ের দোলায় দুলছিল, আজ পরম নিশ্চিন্তভাবে সে-অন্তর্বেদনার হাত থেকে মুক্তি পেলো। পরম নির্ভরতায় সে বিবেকানন্দকে আশ্রয় করলো।

কল্পনায় দেখি, একটা ছোট ঘর…

সেই ঘরে একে একে জড় হয়, একটি দুটি করে একদল তরুণ কিশোর। চোখের দৃষ্টিতে স্বপ্ন মাখানো…যে-স্বপ্ন দেখতে পারে

একমাত্র নবোদ্ভিন্ন কৈশোর। মুখে অনভিজ্ঞতার সুকোমল স্নিগ্ধতা, দেহের ভঙ্গীতে বিশ্বের-সকল-দুঃখ-দূর-করবার আকুলতা…

ঘরের মেঝেতে একটা কাঠের চৌকি…চৌকির চারদিকে ধূপদানিতে ধূপ জ্বলছে…চৌকির ওপর ফ্রেমে-আঁটা একখানা ছবি… স্বামী বিবেকানন্দের ছবি…

নতমস্তকে কিশোর ভক্ত প্রণাম জানায়।

আবেগআকুলকণ্ঠে বলে, হে মহাপুরুষ, হে মহাসন্ন্যাসী, হে অগ্রজ, ধর্ম্ম জানি না, দেবতা জানি না, আমি জানি শুধু তোমাকে.... তোমাকেই অনুসরণ করে চলবো জীবনের পথ। তুমি বলে গিয়েছ, মানুষের সেবা জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম...সেই ধর্ম্মে উৎসর্গ করলাম আমার জীবন...

সভা ভেঙ্গে যায়। যে-যার ঘরে ফিরে যায়।

ঘরে, রাত্রিতে শোবার সময়, দেখি, কিশোর বালিশের তলা থেকে একটি ছোট্ট ছবি বার করে। পরিব্রাজক বিবেকানন্দের ছবি। নীরবে প্রণাম জানায়।

তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।

তার জাগরণ, নিদ্রা, স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে থাকে, সেই বিদেহী মহাপুরুষের অলোক-অস্তিত্বের ছটা।

নিঃশব্দে বালকের মনে এক ঘোরতর বিপ্লব ঘটে গেল। তার সংবাদ আত্মীয়-স্বজনেরা জানতেন না। কিন্তু ক্রমশ এই মানসিক-বিপর্য্যয়ের সংবাদ মাতাপিতার কাছে প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো।

বালকের সহপাঠীদের মধ্যে একজন ছিল তথাকথিত হীন জাতের ছেলে। একদিন সে তার সহপাঠীদের নিমন্ত্রণ করলো তার বাড়ীতে। সুভাষও নিমন্ত্রিত হলেন।

নিমন্ত্রণে যাবার সময় সংবাদটা জননীর কানে গিয়ে উঠলো। জননী প্রতিবাদ করলেন। সামাজিক রীতির দোহাই দিয়ে পুত্রকে নিষেধ করলেন, ওদের বাড়ীতে খেতে যেতে হবে না।

মাতা-পিতার একান্ত বশ্য কিশোর সুভাষ যে মাতৃ-বাক্য লঙ্ঘন করতে পারে না, এই ধারণাই জননীর মনে ছিল।

কিন্তু সেদিন জননী প্রথম সাক্ষাৎ পেলেন, পুত্রের মানসিক

পরিবর্ত্তনের। মাতার আদেশ অমান্য করে সুভাষচন্দ্র সহপাঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এলেন!

চাণক্য পণ্ডিতের নীতি-শ্লোকের বদলে তখন বালকের মন বীর সন্ন্যাসীর বিদ্রোহ-মন্ত্রের শ্লোক মুখস্থ করতে সুরু করে দিয়েছে। পিতা-মাতার কথার বাধ্য হওয়ার চেয়ে আর এক নতুন বাধ্য-বাধকতার আবেদন—কিশোরের মনকে প্রভাবান্বিত করেছে। চাণক্য-শ্লোকের বদলে আজ কিশোর আবৃত্তি করে চণ্ডীর শ্লোক, শক্তি-মন্ত্রের শ্লোক···হে বিশ্বজননী, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়, পিতা নয়, মাতা নয়, বন্ধু নয়, আত্মীয়-স্বজন নয়।

এতদিন যে শান্তশিষ্ট বালকটির সঙ্গে সংসারের কারুরই কোন বিরোধ লাগেনি, ক্রমশ তার জাগ্রত অন্তরের সঙ্গে বাধে পিতা-মাতার স্নেহের আধিপত্যের সংঘর্ষ।

যে সুবি কোনদিন মাতাপিতার অবাধ্য হয়নি, আজ মাথা তুলে সে নিজের স্বাতন্ত্র্য জাহির করে। সংঘর্ষ বাধে। মাতা-পিতা আতঙ্কিত বেদনায় অনুভব করেন, তাঁদের স্নেহের চেয়েও শক্তিশালী আর কোন আকর্ষণ তাঁদের পুত্রকে যেন বাইরে কোন অনির্দ্দিষ্ট দূরপথে টেনে নিচ্ছে।

সেই সময় র‍্যাভেনশ কলিজিয়েট স্কুলে একজন চিররুগ্ণ ছাত্র পড়তো···হেঁফো রুগী···কিন্তু ছাত্রদের সকলের প্রিয়···সকলের গিরীশদা। গিরীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি।

স্কুল আর কলেজের সব ছেলের কাছেই গিরীশদা সমানভাবে পরিচিত ছিল। কারণ ছাত্রদের প্রতি ভালবাসায় সে প্রত্যেক বছরে প্রায় এক জায়গাতেই স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো··· বাৎসরিক পরীক্ষার উত্থান-পতনের মধ্যে অচল মধ্যবিন্দুটির মতন সে সব ছেলেরই সমান দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। সবাই তার কাছে এগিয়ে আসে, সে কাউকে ছাড়িয়ে যাবার বিশেষ চেষ্টা করে না।

স্কুলের বাইরে সে-ই হলো দলের পাণ্ডা। তার ভক্তদের নিয়ে সে ছোটখাটো একটা দল করে বিবেকানন্দের আর্ত্তসেবার আদর্শকে জীবনে অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। তার সমস্ত মনোযোগ টেনে নিয়েছিল দুঃখী দুঃস্থ লোকেরা। কোথায় কোন্ কুঁড়ে ঘরে চিকিৎসার অভাবে কোন্ দুঃখী লোক অসহায় ভাবে কাৎরাচ্ছে, কোথায় এক

মুঠি অন্নের অভাবে কে উপবাস দিতে বাধ্য হচ্ছে, সারাদিন সেই তল্লাসেই তার দিন যায়। তাদের জন্যে দ্বারে দ্বারে মুষ্টি-ভিক্ষা, পালা করে রোগীর শয্যার পাশে গিয়ে রোগীর সেবা, এই হলো তাদের কাজ। কিশোর সুভাষচন্দ্র এই কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেন। তাতে করে পড়াশোনার অসুবিধা হয়, বিঘ্ন হয়; কিন্তু সন্ন্যাসের আদর্শ যার মনে রঙ ধরিয়েছে, তার কাছে স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকের কতখানি মূল্য ?

মাতা অনুযোগ করেন। কিন্তু বৃথাই। মাঝখানে একটা মৌন অশান্তি বেড়ে ওঠে।

৯

ক্রমশ বালকের কথাবার্ত্তা, গতিবিধি জননীর আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। জননী বোঝাতে চেষ্টা করেন, অনুনয় করেন; কিন্তু যত অনুনয় করেন, বালক ততই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বালক ধরে নিয়েছিল চাণক্য-শ্লোকের বশ্যতার আদর্শই বুঝি জীবনের সবচেয়ে বড় কথা, কিন্তু একি বিপর্য্যয় ঘটে গেল তার মনে ? মাতাপিতার অবাধ্য হয়ে তাঁদের মনে দুঃখ দেবার কথা সেদিনও পর্য্যন্ত বালক ভাবতে পারতো না। কিন্তু আজ তার মনে এমন এক বলিষ্ঠ বিদ্রোহের সুর জেগে উঠেছে, যার কাছে মাতাপিতার এই আবেদনের কোন মূল্যই নেই। অবশেষে মাতা সর্ব্বশেষ অস্ত্র-রূপে অশ্রুজলে পুত্রকে বিরত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মনে ব্যথা লাগলেও, মাতার সেই অশ্রুও বালককে তার গৃহীত পন্থা থেকে ঘরের শান্ত জীবনে আর আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। এক বৃহত্তর সম্ভাবনার সুবিপুল আহ্বান, তখন অস্পষ্টভাবে হ'লেও, বালকের শান্ত ঘরমুখী মনকে বাইরের কর্ম্ম-কর্দ্দমাক্ত পথে কঠোরভাবে আকর্ষণ করতে থাকে।

বিবেকানন্দের পরিচয়ের মধ্যে থেকে বালক ক্রমশ বিবেকানন্দ-গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরিচয় পায়। দক্ষিণেশ্বরের সেই মহা-পুরুষের অপূর্ব্ব জীবন বালককে মুগ্ধ করে। বিশেষভাবে মুগ্ধ করে, ঠাকুরের প্রত্যক্ষ জীবন। এই অপূর্ব্ব মানুষটি যা কিছু বলে গিয়েছেন, সমস্তই তাঁর জীবনে তিনি নিজে আচরণ করে দেখিয়ে

গিয়েছেন। সুতরাং তাঁর কথার মধ্যে কোন অসত্যতা নেই, কোন অসম্ভাব্যতা নেই। তিনি যা আচরণ করে গিয়েছেন, সেই আচরণের দ্বারা, অনুমত ফলই পাওয়া যাবে। তিনি সর্ব্বতোভাবে কামিনী আর কাঞ্চনকে ত্যাগ করেছিলেন। অতএব, বালকও স্থিরসিদ্ধান্ত স্বরূপ গ্রহণ করে, কাঞ্চন ও কামিনীর লোভ সে-ও ত্যাগ করবে। প্রত্যেক নারীকেই তিনি জননীর মতন, জগন্মাতার অংশের মতন দেখবেন। অসংখ্য 'হাঁ-না'র দ্বন্দ্বের মধ্যে চিরকালের মতন স্থির হয়ে যাক্ একটা বিরাট 'হাঁ'।

এমন প্রবলভাবে এই গুরু-শিষ্যের প্রভাব বালকের মনের ওপর এসে পড়ে যে বালক নিজের মনে এক রকম সংকল্প করে নেয়, সে-ও সন্ন্যাস গ্রহণ করবে···সাধু সন্ন্যাসীদের মতন অন্তরের আত্মিক শক্তি অর্জ্জন করতে হবে···এই আত্মিক শক্তিই যখন জীবনের মূলধন।

কিন্তু এই রহস্যময় নবজগতে কে পথ দেখাবে? বিবেকানন্দের সাহিত্য থেকে কিশোর সুভাষচন্দ্র যোগের অপূর্ব্ব সম্ভাবনার কথা জানতে পারেন। কিশোরকালের প্রথম উন্মাদনায় সুভাষচন্দ্র সহজ বিশ্বাসে সেই যোগ-মার্গের সন্ধান করতে সুরু করলেন।

বাড়ীতে কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপনে হঠযোগ-সংক্রান্ত বই অনুসন্ধান করে পড়তে সুরু করলেন। কৈশোরের প্রথম আবেগে সব কিছুই সহজ বলে মনে হয়। তাই প্রথম-যৌবন এত দুঃসাহসী।

সেই সব হঠযোগের বইতে আসনের যে-সব বিবরণ থাকে, প্রাণায়ামের যে-সব ব্যবস্থা থাকে, কিশোর নিজের মতন করে তাকেই অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। এবং নিজের মধ্যে একটা প্রবল বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করে, সে সত্যই যোগের কঠিন-পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

কিন্তু সমস্যা হলো, কোথায় বসে যোগাভ্যাস করা যায়? লোকে দেখে ফেললে একটা ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হবে, সুতরাং একান্ত নিভৃতে তা করতে হবে। এবং পুঁথি খুলে দেখা গেল, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বারবার উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, একান্ত নিভৃতেই এই সব সাধনভজন করতে হয়—বনে, না হয় কোণে।

সুতরাং দিনের বেলা, সূর্য্যদেবই প্রধান অন্তরায়। অতএব, সূর্য্য নিভে গেলে, অন্ধকারে, সেই সুসময়। বাড়ীর ছাদে, ঘরের নিভৃত কোণে, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, বিছানায়। কিন্তু হায় কিশোর সন্ন্যাসী। কোথায় তার নিরঙ্কুশ নির্জনতা। একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের ভিতর কিশোর সাধক একমনে চোখ বন্ধ করে চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধের সাধনায় আসনে বসেছেন। কোথা থেকে ঠিক সেই সময় বাড়ীর এক পরিচারিকার প্রয়োজন হলো সেই ঘরেই আসবার। এবং অন্ধকারে পরিচারিকাটি একেবারে ধ্যানী সাধকের ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো! ধ্যান ভেঙে গেল···বাড়ীতে খানিকটা জানাজানিও হয়ে গেল। তা নিয়ে খানিকটা বচসা, জবাবদিহি, অশান্তিও ঘটলো।

এই সমস্ত হঠযোগের বইতে একাগ্রতা ও চিত্ত-নিরোধ সাধনার জন্যে নানারকম প্রণালীর বর্ণনা দেওয়া আছে। তরুণ সন্ন্যাসী সরল বিশ্বাসে তাদের অনুসরণ করতে চেষ্টা করতেন। শাদা দেয়ালের ওপর একটা কালো বিন্দু এঁকে রেখে তারই ওপর মনঃসংযোগ করে বসে থাকতে হতো, যতক্ষণ না মন সম্পূর্ণ-ভাবে শূন্য বা চিন্তারহিত না হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ সেই বিন্দুটির দিকে চেয়ে অভ্যাস করতে হবে। কখন কখন নীল আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন ; কিন্তু বিপদ হতো, যখন সূর্য্যধ্যান করতে বসতেন। দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য্যের দিকে স্পষ্ট চেয়ে থেকে একাগ্রতা অভ্যাস করতে হবে। এইভাবে কিশোর, নিজেকেই নিজের গুরু করে, লোকচক্ষুর অন্তরালে নানাভাবে মানসিক শক্তির উন্নয়নের সাধনায় তন্ময় হয়ে থাকে।

সাধারণত তরুণ মনে যখন এই আত্মিক ভাব-সাধনার প্রেরণা জাগে, তখন আত্মনির্য্যাতন বা আত্ম-নিগ্রহ বিশেষ ধর্ম্ম হয়ে ওঠে। কিশোর সুভাষচন্দ্রের মনেও স্পষ্ট ধারণা হলো, আত্মিক শক্তি লাভ করতে হলে রীতিমত কৃচ্ছ্র সাধনা করতে হবে, নিজেকে বঞ্চিত করবার নানান্ রকমের উপায় তিনি উদ্ভাবন করতে লাগলেন। মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন, ঘড়ি ধরে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করতে লাগলেন, শীত-গ্রীষ্ম সম্বন্ধে সম-বোধ জাগাবার জন্যে খালি গায়ে রোদে আর হিমে সময় কাটাবার অভ্যাস করতে

লাগলেন। সব চেয়ে বিপদ হলো, এই সবই করতে হবে এমনভাবে যাতে কেউ টের না পায়।

আজ, কালের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ভারতের প্রাণ-শক্তিকে যিনি একদা তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে সঞ্জীবিত করে তুলবেন, ভারতের ভাগ্য-বিধাতা তাঁর জীবনের সূচনা থেকেই সেই ভারত-তত্ত্বে তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসের রাজ-পথ যে-সব ভারত-পথিকের পদ-চিহ্নে অলঙ্কৃত হয়ে আছে, সুভাষচন্দ্র সেই অমর ভারত-পথিকদলেরই শেষতম প্রতিনিধি, তাই তাঁর জীবন-সাধনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই, পূর্বাপর ভারত-পথিকদের সাধনারই সমধর্মিতা।

কিশোর-সাধক যে এই যোগ-মার্গে তখন একক পথিক ছিলেন, তা নয়; তাঁর এই সাধনায় তাঁর কয়েকজন সহপাঠী বন্ধু সহযাত্রীরূপে ছিলেন। তাঁরা গোপনে পরামর্শ করে এক একটি অভ্যাস নিয়ে স্বতন্ত্র ভাবে পরীক্ষা করে দেখতেন; তারপর কিছুকাল অভ্যাসের পর সকলে মিলে পরস্পরের অভিজ্ঞতার একটা তুলনামূলক অনুশীলন করতেন। কে কতদূর এগুলো, কে চোখ বুঁজলে কতটা আলো দেখতে পাচ্ছে, কতখানি যোগশক্তি কার আয়ত্ত হলো, তা নিয়ে বিচার করে দেখা হতো।

কিছুকাল এইভাবে নিভৃতসাধনা করার পর, কিশোর সাধক একদিন নিজের হিসাব নিয়ে দেখলেন, যদিও প্রত্যক্ষভাবে এখনো কোন বিভূতির দর্শন তিনি পাননি তবু তিনি বিশেষ হতাশও হলেন না। কঠিন সাধনা, সময়সাপেক্ষ।

তা ছাড়া, ক্রমশ একটা কথা বিশেষ সত্য হয়ে উঠতে লাগলো, এপথে একজন গুরুর প্রয়োজন। উপযুক্ত গুরু ছাড়া, এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নয়। বিবেকানন্দেরও গুরুর প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু গুরু কোথায় পাওয়া যায়?

তাই যখনই কোন সাধু সন্ন্যাসীর সংবাদ পেতো, কিশোর সেখানে ছুটে যেতো। ফকির, দরবেশ, সাধু দেখলে, মুক্তহস্তে দান করতে চেষ্টা করতো। কে জানে, কোথায় আছে পরশ-পাথর।

এই যোগ-সাধনার অঙ্গস্বরূপ কিশোর লোক-সেবার ব্রতকেও

গ্রহণ করেছিল। ছুটির সময় সহযাত্রীদের নিয়ে শহর থেকে কাছাকাছি যে-সব গ্রাম ছিল, সেখানে গিয়ে, সেখানকার লোকদের সঙ্গে মিশে, গ্রামের কাজ করা, অশিক্ষিতকে বর্ণ-পরিচয় করানো, স্বেচ্ছায় এই সব কাজের ভারও কিশোর নিয়েছিল।

কিন্তু এক বিচিত্র ব্যাপার সেখানে এক গাঁয়ে ঘটে গেল। গ্রামের মধ্যে ঢুকে দেখে, গাঁয়ের লোকেরা তাদের দেখতে পেয়ে দূরে যেন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা যত ভালবেসে গাঁয়ের লোকদের কাছে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়, গাঁয়ের লোকেরা ঠিক তত পায়ে পায়ে পিছিয়ে যায়। ছুটে পালায়।

একি ব্যাপার ? বহুকষ্টে যদিও দেখা হয় তাদের সঙ্গে, কিন্তু তারা ভাল করে কথা বলে না। তাদের কেমন যেন সন্দেহ করে। এমন ভদ্রপোষাক পরে কোন ভদ্রলোকের ছেলে তাদের কাছে তো কখনো আসেনি। মাঝে মাঝে দু'একজন ভদ্রবেশী লোক আসে বটে কিন্তু তারা হলো তাদের নিপীড়ক, ট্যাক্স-দারোগার লোক, তাদের দেখলেই তারা লুকিয়ে পড়ে। তাই এই কিশোর-সেবাব্রতীদের তারা ধরে নিয়েছে, সেই ট্যাক্স্-দারোগার লোক বলেই—কিম্বা অন্য কোন নতুন নিপীড়কের দল, ছল করে এসেছে তাদের ধরবার জন্যে। ভদ্রবেশে কেউ যে স্বেচ্ছায় তাদের কল্যাণ করতে আসতে পারে, এই অস্বাভাবিক ধারণা তারা মনে আনতেই পারে না, এমনিধারা একটা সামাজিক বিচ্ছেদের অচল ঐতিহ্য গড়ে তুলেছি আমরা। ক্রমশ যাওয়া-আসায় কোন কোন গ্রামে কিশোর সেবাব্রতীর দল সহজভাবে গৃহীত হয়, ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে তারা বর্ণ-পরিচয় করাতে চেষ্টা করে।

সেই সময় কটকে এক অশীতিপর সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হলো। সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মহিমার কথা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো। শহরের প্রধান ডাক্তার, তিনি স্বয়ং তাঁর শিষ্য হলেন। দলে দলে লোক সেই সন্ন্যাসীর কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগলো।

কিশোর সুভাষচন্দ্রও সে সুযোগ ছাড়তে পারলো না। হয়ত যে গুরুর সন্ধান তারা করছে, দৈব এইভাবে তাঁকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই আশ্বাস নিয়ে সুভাষচন্দ্র গোপনে সেই

সন্ন্যাসীর কাছে আসা-যাওয়া সুরু করে দিল। সন্ন্যাসীর কথাবার্ত্তা ভাল লাগে। সন্ন্যাসীও সন্তুষ্ট হয়ে কিশোর ভক্তকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং নিত্য পালন করবার জন্যে তিনটি উপদেশ দান করেন। প্রথম, মাছ-মাংস স্পর্শ করবে না; দ্বিতীয়, প্রতিদিন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র আর স্তোত্র পাঠ করবে; তৃতীয় হলো, মাতাপিতার বাধ্য হবে, এবং এই বাধ্য হওয়ার রীতি হিসাবে প্রত্যহ প্রভাতে শয্যা থেকে উঠেই মাতাপিতার চরণধূলি নিতে হবে।

সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাসীর কাছে সেই ত্রিনীতি পালন করতে স্বীকৃত হলেন। প্রথম তুটি নীতি পালন করতে কোন বিশেষ হাঙ্গামাই হলো না, কিন্তু বিপদ হলো তৃতীয় নীতিটি নিয়ে। যে পুত্র অবাধ্য বলে অখ্যাতি অর্জ্জন করেছে, সহসা সে যদি প্রভাতে মাতাপিতার চরণ-ধুলো নিতে যায়, লোকে ভাববে কি? কিশোর সাধকের নিজেরও কেমন বাধ-বাধ ঠেকতে লাগলো। প্রভাতে উঠে, মনে মনে যতই চেষ্টা করে, সাহসে আর কুলোয় না। কয়েকদিন এইভাবে নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করার পর একদিন হঠাৎ প্রভাতে বালক পিতার সামনে উপস্থিত হয়ে প্রণত হয়ে চরণ-ধুলো নিলো। হঠাৎ পুত্রের সেই ব্যবহারে পিতা বিস্মিত হয়ে গেলেন। কি ব্যাপার? পুত্রকে তিনি একান্ত বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করেন, কিন্তু পুত্র কোন উত্তরই দিতে পারে না। দ্রুত সেখান থেকে সরে গিয়ে নিরুত্তরতার জ্বালা থেকে বাঁচে।

কিন্তু প্রতিদিন প্রভাতে এইভাবে সঙ্কোচ দূর করে পিতার চরণ-প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছতে বালক বিপন্ন হয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে, অতি অল্পকালের পরীক্ষার পর, এই ত্রি-নীতিকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। অতি ক্ষণস্থায়ী এই পিতৃভক্তির বাহ্যিক প্রকাশ আবার বিদ্রোহীর মৌন প্রতিবাদে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুত্রের সেই অকস্মাৎ প্রাত্যহিক প্রণামে জননী আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই দেখলেন, শরতের মেঘের মতন তা বিনা বর্ষণেই ভেসে চলে গেল। আবার সেই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানো, যখন খুশী তখন বাড়ীতে আসা, পড়াশোনায় অমনোযোগিতা। জননী স্থির করলেন, এর একটা বিহিত করতেই হবে।

ভোর না হতেই বালক কখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়··· আবার কখন সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে বাড়ীতে ঢোকে···সারদার ঘরে আলো জ্বলে ওঠে······

বাড়ীর মধ্যে বৃদ্ধা পরিচারিকা সারদার সঙ্গেই বালকের ঘনিষ্ঠতা। বালকের খাওয়া-দাওয়া শোয়া-বসা, সব কিছুর ভার সারদার ওপর। বৃদ্ধা আদর করে ডাকে, দেবতা।

বাড়ীর ভর্ৎসনা থেকে কিশোর-দেবতাকে আড়াল করে রাখতে হয়ত সারদার অনেকখানিই মস্তিষ্ক পরিচালনা করতে হয়।

জননী আজ অপেক্ষা করে আছেন, তিনি দেখবেন কখন পুত্র বাড়ীতে প্রবেশ করে।

রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে বালক বাড়ীতে প্রবেশ করলো। সারদার ঘরে আলো জ্বলে উঠলো।

জননী এগিয়ে গিয়ে দেখেন, প্রদীপের আলোয় সারদা কিশোর-দেবতার পায়ে একটা মস্ত বড় ঘাতে প্রলেপ দিচ্ছে। কখন যে পায়ে কি হয়েছে, তা জননী জানেনও না!

—দেখো তো দেবতা, মা জানলে কি বলবেন!

দরজা খুলে জননী ঘরে প্রবেশ করেন।

দেবতা ও ভক্ত দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

জননী আজ তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেন।

বালক নিঃশব্দে তা সহ্য করে।

জননী পিতার কাছে অনুযোগ করেন, সুবিকে শাসন করা দরকার!

পিতা সমস্ত ব্যাপার শোনেন। প্রভাতেই স্থির করেন, পুত্রকে ধরবেন।

ভোর না হতেই যথারীতি নিঃশব্দে বাড়ী থেকে বেরুতে যাবে, এমন সময় বালক শোনে, পিতার সুগম্ভীর কণ্ঠ!

—এত ভোরে কোথায় চলেছ?

বালক কোন উত্তর দেয় না।

—রোজ রোজ কোথায় যাও?

বালক নিরুত্তর।

—উত্তর দাও ?

বালক সংক্ষেপে উত্তর দেয়, রোগীর সেবা করতে।

পিতা ভর্ৎসনা করে ওঠেন, তার মানে ? নিজের পড়াশোনা জলাঞ্জলি দিয়ে ঘাটে মাঠে যার তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো ! সামনেই না তোমার প্রবেশিকা পরীক্ষা। পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি আর বাড়ী থেকে বেরুতে পারবে না।

আষাঢ়ের আকাশের মতন মুখভার করে বালক ফিরে আসে। নিরুদ্ধ অভিমানে দরজা বন্ধ করে পড়তে বসে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর দেখা গেল, সুভাষচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। সাতশোর মধ্যে ছ'শো ন' নম্বর পেয়েছেন। প্রথম যিনি হয়েছিলেন* তিনি তাঁর চেয়ে আর সাত নম্বর মাত্র বেশী পেয়েছিলেন।

১০

কোথা দিয়ে কখন আসে আহ্বান · জীবনের যোগাযোগ··· এগিয়ে চলার সঙ্কেত···

কটক থেকে বিদায় নিয়ে বেণীমাধববাবু কৃষ্ণনগরে আসেন। সেখানে আর একটি তরুণ ছাত্র তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, হেমন্তকুমার সরকার। কটকে যে-ছাত্রটিকে রেখে এসেছিলেন আর কৃষ্ণনগরে যে নতুন ছাত্রটির সন্ধান পেলেন, প্রধান শিক্ষাব্রতী হয়ত সেই দুই কিশোরের মধ্যে দেখেছিলেন, অন্তরের সমধর্মিতা। তাই তার মধ্যে দিয়ে তিনি এই দু'জন কিশোরের যোগাযোগ করে দিলেন।

পূজার ছুটিতে স্বাস্থ্য-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হওয়ায় বেণীমাধব বাবু কিশোর হেমন্তকুমারকে কটকে যাবার পরামর্শ দিলেন, সঙ্গে দিলেন, সুভাষচন্দ্রের কাছে একটুখানি পরিচয়-পত্র।

সেই সূত্রে গড়ে উঠলো দুই কিশোরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব রোমান্টিক বন্ধন। হেমন্তকুমার নব-জাগ্রত কিশোর-বন্ধুর কাছে নিয়ে এলেন এক নতুন পৃথিবীর সংবাদ, দেশের সংবাদ, রাজনীতির সংবাদ।

এতদিন পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্রের মনে রাজনীতির কোন আবেদন

---

* শ্রীপ্রমথনাথ সরকার

ছিল না। তাঁর মন অন্য অনেক বিষয়ে তাঁর সমবয়সীদের ছাড়িয়ে গেলেও, রাজনীতি সম্পর্কে তিনি তখন অনেক পিছিয়েই ছিলেন। রোগীর সেবা বা দরিদ্রের জন্যে মুষ্টিভিক্ষা চেয়ে বেড়ানো, সামাজিক কর্ত্তব্য হিসাবেই সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন, তার সঙ্গে দেশের বৃহত্তর জীবনের সংযোগ তখনো পর্য্যন্ত তাঁর মনে গড়ে ওঠেনি। দেশের রাজনৈতিক অস্তিত্বের বিবিধ বিচিত্র সমস্যা তখন তাঁর চেতনার বাইরে ছিল।

তার কারণ—যে পরিবেশের মধ্যে তিনি মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, তার মধ্যে তথাকথিত রাজনীতির একরকম প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের মানসিক ভূগোলে তখন উড়িষ্যার বিশেষ কোন স্থানই ছিল না। বাংলার পাশে থেকেও বাংলার উনিশশো পাঁচ থেকে উড়িষ্যা বহুদূরে সরে ছিল। মাঝে মধ্যে আকাশে উড়ন্ত পাখীর ঠোঁট থেকে খসে-পড়া খড়কুটোর মত বিপ্লবী বাংলার দু'একটা সংবাদ উড়িষ্যার সেই শান্ত শহরের উপর এসে পড়তো। স্কুলে পড়বার সময় সুভাষচন্দ্র একবার শুনলেন বাংলাদেশে কোথায় নাকি ছেলেরা ইংরেজের ওপর বোমা ফেলেছে; সরকারী স্কুলের হেডমাষ্টার ছেলেদের সামনে তীব্রভাবে তার নিন্দা করলেন। তারপর তার কথা সবাই ভুলে গেল। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতাদের ছবি বেরুতো, কিশোর সুভাষচন্দ্র পড়বার ঘরের দেয়ালে তাঁদের ছবি খবরের কাগজ থেকে কেটে টাঙিয়ে রাখতেন। একদিন তা-ও সেখান থেকে নামিয়ে ফেলে দিতে হলো। তাঁদের কোন আত্মীয়, তিনি আবার পুলিশের অফিসর ছিলেন, তাঁদের বাড়ীতে বেড়াতে এসে ছেলেদের পড়বার ঘরের দেয়ালে সেই সব ভয়ঙ্কর জীবদের ছবি দেখে গৃহস্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ফলে, ছবিগুলো সেইদিনই সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। হয়ত বালকের মন থেকেও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, কারণ আমরা দেখছি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র সুভাষচন্দ্র নিষ্ঠাসহকারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক-উৎসব নিয়ে প্রবন্ধ লিখছে,—স্কুলে সেই প্রবন্ধ লেখা নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হয়।

এ হেন পরিবেশের মধ্যে কৃষ্ণনগরের নতুন বন্ধুটি নতুন সব

মানুষের, নতুন জগতের খবরাখবর নিয়ে এলেন। সুভাষচন্দ্র হেমন্তকুমারের মুখে শুনলেন, তাঁদেরই মতন সব তরুণ ছেলে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে জীবন-ব্রত গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে একজন তরুণের কথা হেমন্তকুমার জানালেন। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, কলকাতায় মেসে থাকেন, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁরই মতন আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেছেন, দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করবেন; তাঁর মেসে কয়েকজন সমধর্মী বন্ধু মিলে তাঁরা সেই নতুন আদর্শ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করেন, নতুন করে তাঁরা দল গঠন করবেন দেশের কাজের জন্যে···

নব-জাগ্রত বিস্ময়ে সুভাষচন্দ্র সুরেশদার কথা শোনেন···সেই অজানা তরুণদের দলে যোগদান করবার জন্যে অন্তরে প্রবল বাসনা জাগে···মনে মনে স্থির করেন, কলকাতায় গেলে নিশ্চয়ই সুরেশদার সঙ্গে দেখা করবেন··

কটক থেকে হেমন্তকুমার ফিরে এসে সুরেশদার দলে নতুন বন্ধুটির সংবাদ দেন। পত্রে আলাপ সুরু হয়। তরুণ সুভাষচন্দ্রের পৃথিবীর পরিধি একটু একটু করে বাড়তে থাকে।

১১

তখন সুভাষচন্দ্রের মাত্র ষোল বছর বয়স। কটক থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হলেন।

কিন্তু কলেজের চেয়ে তীব্রতর ভাবে তাঁকে আকর্ষণ করলো, মিরজাপুর ষ্ট্রীটের সেই আড্ডা। সেখানে তিনি তাঁর অন্তরের সহযাত্রীদের দেখা পেলেন। দেখলেন, এই আড্ডার অধিনায়ক সুরেশচন্দ্র আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করবার ব্রত নিয়ে বিবেকানন্দ-সাহিত্যকেই তাঁর জীবনের পথ-প্রদর্শক বলে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাঁর সংশ্রবে সুভাষচন্দ্র তাঁর অন্তরের স্বদেশবাসীরই সন্ধান পেলেন।

কলেজে পড়তে এসে তিনি স্থির বুঝেছিলেন যে, কলেজের পড়ায় পাশ করা এবং চাকরী করা তাঁর জীবনের লক্ষ্য নয়। জীবনের একটা মহত্তর উদ্দেশ্য আছে, সেই মহত্তর উদ্দেশ্যকে পরিপূরণ করাই হলো জীবন ধারণ করার একমাত্র সার্থকতা। এবং সেই মহত্তর উদ্দেশ্য

পরিপূরণ করতে হলে, নিজের সমস্ত শক্তিকে সংহত করতে হবে এবং তা করা একমাত্র সম্ভব ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারা। তাঁর জীবনের যাত্রামুখে যৌন-সমস্যা অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দেয়। অধিকাংশ ছেলে যখন স্বাভাবিক ভাবেই এই যৌন-চেতনাকে গ্রহণ করে, সুভাষ-চন্দ্র তা পারেন নি। যেদিন তাঁর মধ্যে এই চেতনা স্বাভাবিক ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে, সেইদিন থেকে তাঁর মধ্যে একটা নিদারুণ সজাগ সংগ্রাম চলতে থাকে, কিভাবে তিনি এই যৌন-চেতনাকে গ্রহণ করবেন এবং যতক্ষণ সে-সম্বন্ধে কোন স্থির মীমাংসা করতে না পেরেছেন, ততক্ষণ ভয়াবহ এক অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে।

কলকাতায় আসার পর তিনি এই সমস্যার একটা সমাধান স্বীকার করে নেন। যে মহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যে তাঁর জীবনের মর্মমূলে তিনি প্রেরণার স্পন্দন অনুভব করছেন, তাকে সার্থক করে তুলতে হলে, এই যৌন-শক্তিকে আত্মিক শক্তিতে পরিণত করতে হবে, সুতরাং সজ্ঞান চেষ্টায় এই যৌন-বোধের উর্ধ্বে উঠতে হবে।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রায় এই সময় ভারত-বর্ষের আর এক তরুণের মনে এই যৌন-বোধ এমনি জাগ্রত সমস্যার আকারেই দেখা দেয়, সেই তরুণ আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী। দু'জনের জীবন থেকে দেখা যায়, অন্যান্য বহু জিনিসের মতন, এই সমস্যা সম্পর্কেও দুজনের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবেই দেখা দেয়।

১২

প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন যে সব ছাত্র পড়তো তাদের প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করে দেখা যায়। একদল ছিল, সমাজের ধনী ও বিত্তশালীদের বংশধর, তাদের জন্যে একটা বেঞ্চি আলাদা ছিল, বলা হতো, বাবুস্ বেঞ্চ। আর একটি দল ছিল, গ্রন্থকীটের দল, তারা বই আর পড়া আর পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করা ছাড়া আর কিছুই জানতো না, আর কিছু ভাবতো না। এ ছাড়া আর একটি দল ছিল, তার মধ্যে পড়ুয়া ভাল ছেলেও ছিল, কিন্তু তাদের একটা গোপন রূপ ছিল। তারা নিজেদের মনে করতো বিবেকানন্দের উত্তরাধিকারী বলে। যে সামাজিক বিপ্লবের কথা

বীর সন্ন্যাসী অগ্নি-অক্ষরে প্রচার করে গিয়েছিলেন, তাদের ধারণা হলো, বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত মিশন সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা আর রোগীর সেবায় ভত বড় বিপ্লবীর উত্তরাধিকারকে নষ্ট করছেন ; সুতরাং তারা মনে করতো, বিবেকানন্দের সামাজিক বিপ্লব তারাই সম্পূর্ণ করবে এবং সেইজন্যে বিবেকানন্দের বাণীকে তারা দেশের বৃহত্তর সাধন-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে একটা বিপ্লবের আদর্শকে কার্য্যকরী করে তুলতে চেষ্টা করলে। এই প্রচ্ছন্ন বিপ্লবীর দলে সুভাষচন্দ্র এসে যোগদান করলেন এবং মিরজাপুর ষ্ট্রীটের আড্ডায় ক্রমশ এই বিপ্লবী দলের আধিপত্যই প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো। নিজেদের মধ্যে দেশ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা ছাড়া, তাঁরা সর্ব্বত্রই সন্ধানে ছিলেন, কি করে সমধর্মী তরুণদের তাঁদের দলে আকর্ষণ করে আনা যায় এবং দেশের তরুণ-সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে আদর্শবাদী একটা বিরাট তরুণসঙ্ঘ গড়ে তোলা যায়। মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত যে এক হাজার তরুণের জন্যে বিবেকানন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলে গিয়েছিলেন, মহাপুরুষের সেই দীর্ঘশ্বাস ব্যর্থ হয়নি। সেই যুগের তরুণদের মধ্যে ধীরে ধীরে মাতৃ-মন্ত্রে-দীক্ষিত বীর যুবকদল গড়ে উঠছিল। মিরজাপুরের ছাত্রাবাস ছাড়া এই দলের আর একটি আড্ডা ছিল, প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রাবাস, ইডেন হিন্দু হোষ্টেল। পুলিস সে সন্ধান পেয়েছিল, তাই প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং হিন্দু হোষ্টেলের চারদিকে তখন গুপ্তচরেরা ঘুরে বেড়াতো। সুভাষচন্দ্র অল্পকালের মধ্যেই কলেজের সেই বিপ্লব-ধর্মী তরুণ ছাত্রদের অধিনায়ক হয়ে উঠলেন।

১৩

তখন নতুন করে বাংলার ইতিহাস লেখা সুরু হয়ে গিয়েছে। যে আত্মবিস্মৃত জাতিকে বঙ্কিমচন্দ্র তার অতীত কীর্ত্তির কাহিনী সন্ধান করে বার করতে উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছিলেন, সেই আত্মবিস্মৃত জাতির ঐতিহাসিক আর সাহিত্যিকেরা তখন নব-উদ্যমে তীর্থযাত্র বেরিয়েছেন, জাতির অতীত-জীবনের ভগ্ন-মন্দিরে বিলুপ্ত-স্মৃতি প্রাণ-দেবতার সন্ধানে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের নিজের প্রাণ-বীণায় জাগিয়ে তুলেছেন এক অপরূপ মাতৃ-বন্দনার সুর। "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ", জাতির

অন্তরের অন্তরতম স্থল থেকে দীর্ঘশ্বাসের মতন উদ্‌গত হয়ে বাংলার চিত্তাকাশকে আলোড়িত করে তুলেছে…"আমার সোনার ব আমি তোমায় ভালবাসি", প্রত্যেক তরুণ বাঙালীর মনে মন্ত্রের মতন প্রভাব বিস্তার করছে ; পলাশীর মাঠের বিলুপ্ত-রক্ত পলাশ আবার ফুটে উঠেছে নবীন সেনের কাব্যে ; বাঙালী ঐতিহাসিক মাটী খুঁড়ে পুরাণো পুঁথি ঘেঁটে বিদেশী ঐতিহাসিকদের মিথ্যার ষড়যন্ত্র ভেদ করে চেষ্টা করছেন জাতির মর্য্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

গৌড়-পাণ্ডুয়া-মুর্শিদাবাদের ঘন অরণ্যে পরিত্যক্ত ভগ্ন-প্রাসাদ আর জীর্ণ মন্দিরগুলি নতুন করে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে তরুণ বাংলাকে।

পলাশীর শূন্য মাঠ, গৌড়ের ঘন জঙ্গল, মুর্শিদাবাদের গঙ্গার তীর, তরুণ বাঙালীর কাছে দেখা দিয়েছে নতুন তীর্থের রূপে।

সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন, সেই তীর্থ পরিভ্রমণ করে আসবেন…

কলেজের প্রথম গ্রীষ্মের ছুটিতে মিরজাপুর ষ্ট্রীটের সেই ছাত্রাবাসের দলের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বেরুলেন, বেড়াতে নয়, তীর্থ-যাত্রা করতে…

সেই একই পথ…সবাই যায় আসে…কিন্তু যে যায়, তার মনের রঙে পথের চেহারা যায় বদলে। একজনের কাছে যে-পথ পড়ে থাকে মূক, মৃত, ধূলি-ধূসরিত…আর একজনের কাছে সেই পথ হয়ে ওঠে কলরব-মুখরিত, জীবন্ত, বন্ধুর মত কথা বলে, স্পর্শ করে, গোপন রহস্য তৃণে তৃণে ধূলিকণায় কণায় উদ্‌ঘাটিত করে ধরে।

সদ্য-জাগ্রত তরুণের মন সেই তীর্থ-যাত্রার পথে-পথে পায় জীবন্ত ইতিহাসের স্পর্শ। পরিত্যক্ত একটা ভাঙ্গা পাঁচিল, অরণ্যের বুনো লতায় ঢাকা একটা সামান্য ইঁটের স্তূপ, নীরবতার মহা-পুরাণের মতন মুখর করে তোলে জাতির মর্ম্মকাহিনী।

কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর…কৃষ্ণনগর থেকে পলাশী।

পলাশীর সে আম্রকানন আর নেই, যার আড়ালে ভীত ক্লাইভ তার মুষ্টিমেয় সৈন্যদের নিয়ে লুকিয়েছিলেন…পড়ে আছে শুধু ধূ ধূ মাঠ আর তার মধ্যে ইংরেজ-সরকারের তৈরী একটা ছোট স্মৃতি-স্তম্ভ…

সুভাষচন্দ্র সেই স্মৃতি-স্তম্ভের সামনে এসে দাঁড়ান। দলের মধ্যে কে একজনে আবৃত্তি করে উঠলেন, মোহনলালের শেষ উক্তি…

তরুণ তীর্থ-যাত্রীর মন আবিষ্ট হয়ে যায় পথের মায়ায়…, অশ্রুসজল হয়ে ওঠে চোখ।

কে একজন একটা খড়ি নিয়ে সেই স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লেখেন, monument of glaring treachery…নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার ততোধিক নির্লজ্জ স্মৃতিচিহ্ন…

তাড়াতাড়ি পেছন থেকে ছুটে আসে চৌকিদার…বৃটিশ-প্রেস্‌টিজের মন্ত্রপূত রক্ষা-কবচের চৌকিদার…

ধমক দিয়ে ওঠে উদ্ধত তরুণদের…তাড়াতাড়ি মুছে দেয় খড়ির দাগ।

সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ।

হাজার-দুয়ারি, মতিঝিল, বরানগরে রাণী ভবানীর মন্দির, নন্দকুমারের পরিত্যক্ত প্রাসাদের ভগ্ন-স্তূপ…বৃটিশের সংরক্ষিত মৃত-নবাবিয়ানার যাদুঘর…নদীর ওপারে অযত্নের অবজ্ঞায় নিশুতি সিরাজের কবর…

এক-একটি জ্বলন্ত চিতা-শয্যার মতন তরুণের অন্তরকে তারা সব স্পর্শ করে করে যায়…স্মৃতির শ্মশানে দাঁড়িয়ে কাঁদে সদ্য-জাগ্রত তরুণ বাংলা…জাতির সমগ্র অতীত একটি মুহূর্তের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে…

যে-বাসনা অস্পষ্ট মূর্ত্তিতে মনের মধ্যে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়, এই সব অপরূপ মুহূর্ত্তে তারা আপনা থেকে সংহত হয়ে ওঠে, আপনা থেকে মনের ভেতরে মূর্তি ধরে জেগে ওঠে জীবনের মহামন্ত্র…

সেদিন সেই স্মৃতির শ্মশানে দাঁড়িয়ে তরুণ সুভাষচন্দ্রের মনে যে কি সঙ্কল্প জেগে উঠেছিল, সেই স্বল্পবাক্ আদর্শবাদী তরুণ ছাত্রের মনে নিজের হতভাগ্য দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে কি নিবিড় দুর্লভ দুরাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল, আজ তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

ফিরতে রাত হয়ে গেল।

নৌকো করে তাঁরা বহরমপুরে ফিরলেন।

বর্ষার গঙ্গা। জ্যোৎস্নার রাত। স্বপ্নে ভরপুর তরুণ-মন।
সঙ্গীরা অনুরোধ করে গান গাইবার জন্যে।
সুভাষচন্দ্র গাইলেন, হের দূরে চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিতা গঙ্গা...

৪

তীর্থ-দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এলেন সুভাষচন্দ্র কলেজে, আড্ডায়, কলেজের বাইরে জীবনের অনির্দ্দিষ্টতায়।

নানাদিক থেকে মনের মধ্যে ক্ষ্যাপা হাওয়ার মতন আসে দুরন্ত সব আবেগ। তার আলোড়নে মন দুলতে থাকে কিন্তু স্পষ্ট কোন নির্দ্দেশ ফুটে ওঠে না তার মধ্যে। চারদিক থেকে উঠছে আওয়াজ, আগুনে গলছে লোহা, গরম লোহায় পড়ছে হাতুড়ির আঘাত, হাপরে উঠছে বাতাসের বেগ, কিন্তু তখনও কারিগরের হাতে ফুটে উঠছে না স্পষ্ট কোন রূপ।

প্রথম কৈশোরে যে যোগ-সাধনায় আকাঙ্ক্ষা উঠেছিল জেগে, সমানে তা মনের আড়ালে চলেছে বেড়ে। নিজের চেষ্টায় নিভৃতে চলে মনঃসংযোগের সাধনা। বিবেকানন্দ যেমন একদিকে তাঁর মনকে আকৃষ্ট করে এনেছিলেন জীব-সেবার আদর্শে, অন্যদিকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁকে শিখিয়েছিলেন জীবনকে ছাড়িয়ে জীবনাতীতের দিকে ফিরে চাইতে। জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য জানবার জন্যে, শাস্ত্র হিসাবে দর্শনকে আয়ত্ত করবার জন্যে জেগে ওঠে তীব্র মানসিক ক্ষুধা।

সেই সময় শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী থেকে 'আর্য্য' সম্পাদনা করছেন। 'আর্য্যে'র প্রত্যেক পাতায় ভারত-ঋষির যোগ-সমন্বয়-সাধনার অপরূপ ব্যাখ্যা তখন প্রকাশিত হচ্ছে। তত্ত্বান্বেষী তরুণ সুভাষচন্দ্র শ্রীঅরবিন্দের রচনার মধ্যে দেখতে পেলেন তাঁর বুভুক্ষু মনের খাদ্য। ভারত-সাধনার বৈশিষ্ট্য এবং আত্মিক উন্মেষের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর মনে আর কোন সংশয়ই রইলো না। শ্রীঅরবিন্দের রচনা তিনি একান্ত নিষ্ঠা সহকারে অনুশীলন করতে লাগলেন এবং তার ফলে সেদিন তাঁর মনে আত্মিক-সাধনার যে চরম সার্থকতার রূপ ফুটে ওঠে, তাতেই তাঁর মানসিক জীবনের ভিত্তি রচিত হয়। সেইজন্যে য়ুরোপীয় দর্শনের একনিষ্ঠ ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর মনে য়ুরোপীয় দর্শন বা মতবাদের কোন প্রভাব আমরা দেখতে পাই না।

সেইখানেই পণ্ডিত জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্রের মানসিক গঠনের পার্থক্য স্পষ্টভাবে দেখা যায়। পণ্ডিত জওহরলালের সমস্ত স্বদেশ-প্রীতি সত্ত্বেও তাঁর মন একান্তভাবে পাশ্চাত্য দর্শনবাদের বা মত-বাদের দ্বারা অভিভূত; সুভাষচন্দ্রের সমস্ত পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁর মানসিক গঠন একান্তভাবে ভারতীয়। পণ্ডিত জওহর-লাল তাঁর ভারত-ইতিহাসের নাম দিয়েছেন Discovery of India, কিন্তু তিনি মস্তিষ্ক দিয়ে ভারত-ইতিহাসের বহিরঙ্গের সুষমাকেই আবিষ্কার করেছেন, তার অন্তরঙ্গ অন্তরকে উপলব্ধি করতে পারেন নি।

এই সময় সুভাষচন্দ্রের মনে আর এক দিক থেকে আর একটি প্রভাব এসে পড়ে। আত্মিক সাধনা ছাড়া জন-সেবার মধ্যে দিয়ে ক্রমশ নিজের দেশের রাজনৈতিক ভাগ্য সম্বন্ধে তিনি ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠছিলেন। কলকাতায় তরুণ বন্ধু-সমাজের প্রভাবে তাঁর দৃষ্টি সেদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হতে থাকে। এই দিক থেকে সুভাষচন্দ্র সেই সময় পরম শ্রদ্ধেয় এক পুরুষ-সিংহের পরিচয় পেলেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তখন সিংহ ক্রমশ বৃদ্ধ হয়ে আসছেন, তাঁর যৌবনের সে রুদ্র মধ্যাহ্নদীপ্তি তখন অপরাহ্ণে মেঘমেদুর হয়ে আসছে, তথাপি সিংহ, তখনও সিংহ। তখনো তাঁর কম্বুকণ্ঠ মেঘগর্জ্জনের মতন টাউনহলের সেই বিরাট প্রাঙ্গণকে কাঁপিয়ে তুলছে···সে-কণ্ঠের ভীম-ঐশ্বর্য্য যিনি না শুনেছেন, তাঁকে বোঝানো যাবে না। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার প্রভাব তরুণ সুভাষচন্দ্রের মনে গভীর ভাবে এসে পড়ে এবং তার ফলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার দিকে তাঁর দৃষ্টি ক্রমশ আকৃষ্ট হতে থাকে।

কিন্তু এই সব বিভিন্ন প্রভাবের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের বাণীর প্রভাবই সুভাষচন্দ্রের মনকে সেই সময় বিশেষভাবে আবিষ্ট করে তোলে। সেই সময় তাঁর পরিবারের মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। তাঁর বড়দা প্রায়ই শ্রীঅরবিন্দের একটি বিশেষ বাণী তাঁদের সামনে বলতেন, সেই বাণীটি তরুণ সুভাষচন্দ্রের মনে গাঁথা হয়ে যায় এবং তাঁর চলার পথকে সেই সময় আলোকিত করে তোলে।

"আমার অন্তরের একমাত্র বাসনা, আমি দেখতে যাই, অন্তত

তোমরা কয়েকজনও সত্যিকারের মহৎ জীবনকে বরণ করে নিয়েছ... সত্যিকারের মহৎ হয়েছ। তোমার নিজের জন্যে নয়, ভারত-বর্ষের জন্যে, ভারতবর্ষ যাতে বিশ্ব-সভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, তারি জন্যে আজ তোমাকে মহৎ হতে হবে। তোমাদের মধ্যে যারা দরিদ্র, যারা পরিচয়হীন, তোমাদের সেই দারিদ্র্য, সেই নিঃসঙ্গতা দিয়েই দেশজননীর সেবা কর। "Work that she might prosp3r, suffer that she might rejoice !"

শ্রীঅরবিন্দের অনুপম ভাষায় এই শেষ উক্তিটি তরুণ সুভাষ-চন্দ্রের মনের মণি-কোঠায় অমূল্য রত্নের মতন সঞ্চিত হয়ে থাকে। জাতীয়তার অমর কবি শ্রীঅরবিন্দের অগ্নিময়ী বাণী তরুণের মনে জ্বেলে দেয় দেশ-প্রেমের পঞ্চ-প্রদীপ।

কিন্তু ভাবের স্বর্গলোক থেকে প্রত্যক্ষ কর্ম্মের ধূলি-পথে নেমে আসা অনায়াসেই সম্ভব হয় না। নিজের মনে যে স্বপ্নের জাল বুনে চলেছিলেন, তরুণ সুভাষচন্দ্র ক্রমশ বুঝতে পারেন, সেখান-কার নৈষ্কর্ম্ম থেকে তাঁকে নেমে আসতে হবে প্রতিদিনের কাজে। কাজের মধ্যে দিয়েই সফল করে তুলতে হবে অন্তরের স্বপ্নকে।

প্রথম কৈশোরে পাড়ায় পাড়ায় রোগীর সেবার মধ্যে দিয়ে তিনি সামাজিক কাজের প্রথম আস্বাদ লাভ করেছিলেন কিন্তু সেখানে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের এবং বাড়ীর প্রতিবন্ধকতাই বড় হয়েছিল। যে আবেষ্টনী এবং পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছেন এবং যার মধ্যে তাঁকে বাস করতে হয়, সেখানে এই-জাতীয় কাজের অনুকূল আবহাওয়া ছিল না। তার ফলে, মনের মধ্যে একটা বিপুল সংস্কার এই-জাতীয় কাজের বাধাস্বরূপই ছিল। সহরে এসে প্রত্যক্ষ কাজে নামতে গিয়ে তরুণ সুভাষ-চন্দ্র নিজের মনের সেই সংগোপন বাধার দর্শন পেলেন।

শুধু বসে বসে স্বপ্ন না দেখে, কোন কিছু একটা করার জন্যে তাঁর মন সেই সময় রীতিমত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অনুসন্ধানের ফলে তাঁদের অঞ্চলে একটা সমিতির সন্ধান পেলেন, সেই সমিতির সভ্যরা দরিদ্রদের সেবার জন্যে লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে ভিক্ষা সংগ্রহ করে। সুভাষচন্দ্র সেই সমিতিতে যোগদান করলেন। প্রতি রবিবার সকাল বেলা সমিতির সভ্যরা ঝোলা কাঁধে নিয়ে

লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে টাকা পয়সা আর চাল সংগ্রহ করতো। সুভাষচন্দ্র একদিন রবিবার এই দলের সঙ্গে ভিক্ষায় বেরুলেন। ভিক্ষায় বেরিয়ে তিনি নিজের মনের ভেতর সংগোপন ভদ্রতাভিমানী সেই সংস্কারের দেখা পেলেন। কেমন যেন লজ্জা আর সঙ্কোচ বোধ হতে লাগলো। বিশেষ করে ভয় হতে লাগলো, যদি পরিচিত কারুর সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই বাড়ীতে জানাজানি হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম এই সঙ্কোচ আর আশঙ্কা তাঁকে এতখানি পেয়ে বসেছিল যে, ভিক্ষায় বেরিয়ে তিনি আশে-পাশে চোখ তুলে চাইতেন না, যদি কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখাদেখি হয়ে যায়। বহু চেষ্টার ফলে নিজের এই সঙ্কোচকে দূর করতে হয়। এমনিধারা ছোটবড় বহু আত্মাভিমান, বহু জীর্ণ সংস্কারের প্রেতাত্মা মনের ভিতর লুকিয়ে থেকে কর্ম্মের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তরুণ সুভাষচন্দ্র বুঝলেন, একমাত্র প্রত্যক্ষ কর্ম্মের মধ্যে দিয়েই এই সঙ্কোচের দৈন্যকে দূর করা সম্ভব। তাই, যখনি সুযোগ পেতেন, চেষ্টা করতেন, বাইরের সাধারণ জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতে।

১৫

একদিন বাড়ীর বাইরের ঘরে, যেখানে বসে তাঁরা পড়াশোনা করেন, তাঁর ছোট মামা রণেন্দ্র দেখেন সারি বেঁধে পিঁপড়ের দল চলেছে···তাদের অনুসরণ করে দেখেন, তারা চলেছে বই-এর আলমারীর ভেতর···বই-এর থাকের আড়াল থেকে তারা দলে দলে আসছে আর যাচ্ছে।

হঠাৎ সেই শুষ্ক বই-এর মধ্যে তারা কি মধুর-রসের সন্ধান পেলো, কৌতূহলী হয়ে দেখতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, বই-এর থাকের পেছনে দুখানি হাতে-তৈরী রুটি পড়ে রয়েছে···তারি সন্ধান পেয়ে পিঁপড়ের দল লাইন বেঁধে চলেছে। বই-এর আলমারীর মধ্যে রুটি লুকিয়ে রাখলো কে? আর এভাবে দুখানি রুটি লুকিয়ে রাখবারই মানে কি?

এমন সময় সুভাষচন্দ্র এসে পড়লেন। মামার আবিষ্কারে তিনি শঙ্কিত হয়ে বলে উঠলেন, চুপ্, চুপ্, কেউ যেন জানতে না পারে, আমিই রেখেছি!

রণেন্দ্র বিস্মিত হয়ে তার তাৎপর্য্য জানতে চাইলেন।

সুভাষচন্দ্র বল্লেন, বাড়ীর সামনে রাস্তায় যে বুড়ী ভিখারিণীটি বসে, বিকেলের জলখাবারের রুটি থেকে তাকে দুখানা করে দিই। কালকে বুড়ীটিকে দেখতে পাই নি…তাই তার জন্যে তুলে রেখে দিয়েছি!

বাড়ী থেকে ট্রাম লাইন পর্য্যন্ত যেটুকু রাস্তা পায়ে হেঁটে যেতে হয়, তার দুই ফুটপাতে অন্ধ, খঞ্জ যারা বসতো, তারা এই সৌম্য-দর্শন ছাত্রটিকে বিশেষ করে চিনে রেখেছিল, কলেজে বেরুবার সময় পাথেয় যা কিছু পকেটে থাকতো, অনেকদিন, একটি দুটি করে দিতে দিতে ফুরিয়ে যেতো। অগত্যা হেঁটে কলেজে আসতে হতো। কলেজের দেরী হয়ে যেতো। তরুণ ছাত্র তাতে খুব বেশী ক্ষুণ্ণ হতো না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে-ছাত্র এতখানি কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, কলেজে পড়তে গিয়ে, কলেজের পড়ার দিকে বা পাঠ্যবই-এর দিকে তার বিশেষ কোন আগ্রহই দেখা গেল না। নানা দিক থেকে তখন মনের ভেতর যে সব ভাবের তরঙ্গ উঠছিল, তাতে পাঠ্য-পুস্তক কোথায় ভেসে চলে গেল। একদিকে অরবিন্দের যোগ-সমন্বয়, চিত্তশুদ্ধির সাধনা আর একদিকে দুঃখ-দৈন্য-ভরা প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনা, মনের দুই মেরুতে দুবেলা যাতায়াতে অবজ্ঞাত পড়ে থাকে লজিক আর ইতিহাসের বই।

তরুণ ছাত্রের অকাল-বর্দ্ধিত মন তখন গভীর ভাবে আর এক প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে ব্যস্ত, ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য হয়, এই জগৎ যদি একান্তই মিথ্যা, তাহলে অকারণে এই পুঁথি-পড়া আর বই-মুখস্থ করা কেন?

সেই চরম সত্যকে জানাই হলো পরম জ্ঞান…সেই জ্ঞান পেলে অন্য আর বিদ্যার প্রয়োজন কি?

তত্ত্বপিপাসু মন চোখের সামনেই দেখতে পায়, ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দের জীবন, শ্রীঅরবিন্দের নিভৃত তপস্যা।

বৈরাগ্য-সুন্দর তপস্যার মূর্ত্তি তীব্রভাবে আকর্ষণ করে উদ্বেল তরুণ মনকে।

কয়েকজন বন্ধু মিলে স্থির করেন, নিভৃতে গঙ্গার তীরে অবকাশ সময়ে তাঁরাও করবেন বৈরাগ্য সাধনা।

অনুসন্ধানের পর শান্তিপুরে গঙ্গার ধারে একটা পুরানো ভাঙ্গা বাড়ীর সন্ধান তাঁরা পেলেন। ভারত পোদ্দারের বাড়ী। পরিত্যক্ত জীর্ণ। তরুণ তপস্বীর দল সেই বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন এবং নিষ্ঠাসহকারে কৃচ্ছ্র-সাধনার অভ্যাস করতে লাগলেন।

গৃহীর চিহ্ন যে-যার কাপড়-জামা পরিত্যাগ করে গেরুয়া পরিধান করলেন। উদর অন্নের জন্যে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করেন। গৃহস্থের দ্বার থেকে প্রতিদিনের প্রয়োজন ভিক্ষা করে আনেন। স্বপাক ভোজন। আবক্ষ-গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে ধ্যান।

কবি যেমন প্রথম প্রকাশ-ব্যাকুলতায় সামনে যা পায়, তাকেই আশ্রয় করে,—যা স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে ভেতর থেকে উদ্গত হয়, তাকেই বরণ করে নেয়, খুঁজে মরে শত ব্যর্থ ছন্দের প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে নিজের চরম ছন্দটিকে...তেমনি চলে আত্ম-প্রকাশ-ব্যাকুল তরুণ তপস্বীর বিভিন্ন সাধন-প্রয়াস···বহুপ্রয়াসের মধ্যে দিয়ে চলে চরম অনুসন্ধান···নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে বার করার আকুল প্রয়াস···

গেরুয়াধারী সেই নবীন নিমাইদের দেখে, বৃদ্ধা স্নানার্থিনীরা অশ্রু-সজল চোখে তাঁদের পুত্র-দর্শন-কাতরা জননীদের কথা ভেবে বলে ওঠেন, ছিঃ বাবা, এই বয়সে মা বাপের বুকে শেল হেনে কি বাড়ী ছাড়তে হয়? বাড়ী ফিরে যাও, মার বুকের ধন, মার কাছে ফিরে যাও বাছারা!

১৬

অবকাশ ফুরিয়ে আসে। ফিরে আসতে হয় আবার কলেজে। কিন্তু কলেজের বই ধরে রাখতে পারে না মন। সব প্রয়াসের তলায় তলায় তখনও তীব্রভাবে জেগে থাকে, উপযুক্ত গুরু লাভের বাসনা। উপযুক্ত গুরু না হলে এই সাধন পথে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং একজন উপযুক্ত গুরু খুঁজে বার করা আসল প্রয়োজন।

তাই সাধু সন্ন্যাসীর খবর পেলেই সেখানে ছুটে যান। বন্ধু হেমন্তকুমারের কাছ থেকে এই সময় সন্ধান পেলেন কৃষ্ণনগরের

বাইরে জলাঙ্গীর ধারে একজন সত্যিকারের সাধু এসেছেন। সুভাষচন্দ্র সেই সাধুর সন্ধানে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলেন। মুক্ত আকাশের তলায় ছোট্ট নদীটির ধারে সেই সাধুর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর অন্তর তৃপ্ত হয় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে অন্তরের পিপাসা আরো তীব্র হয়ে উঠে। এই অতৃপ্ত অন্তরের মহা-পিপাসাকে মেটাবে, কোথায় সেই দুর্লভ গুরু? যাকেই দেখেন, কেউই অন্তরের সেই দাবী মেটাতে পারে না।

অবশেষে একদিন (১৯১৪) তখন কলেজে গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবকাশ সুরু হয়েছে, স্থির করলেন, বাড়ীতে কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি গুরুর সন্ধানে ভারত-পরিভ্রমণে বেরুবেন। তীর্থময় উত্তর ভারত···নিশ্চয়ই সেখানে তিনি তাঁর অন্তরের ঈপ্সিত পরম পুরুষের সন্ধান পেয়ে যাবেন।

এই বাসনা নিয়ে একদিন তিনি বাড়ীতে কাউকে কিছু না জানিয়ে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়লেন। লছমন-ঝোলা, হৃষিকেশ, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, বারাণসী, গয়া, উত্তর ভারতের প্রত্যেক প্রধান তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান। হিমালয়ের পাদদেশে বহু সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমে সন্ধান করেন। গুরুকুল আর ঋষিকুলের বিদ্যায়তনে গিয়ে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা লক্ষ্য করেন। দিল্লী আর আগ্রায় ঐতিহাসিক ভারতের মর্ম্মর-স্মৃতির সামনে দাঁড়িয়ে বিলুপ্ত ভারত-ঐশ্বর্য্যকে অনুধ্যান করেন। কিন্তু কোথাও মনের মানুষের সন্ধান পান না।

পরিবর্ত্তে আদর্শ-বাদী তরুণ মন রূঢ় আঘাতই পায়; অতীত ভারতের স্বপ্নে আচ্ছন্ন মনে ভারতের নির্ম্মম কদর্য্যতা প্রাণে রূঢ় আঘাত হানে। হরিদ্বারে এক পান্থ-নিবাসে পশ্চিমা ব্রাহ্মণেরা তাঁকে অন্ন-পরিবেশন করতে দ্বিধা করলো, তাঁদের কাছে বাঙালীরা অস্পৃশ্য কারণ তারা মাছ খায়। গয়াতেও সেই অভিজ্ঞতা লাভ হয়। শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রতিষ্ঠিত এক মঠে যখন তিনি খেতে বসবেন, পরিবেশক এসে তাঁকে সরে দূরে বসতে আদেশ করলো, কারণ তিনি অস্পৃশ্য বাঙালী। সুভাষচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে শঙ্করের উদার শ্লোক আবৃত্তি করে পরিবেশককে শোনালেন কিন্তু তাতে কোন ফলই হলো না। এক জায়গায় পাতকূয়োর জল ছুঁতে তিনি নিষিদ্ধ

হলেন। দেখলেন, সমগ্র ভারতে কি ভাবে ভেদ-ধর্ম্ম তীব্র সংস্কারের রূপে মানুষের মেদ-মজ্জায় মিশে গিয়েছে এবং যে-ধর্ম্ম সর্ব্ব-ভেদের উর্দ্ধে সর্ব্ব-মানবের সমন্বয় ঘোষণা করেছে, তারই নাম নিয়ে আজ সেই ধর্ম্মের পরিচালকেরা হিন্দুধর্ম্মকে জগতের কাছে অপব্যাখ্যা করছে।

ব্যর্থ ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বারানসীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিষ্ঠাসহকারে সেই তরুণ তীর্থ-যাত্রীর অন্তরের আকাঙ্ক্ষার কথা শুনলেন। বিচার করে তিনি পরামর্শ দিলেন, এভাবে ঘুরে বেড়ালে গুরু লাভ হবে না। তার জন্যে উপযুক্ত সময়ের প্রয়োজন। সে-সময় এখনো আসেনি। তাই তিনি ফিরে যাবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথায় এবং নিজের অন্বেষণে ব্যর্থ-কাম হয়ে সুভাষচন্দ্র দুমাস পরে বাড়ী ফিরে এলেন। বাড়ীতে তখন খবরের কাগজে ঘোষণা, থানায় খবর দেওয়া সবই হয়ে গিয়েছে। শেষকালে এক গণকের তাঁরা শরণাপন্ন হন। গণক ঠাকুর গণনা করে নাকি আশ্বাস দিয়েছিলেন, ভয় পাবার কিছু নেই···পলাতক সুস্থই আছে এবং এখন যে শহরে রয়েছে, সেই শহরের আদ্য অক্ষর হচ্ছে "ব"। সেই কথা শুনে, সুভাষচন্দ্রের আত্মীয়দের বৈদ্যনাথধামের কথাই মনে পড়ে, কারণ সেখানে তাঁদের কোন আত্মীয় তখন ছিলেন। তাই পলাতকের সন্ধানে তাঁরা বৈদ্যনাথধামে লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পলাতক এলেন আর এক "ব"-শহর থেকে।

বাড়ী ফিরে আসার দিনের কথা সুভাষচন্দ্র একপত্রে নিজেই লিখেছেন,

"ট্রাম থেকে নেমে বুক টান করে বাড়ীতে ঢুকলাম। মামা আর একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে বাইরের ঘরে দেখা হলো। তাঁরা একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন···মার কাছে খবর গেলো। অর্দ্ধেক পথে তাঁর সঙ্গে দেখা, প্রণাম করলাম···তিনি থাকতে না পেরে কেঁদে উঠলেন। পরে এইমাত্র শুধু বল্লেন, আমার মৃত্যুর জন্যেই তোর জন্ম। বাবার সঙ্গে দেখা। প্রণাম করলাম···তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে তাঁর ঘরে টেনে নিয়ে এলেন। অর্দ্ধেক পথে আমি কেঁদে ফেল্লাম···

দেখলাম বাবারও চোখে জল। তিনি শুয়ে পড়লেন, আমি নীরবে ধীরে ধীরে তাঁর পায়ে হাত বুলাতে লাগলাম…”.

দ্বিপ্রহরে পিতা-পুত্রে এই সম্পর্কে কথা হলো।

পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, সংসারে থেকে কি ধর্ম হয় না?

পুত্র উত্তর দিলেন, সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা নয়…সকলের পক্ষে এক ওষুধ হতে পারে না, কেন না সকলের রোগ এক নয়। সামর্থ্যও এক নয়।

পিতা—কিন্তু তুমি যে পথ গ্রহণ করতে চাইছো, তার জন্যে তো preparation দরকার?

পুত্র সংস্কারের ওপর অনেকখানি নির্ভর করা যায়।

পিতা—কিন্তু তার জন্যে কর্ত্তব্য ত্যাগ, সেটা কি ঠিক?

পুত্র—কর্ত্তব্য কথাটা relative…higher call-এ সাড়া দিতে হলে lower call-গুলোকে অবজ্ঞা করতেই হয়।

পুত্রের কথায় পিতা বুঝলেন, যে-প্রেরণা তাঁর পুত্রকে ঘর থেকে টেনে নিয়েছিল, সে শুধু ক্ষণিক উচ্ছ্বাস বা আবেগের ফল নয়…তার চেয়েও বৃহত্তর একটা কিছু তার পেছনে আছে।

শেষকালে পিতা পুত্রের কথা স্বীকার করে বল্লেন, বেশ, তোমার যখন সেই higher call আসবে, তখন দেখবো!

যেদিন সেই আহ্বান এলো, সেদিন তা দেখবার জন্যে জানকীনাথ জীবিত ছিলেন না।

গুরুর সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেন ঘরে। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা কয়টি তাঁর চোখের সামনে অহরহ জেগে থাকে, সময় হয়নি এখনো!

কবে আসবে সে শুভ-সময়? জীবনের মহালগ্ন!

জীবন মানেই হয়ত সেই মহালগ্নকে এগিয়ে আনার আয়োজন।

সেই বিশ্বাসে তরুণ আদর্শবাদী নিজের অন্তরকে গ্রহণ-উন্মুখ করে রাখে…উৎকর্ণ হয়ে থাকেন, সে-আহ্বান যেন ব্যর্থ হয়ে ফিরে না যায়।

ভেতরে ভেতরে চলে তার আয়োজন, বাইরে ফুটে ওঠে না তার কোন আক্ষেপ।

বাইরে থেকে দেখলে* মনে হয়, শান্ত, নির্বিকার, দ্বন্দ্বহীন, স্থির।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে চলেছে গতির ঘূর্ণাবর্ত্ত।

সকলের সঙ্গে মেশেন, ঘোরেন, কিন্তু সকলের থেকে আলাদা।

বাইরে গেরুয়া পরা হলো না কিন্তু অন্তর ভরে জেগে রইলো পরম বৈরাগী।

ব্রতধারী ব্রহ্মচারী। আড়ম্বরহীন, নিঃশব্দ।

১৭

তুটি বৎসর কেটে গেল, নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে। মনের নির্দ্দেশমত কলেজের পুঁথিপত্র থেকে একরকম দূরেই এই তু'বছর রইলেন। কলেজের পাঠ্য পুস্তক অযত্নে অর্দ্ধ-পঠিত রয়ে গেল। তাই আই-এ পরীক্ষার ফল যখন বেরুলো তখন দেখা গেল সুভাষচন্দ্র সাধারণ ছেলের মতন কোন-রকমে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আত্মীয়-স্বজন সকলে বিস্মিত হয়ে গেলেন। যে ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করবে, সে কি না বহু সহস্রের মধ্যে একজন হয়ে রইলো?

তাঁর অন্তরে তখন যে আলোড়ন চলেছিল, তার কথা বাইরে কেউই জানতেন না। আত্মিক জীবনের প্রতি আগ্রহ তখন এত তীব্র ছিল যে তাকে সরিয়ে কোন রাজনৈতিক মতবাদ তখনও পর্য্যন্ত তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। রাজনীতির জগৎ থেকে, তখনও পর্য্যন্ত তিনি বহুদূরে ছিলেন। তুটি ঘটনার ধারা ক্রমশ তাঁর মনকে ভারতীয় রাজনীতির বাস্তবতা সম্বন্ধে সচেতন করে তুললো। একটি হলো, ব্যবহারিক জীবনে ইংরেজ আর দেশী লোকদের সুযোগ-সুবিধার তারতম্য এবং তার জন্যে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ, আর একটি হলো, প্রথম মহাযুদ্ধ।

আগেই বলেছি, প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের মধ্যে, সেই সময় একদল ছাত্র ছিল, যারা সংগোপনে বিপ্লবী-দলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। সেই সময় বাংলায় যাঁরা সন্ত্রাসবাদের দ্বারা বৃটীশ মর্য্যাদাকে আঘাত করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁরা এই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তাঁদের ভবিষ্যৎ সৈনিকদের সন্ধান করে বেড়াতেন। সেইজন্যে এই কলেজের ছাত্র-সমাজের ভেতরে

একদল ছেলে ছিল, যারা বিপ্লববাদকে ধর্ম্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সুভাষচন্দ্র তাদের সংস্পর্শে আসেন এবং গভীর ভাবেই আসেন, বিশ্বাস কিন্তু তখন তাঁর মনের সবখানি জুড়ে এক আত্মিক বিশ্বাস প্রবল হয়ে ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, যৌগিক সাধনার দ্বারা আগে আত্মিক শক্তি লাভ করতে হ'বে—এবং সেই শক্তিই পথ-নির্দ্দেশ করে দেবে। সেইজন্যে সহপাঠী বিপ্লবী বন্ধুদের সন্ত্রাসবাদের আদর্শ সেই সময় তাঁর মনে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তা ছাড়া, যে-পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, স্বভাবতই তার প্রভাবে তাঁর মনে একটা আল্‌গা ধারণা ছিল যে, ইংরেজের সংস্পর্শ ভারতবর্ষের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু।

ক্রমশ বাইরের কতকগুলি ঘটনায় তাঁর এই ধারণা বদলাতে সুরু করলো। সেই সময় ইংরেজ টমিদের উৎপাত এবং শ্বেতাঙ্গদের জাত্যাভিমান একান্ত রূঢ়ভাবে তীব্র হয়ে ওঠে। এক ট্রেণের কামরায় তারা ধুতি-পরা দেশী লোকদের সহ্য করতে পারতো না; ক্লাবে, হোটেলে, বিলিতী থিয়েটারে দেশী লোকেরা অপাংক্তেয় ছিল। পথে ঘাটে ট্রেণে প্রায়ই শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে দেশী লোকদের সংঘর্ষ হতে লাগলো। শ্বেতাঙ্গদের হাতে অন্যায়ভাবে নির্য্যাতিত হতে হতে ক্রমশ দেশী লোকরা আঘাতের বদলে আঘাত ফিরিয়ে দিতে লাগলো এবং তার ফলে তারা দেখলো, মুখের ভদ্রকথায় যা এতদিন সম্ভব হয় নি, এই উল্‌টো-কিলে তা সম্ভব হচ্ছে। তাই এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, ইংরেজ আঘাতের যুক্তিকেই বোঝে সুতরাং সেই যুক্তি দিয়েই তার সঙ্গে যুঝতে হবে। সুভাষচন্দ্রের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ কেউ এই শ্বেতাঙ্গ বর্ব্বরতার সঙ্গে পরিচিত হলেন। ক্রমশ এই সব ঘটনা তরুণ যোগ-বিলাসীর চিত্তে রাজনৈতিক বাস্তবতার একটা প্রতি-ক্রিয়া এনে দিতে লাগলো। সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করলেন, বিজেতা শ্বেতাঙ্গ-জাতির এই নির্ম্মম জাতি-বিদ্বেষ জাতীয় অস্তিত্বের পক্ষে এত বড় একটা বাধা যে তাকে বিদূরিত না করতে পারলে, ভারতবাসী হিসাবে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

এই সময় তিনি কিছুদিন রোগে শয্যাগ্রহণ করতে বাধ্য

হন। তখন মহাযুদ্ধ তীব্রভাবে সুরু হয়ে গিয়েছে। এই যুদ্ধের কাহিনী পড়তে পড়তে তরুণ ছাত্র বুঝতে পারে যে, শুধু আত্মিক সাধনায় কোন জাতি আজকের জগতে টিকে থাকতে পারে না, আজকের জগতে জাতি হিসাবে টিকে থাকতে হলে তাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তিতে বলশালী হতে হবে। ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে তার বাস্তব দুর্দ্দশা ও শস্ত্রহীন অসহায়তার কথা সুভাষচন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন। এবং এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে রাজনৈতিক চিন্তার উন্মেষ হতে থাকে।

এই সময় একটী ঘটনা একান্ত রূঢ়ভাবে তাঁকে তাঁর আত্মিক সাধনার সংগোপনতা থেকে সজাগ করে তুলল। বস্তুত এই ঘটনাটীই তাঁর জীবনের প্রথম সব চেয়ে বড় পরিবর্ত্তনের সূচনা এনে দিল। যে-শ্বেতাঙ্গ জাত্যাভিমানের কুৎসিৎ অভিব্যক্তি সারা ভারতবর্ষে তখন ছড়িয়ে ছিল, প্রেসিডেন্সী কলেজের শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক-সমাজের কেউ কেউ তার প্রধান পাণ্ডা ছিলেন।

আই-এ পাশ করার পর সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে দর্শনশাস্ত্রের ছাত্ররূপে বি-এ পড়তে সুরু করেন। সাধারণ ছাত্র যেভাবে বি-এ পাশ করবার জন্যে বিষয় নির্বাচন করে, সুভাষচন্দ্র তা করেন নি। দর্শনের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, দর্শনশাস্ত্রের শেষ কথা কি। তাই তিনি সেই সময় গভীরভাবে এবং ব্যাপকভাবে দর্শন পড়তে সুরু করেন।

তাঁর সেই দার্শনিক মনোভাবে রূঢ় আঘাত করলেন, কলেজের স্বনামখ্যাত ইংরেজীসাহিত্যের অধ্যাপক মিঃ ওটেন। সুভাষচন্দ্র তখন কলেজের লাইব্রেরী ঘরে বসে বই পড়ছিলেন। তিনি শুনলেন, ওটেন সাহেবের ক্লাসের সামনে বিশ্রী গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে। ওটেন যখন ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন, সেই সময় ক্লাসের সামনের বারাণ্ডা দিয়ে একদল ছেলে যাচ্ছিল। ছেলেরা নাকি এমন গোলমাল করে, যাতে ওটেন সাহেব বিরক্ত হয়ে ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে সামনে যে ছেলেদের দেখতে পান, তাদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং অভদ্রভাষায় গালাগাল দিয়েছিলেন।

সেই সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের আভ্যন্তরিক শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক ক্লাসের ছাত্রদের মধ্য থেকে একজনকে তাদের প্রতিনিধি নির্দ্ধারিত করা হতো, সেই ক্লাস সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারের জন্য সেই নির্দ্ধারিত প্রতিনিধিই দায়ী থাকতো এবং তার সঙ্গেই কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ আলোচনা করতেন। অপমানিত ছাত্রদের প্রতিনিধিরূপে সুভাষচন্দ্র যখন অধ্যক্ষ জেম্‌স্‌ সাহেবের কাছে গিয়ে নালিশ জানালেন, জেম্‌স্‌ সাহেব বল্লেন, ওটেন সাহেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে তোমরা মিটমাট করে নাও।

সুভাষচন্দ্র শুনে বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, বাঃ! চমৎকার বিচার! আহত হলাম আমরা, আর আমরাই ক্ষমা চাইবো!

আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

প্রত্যেক ধর্ম্মঘটী ছাত্রকে পাঁচ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে··· ওটেন সাহেব সভায়, তাঁর ব্যবহারের জন্যে তিনি sorry হয়েছেন বলবেন···

হলোও তাই।

কিন্তু ওটেন সাহেব পরের দিন ক্লাসে ঢুকেই একদল ছেলেকে ক্লাস থেকে বার করে দিলেন।

তাদের অপরাধ, তারা আগের দিন তাঁর ক্লাসে আসেনি।

বাঙালী হলেও, ধৈর্য্যের সীমা আছে।

ছাত্রদের মনের তাপ বাড়তে থাকে।

তার কয়েকদিন পরে। ওটেন সাহেব পড়াচ্ছেন। সেই আবার বারান্দায় শব্দ।

ওটেন সাহেবকেই ক্ষমা চাইতে হবে।

জেম্‌স্‌ সাহেব বল্লেন, তা অসম্ভব।

ছাত্ররা ধর্ম্মঘট ঘোষণা করলো। প্রেসিডেন্সী কলেজ···কলকাতার অভিজাত-শ্রেণীর ছেলেরা যেখানে হবু-ম্যাজিষ্ট্রেটের শিক্ষা পায়— সেখানে ধর্ম্মঘট! তাও কি না সাহেব-অধ্যক্ষের প্রতিবাদে!

ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছে চিঠি গেল। কেউ রায়বাহাদুর, কেউ রায়সাহেব, কেউ নাইট, কেউ বা সামনের নব-বর্ষে নাইট হবেন! তাঁরা ছেলেদের ওপর চাপ দিতে লাগলেন।

এধারে কলেজে অন্য সব অধ্যাপক বিচলিত হয়ে উঠলেন।

ভারতীয় ছাত্র···যারা গুরুকে দেবতার মত দেখতে অভ্যস্ত··· তাদের এ কি কাণ্ড! বিশেষত প্রেসিডেন্সী কলেজে, সরকারের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ?

সাহেব ছুটে এসে চীৎকার করে উঠলেন, Dont chatter like monkies !

বলেই আবার ক্লাসে ঢুকলেন।

এমন সময় বাইরে কে কাকে ডাকলো, পঞ্চানন !

শব্দভেদী বাণ সাহেবের বুকে গিয়ে বিঁধলো। তিনি ভাবলেন, তাঁকে অপমান করবার জন্যেই ঐ শব্দ।

তৎক্ষণাৎ ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন।

সামনে পড়লো কমলাভূষণ বসু নামে এক ছাত্র।

রাস্কেল—বলে ঘাড় ধরে তাকে টানতে টানতে একেবারে ষ্টুয়ার্ডের ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির।

জরিমানা!

কলেজের অন্যত্র তখন সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে ওয়ার-কাউন্সিল বসেছে।

বারবার এই অপমান, এভাবে মাথা পেতে নেওয়া মনুষ্যত্বের বিরোধী!

সুভাষচন্দ্র পরামর্শ দেন, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কোন কিছু করা ঠিক নয়···যদি কিছু করতে হয় একটা প্ল্যান অনুযায়ী করতে হবে।

১৮

ঠিক আড়াইটার সময় ওটেন সাহেব সিঁড়ি দিয়ে নামছেন।

সিঁড়ি শেষ হতে আর ছ'সাতটা ধাপ আছে···এমন সময় পেছন দিক থেকে সাহেবের শাদা গায়ে কে সজোরে লাথি মারলো··· সাহেব হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল···সঙ্গে সঙ্গে চড়···কিল···ঘুষি···

খবর পেয়ে গিল্‌ক্রাইষ্ট সাহেব তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। দেখেন, ওটেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। কেউ কোথাও নেই। দারোয়ান ছুটে এলো। একজন ছাত্রও এলো। তিনজন ধরাধরি করে সাহেবকে ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো।

অধ্যক্ষ জেম্‌স্ সাহেব বলে উঠলেন, I want to see the blood of the culprits !

১৯

হুলুস্থুল পড়ে গেল।

বিচার-সভা বসলো। সাক্ষী-সাবুদ, তদন্ত চলতে লাগলো। কোনমতেই সন্ধান পাওয়া যায় না, কে অপরাধী! শেষকালে একটা হদিস্ পাওয়া গেল। দরোয়ান বংশী দেখেছে।

সাহেব বংশীকে জেরা করেন।

বংশী বলে, দোহাই সাহেব, বল্লে আমাকে মেরে ফেলবে!

বংশীর মুখ থেকে অপরাধীর নাম বার করবার জন্যে তখন এক ফন্দী করা হলো। মাঝখানে একটা পর্দা। পর্দার ভেতর দিয়ে বিচার-ঘর দেখা যায়।

বিচার-সভায় এক একজন ছাত্রকে ডেকে এনে জেরা করা হতে লাগলো।

এক একজন চলে যায়, আর বংশীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এই ছেলে?

বংশী না-না বলে। শুধু দুজনের বেলায় হাঁ বল্লো, একজন সুভাষচন্দ্র···আর একজন আনন্দমোহন দাম।

বিচার-সভা সুভাষচন্দ্রকেই এই দুর্বিনীত দলের নেতা সাব্যস্ত করলো।

জেমস্ সাহেব আলাদা সুভাষচন্দ্রকে আবার ডেকে পাঠান, সোজা জিজ্ঞাসা করেন,

—তুমিই প্রহার করেছ?

—না···আমি প্রহার করিনি।

—তুমি মারবার সময় সেখানে ছিলে?

—হাঁ, ছিলাম।

—তা হলে বল কে কে মেরেছে?

—বলবো না!

—তুমি কলেজের কনসাল্টিঙ্ কমিটীর মেম্বার···এবং সেই কমিটীর নিয়ম অনুযায়ী আমাকে সাহায্য করতে তুমি বাধ্য—তা জান?

—জানি!

—এক কথায় উত্তর দাও, তুমি দোষী কি না? আর কে কে মেরেছে?

—আমি দোষী কি নির্দ্দোষ, কিছুই বলতে চাই না।

—কলেজের মধ্যে তুমিই হলে সব চেয়ে গণ্ডগোলের কারণ—তোমাকে চিরকালের মত কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো!

বিপ্লবীর প্রথম পুরস্কার!

২০

কলকাতা থেকে আবার কটকে ফিরে যান। বাড়ীতেই থাকেন। পড়াশোনা করেন। সহযাত্রী ছাত্রদের পড়ায় সহায়তা করেন।

অন্য সময়, দরিদ্রদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান।

বিবেকানন্দ তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, নতুন করে তাঁর স্বদেশকে। দরিদ্র, নিরন্ন, নিঃস্ব ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের অধিবাসী তিনি। গ্রামের ভেতরে গিয়ে দেখতে পেলেন সেই ভারতবর্ষকে।

অহরহ সমুদ্র-গর্জ্জনের মত কাণে বাজে সেই মহাসন্ন্যাসীর মাভৈ বাণী···গলিত শবদেহকে ফুল দিয়ে আর ঢেকে রেখো না ·· ঐ আসছে মহাতরঙ্গ···বল···হে মহামৃত্যু, আমি প্রস্তুত···তোমার মধ্যে রয়েছে অনন্ত শক্তি···জাগিয়ে তোলো তাকে···

একটা ব্যাপার একান্ত নিভৃতে তরুণ চিত্তকে উতলা করে তোলে। নব-যৌবনের সংগোপন যৌন-লিপ্সা। বাইরের সংযম ভেদ করে অন্তরের নিভৃত-লোকে স্বপ্নের আকারে এসে চঞ্চল করে তোলে। কামনাসিক্ত স্বপ্নে কণ্টকিত হয়ে ওঠে নিশীথের নিদ্রা।

তরুণ সাধকক্ষতবিক্ষত হয়ে যান অন্তর্দ্বন্দ্বে। কি করে রোধ করা যায়, কামনার সেই সংগোপন নৈশ-আক্রমণ?

বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণের সাহিত্য তরুণ সাধককে সত্যপথ দেখিয়ে দিয়েছে, জীবনে যদি মহৎ সাধনায় জয়ী হতে হয়, তাহলে কামকে দিতে হবে বিসর্জ্জন, জীবন-বিন্দুকে শক্তি-বিদ্যুতে পরিণত করতে হবে, রেতস্‌কে পরিবর্ত্তিত করে করতে হবে ওজস্‌। সে-

সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না তরুণ সাধকের মনে। কিন্তু কি উপায়ে তা সম্ভব ?

পথ-নির্দ্দেষ্টার অভাবে তরুণ সাধক নিজের প্রচেষ্টায় তুমুল সংগ্রাম সুরু করে দেন, সেই কাম-আক্রমণের বিরুদ্ধে। সর্ব্বদাই চলে মনের মধ্যে সজাগ সংগ্রাম। প্রত্যেক নারীকে তিনি দেখতে চেষ্টা করেন, তাঁর জননীর মূর্ত্তিতে।

সেদিনকার সেই নিভৃত সংগ্রামের বেদনার ইতিহাস তিনি নিজেই তাঁর আত্মচরিতে আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন। এবং সে-সংগ্রামে তিনি জয়ী হয়েছিলেন।*

কি এক মহা-সম্ভাবনার ইঙ্গিত দূরচক্রবালে ভেসে ওঠে···কিন্তু তার স্বরূপ বুঝতে পারেন না। শুধু জানেন, এ জীবন শুধু খাওয়া দাওয়া শোয়া-বসা নয়। কিন্তু কোন পথে আছে তার চরম বিকাশ ?

সে-প্রশ্নের কোন উত্তরই খুঁজে পান না।

তাই নিজেকে প্রস্তুত করে চলেন, যেদিন আসবে সে-আহ্বান সেদিন যেন সাড়া দিতে পারেন।

একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র নীরবে নিজেকে প্রস্তুত করে চলেন....

অধ্যয়ন···দরিদ্র-সেবা···নিভৃত-ধ্যান···চিত্তশুদ্ধি···কামনার মধু-মোহ থেকে সযত্নে নিজেকে দূরে রাখেন...

জীবন-দেবতা বড় নিষ্ঠুর···সে চায় সম্পূর্ণ মানুষটিকে সমগ্রভাবে একান্তভাবে···তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে এমন কোন জিনিসই সে সহ্য করতে পারে না···

নিষ্ঠুর স্বামিনী।

তরুণ সুভাষচন্দ্র সে-কথা বুঝেছিলেন। তাই সেই তরুণ বয়স থেকেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবেই সেই নিষ্ঠুর জীবন-দেবতার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন।

সম্পূর্ণভাবে এই আদর্শবাদ তাঁকে এই সময় আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই সময়কার তাঁর একখানি হাতের লেখা খাতা দেখেছিলাম। একটী অমূল্য স্মৃতি-চিহ্ন। সেই খাতায় টুকরো টুকরো প্রবন্ধের আকারে তিনি সেই সময় তাঁর অনেক মনের

কথা লিখেছিলেন। সেখানি তাঁর এক কলেজের বন্ধু···মুসলমান ···মহাসম্পদের মত নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু জনতার বিষ-বহ্নিতে·সেখানি এবার পুড়ে গিয়েছে।

তাতে সুভাষচন্দ্র নিজের হাতে একটি সুন্দর চার্ট এঁকেছিলেন। সেই চার্টে তাঁর সেই সময়কার মনের চিত্র অতি স্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছিল।

তাতেই দেখেছিলাম, চিত্ত-শুদ্ধি ও সংযমকে তিনি জীবনে কতখানি স্থান দিয়েছিলেন এবং জীবনের চরম লক্ষ্য স্বরূপ তাতে অঙ্কিত ছিল, দেশ ও মানবতার শেষ ধাপের ওপর আত্ম-মুক্তি।

সৈন্য যেমন যুদ্ধে যাবার আগে, নিজেকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করে, প্রতিদিনের নিয়মানুবর্ত্তী অনুশীলনে—সুভাষচন্দ্র তেমনি জীবনের সূচনা থেকে প্রতিদিনের প্রতিকার্য্যের মধ্যে দিয়ে, এক সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ ক'রে, নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন।

এই সংযম, এই নিয়মানুবর্ত্তিতা···এই নীরব ধৈর্য্য···সেদিন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে শুধু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ধনস্বরূপ ছিল। বিশ্বের পট-ভূমিকায় একদিন যখন তিনি সহসা শান্ত অসহযোগ-আন্দোলনের নেতা থেকে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে জগতের শ্রেষ্ঠ রণ-পণ্ডিত সেনা-নায়কদের মধ্যে একজন সেনাপতিরূপে দেখা দিলেন, তখন বিস্মিত হয়ে আমরা তাঁর দিকে ফিরে চেয়েছি— কিন্তু সে-বিস্ময়ের বীজ তাঁর এই উন্মুখ-যৌবনের শান্ত জীবনের মধ্যেই সমাহিত হয়েছিল।

বীজ থেকে মহীরুহ—তার মধ্যে আকস্মিকতা কোথাও নেই।

বাংলার লোনা-মাটীতে যে-বীজ সেদিন রস পায়নি···বিশ্বের রক্ত-রাঙা গৈরিক মাটীতে প্রাণ-স্পর্শের অপেক্ষায় তাকে থাকতে হয়।

২১

বছর খানেক কলেজ থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে থাকার পর একদিন আর্কুহার্ট সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে গেল। আর্কুহার্ট সাহেব তখন স্কটীশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক শুধু নন্, সত্যসত্যই দার্শনিক ও সাহিত্য-রসিক।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ে তিনি মুগ্ধ হলেন। কলেজ তৈরী হয়েছে যে-সব ছেলের জন্য, তারাই কলেজ থেকে থাকবে দূরে?

তখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আবার ভাইস্ চ্যান্‌সেলার হয়ে এসেছেন আশুতোষ। তাঁর নির্দ্দেশে সুভাষচন্দ্রের পুনর্বিচার হলো।

শাস্তি যতটুকু প্রয়োজন ছিল, তা হয়ে গিয়েছে। শিক্ষায়তন পুলিশ-বিভাগ নয়।

সুভাষচন্দ্র স্কটীশ চার্চ্চে ভর্ত্তি হবার অনুমতি পেলেন।

এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলেজের ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা দেবার জন্যে "ট্রেনিং কোর" খোলা হলো।

কলেজের পড়ুয়া ভাল ছেলে সুভাষচন্দ্রও নাম লেখালেন।

বেলঘরিয়ার মাঠে তাঁবু পড়লো।

বাঙ্গালী ছেলেদের গায়ে খাকি-পোষাক। হাতে বন্দুক।

নিঃস্তব্ধ রাত্রি। সারিসারি তাঁবু। বৈশাখের অন্ধকার রাত্রিতে উঠেছে ঝড়।

অন্ধকারে পাহারা দিচ্ছে প্রাইভেট সুভাষচন্দ্র।

দূরে, বহু দূরে, য়ুরোপের মাঠ থেকে আসছে কামানের আওয়াজ। য়ুরোপের সব জাতি মেতে উঠেছে নতুন এক সামরিক জাতীয়তাবাদে। ভার্দ্দুনের আকাশে উড়ছে বিমান-পোত। তার সারথি একজন বাঙ্গালী যুবক।

বাংলার অরণ্যে গোপনে ঘুরছে রিভলভার হাতে বাঙ্গালী ছেলে। পাঞ্জাবের পথে-প্রান্তরে মিতালী হচ্ছে, তরুণ পাঞ্জাবের সঙ্গে তরুণ বাংলার। রক্ত-টীকার হচ্ছে রাখী-বিনিময়। বাটা-ভিয়া, সুমাত্রা, জাভা থেকে চিনির বস্তার ভেতর আসছে রিভলভার।

অন্ধকারে বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে প্রাইভেট সুভাষচন্দ্র।

২২

আই-এ পরীক্ষায় মাত্র প্রথম বিভাগ…

বি-এ তে অনায়াসে দ্বিতীয় স্থান…

সম্ভ্রান্ত ধনীঘরের প্রতিভাবান্ ছাত্রের এ-র পরের ধাপ—নির্দ্দিষ্ট থাকেই…

বিলেত…আই-সি-এস…কিম্বা ব্যার-এট্-ল…

অন্তরের স্রোত যেদিকেই বয়ে যাক্ না কেন, তখনও পর্য্যন্ত বাইরের স্রোতকে স্বীকার করে চলতে হচ্ছে…

বাইরের দিক থেকে, পরিচিত খাদে তাই বয়ে চলে সনাতন জীবন-ধারা....

সুভাষচন্দ্র আত্মীয়-স্বজনের শুভাশীষের মধ্যে বিলাতযাত্রা করলেন···আই-সি-এস পরীক্ষার জন্যে···সে-বছর আর মাত্র আট-মাস সময় বাকি···এই অল্প সময়ের মধ্যে সেই দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব? পরের বছর আই-সি-এস্ পরীক্ষার জন্য আর তাঁর বয়স থাকবে না। সেই দুরূহ পরীক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি।

তার মাত্র চার মাস আগে,

ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে তখন শুভ্র-শ্মশ্রু এক মহাকবি, জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতের বিদীর্ণ বক্ষ-পঞ্জরের রক্ত দিয়ে লিখছেন, সাম্রাজ্যবাদ-নিধন-যজ্ঞের মহামন্ত্র....

বহুদিনের তমসাচ্ছন্ন নিদ্রা পরিহার করে, গঙ্গাযমুনানর্ম্মদা-কাবেরীর তীরে তীরে, জেগে উঠছে সম্মোহিত ভারত···

এই আবহাওয়ায় সুভাষচন্দ্র যাত্রা করলেন বিলেত···ইংরাজ-শাসন-তন্ত্রের মারাত্মক যন্ত্রের অঙ্গ-সামিল হবার জন্যে···

২৩

বন্ধুরা অবাক হয়ে গেল।

সুভাষের মনের খবর যাঁরা জানতেন, তাঁরা কখনই ভাবেন নি, সুভাষচন্দ্র ঢুকবেন আই-সি-এস-এ।

বন্ধু দিলীপকুমার বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার?

সুভাষচন্দ্র বলেন, লোভ আমার দর্শন-শাস্ত্রে ট্রাইপোসের ওপর।

—কিন্তু আই-সি-এস?

—তা না হলে বাড়ী থেকে কি ইংলণ্ডে আসতে দিতো?

—কিন্তু পাস তো করবে···তখন?

—চাকরী তো কেউ জোর করে আমাকে নেওয়াতে পারবে না। ট্রেনিংটা নিতে আপত্তি কি?

মনের কথা আর কেউ জানলো না।

ট্রাইপোস্ নিয়ে মাত্রা আর আটমাস বাকি। আটমাসের মধ্যেই আই-সি-এস্ পরীক্ষায় বসলেন।

পরীক্ষায় কৃতী-ছাত্রদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন··· প্রবন্ধ-রচনায় সকলের চেয়ে বেশী নম্বর পেলেন।

২৪

লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্ররা সেই স্বল্পবাক গম্ভীর-মূর্ত্তি তরুণকে স্বভাবতই তাঁদের নেতা বলে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু অসুবিধা হতো, নেতার গাম্ভীর্য্য এবং পিউরিট্যানিস্‌মে।

আড্ডা, তামাসা, ইয়ার্কি এবং বিলাতী তরুণদের অনুকরণে চোস্ত ইংরেজীভাষায় ইংরেজী-অশ্লীলতা করা···সুভাষচন্দ্র আদৌ সহ্য করতে পারতেন না।

বলতেন, আমাদের এমন ব্যবহার করতে হবে, যাতে তারা প্রত্যেক কথায় বুঝতে পারে, আমরা ওদের চেয়ে ঢের বড়··· ঢের বেশী সভ্য····

নিজেকে তাই একান্ত সতর্কতার সঙ্গে চালাতে হয়···যেন কোন অন্যায়, যেন কোন ভুল, যেন কোন ভব্যতার ব্যতিক্রম না হয়ে যায়।

ঘরের মধ্যে এতটুকু এলোমেলো অগোছালো ভাব নেই··· যেখানকার যা, যেভাবে থাকা উচিত, ঠিক তাই আছে। বিছানার ওপর অন্যমনস্কতার চিহ্নস্বরূপ কোন বই খোলা কখনো পড়ে থাকে না···বিছানা বা কোচের ওপর "ধাম্‌সানোর" কোন চিহ্ন নেই···টেবিলে বই-পত্র, খাতা পেনসিল যথাস্থানে গোছানো··· কোথাও একটা আলগা কাগজ পড়ে নেই···বই-এর শেল্‌ফে একটু ধূলো নেই···এলোমেলো ছড়িয়েও নেই। পোষাক খুব দামী নয় ···কিন্তু নিখুঁত···এতটুকু দাগ নেই···ময়লার চিহ্ন নেই···যেন এই মাত্র ধোবার বাড়ী থেকে ইস্ত্রী করে আনা হয়েছে···একটী ভাঁজও নষ্ট হয়নি।

সব সুনিয়ন্ত্রিত···সুনির্দ্দিষ্ট···নিজের একান্ত চেষ্টায় ছন্দোবদ্ধ।

জীবনে একটা উদ্দেশ্য আছে···একটা পরিণতি আছে···একটা লক্ষ্য আছে।

সময় বড় কম···মাত্র একটা জীবনের আয়ু···তাই তার একটা মুহূর্ত্তও অন্যমনস্কভাবে খরচ করা চলে না। কে বলেছে, যৌবনেরই একমাত্র অধিকার বেহিসেবী খরচ করবার? দূর হয়ে যাক্‌,

সেই রোমান্টিক বিলাসিতা…অলস ভাব-প্রবণতা। ইয়ার্কি করে একটা বাজে কথা বলবার মত বিলাসিতা, আজকের যৌবনের শোভা পায় না।

বন্ধুরা আড্ডা দেয়, তরুণ কবিদের নিয়ে কাব্য-পাঠ হয়, থিয়েটারের আধুনিকতম নাটকের আলোচনা হয়…হাসি ঠাট্টা… বিদ্রূপ…রঙ্গরস…গান।

সুভাষচন্দ্র তখন ব্যস্ত ছাত্রদের নিয়ে ডিবেটিং ক্লাব গড়তে, …রাজনীতির গূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করতে…লাইব্রেরী ঘেঁটে জানা-অজানা লোকদের জীবনী খুঁজে বার করে পড়তে…লণ্ডনে বসে লণ্ডনের ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল আবহাওয়ার ষোলো আনা সুবিধে আদায় করে নিতে…

পাশের ঘরে তখন চলেছে হাসির হল্লা।

মিঃ সিং আসর জমিয়ে বসেছেন। নতুন নতুন বিলিতী "কেচ্ছার" এক-একটা বুলেট ছাড়ছেন…শ্রোতারা না শুনলেও, তিনি ছাড়বেন না। সেইটীই তাঁর প্রতিভার বিশেষত্ব…বিলিতী অশ্লীলতার "অথারিটী" তিনি।

এমন সময় সুভাষচন্দ্র সেই ঘরে এসে ঢুকলেন।

এক মুহূর্ত্তে সব চুপ্‌।

মিঃ সিং-র মুখর প্রতিভা সেই প্রস্তর গাম্ভীর্য্যের সামনে ম্লান মূক হয়ে যায়।

২৫

বন্ধু নীরদরঞ্জন ছোট-খাট জলসার আয়োজন করেছেন।

তরুণী ইংরেজ-বান্ধবী অনেকে এসেছেন।

দিলীপকুমার বাংলা গান গাইবেন—সুভাষচন্দ্রও নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

দিলীপকুমার গাইতে সুরু করলেন।

বাঙ্‌লা গান…ভারতীয় সুর…ইংরাজ-তরুণীদের কানে বিসদৃশ লাগে। সেটা জানাবার জন্যে তাঁরা রহস্য করে ভ্যাংচানো সুরে নানারকম আওয়াজ করেন।

ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র বন্ধুকে ডেকে বলেন, কেন তুমি

এখানে গাইলে? এ-জাতের সঙ্গে কোনভাবেই কো-অপারেট করা উচিত নয়···এদের সঙ্গে আমাদের কখনও মিলতে পারে না।

সে-ধারণা তখনই তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে।

২৬

আই-সি-এস্ পরীক্ষার ফলাফল বেরুলো। সুভাষচন্দ্র বন্ধুকে লিখলেন,

"হেমন্ত, শুনিয়া দুঃখিত হইবে যে আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করিয়াছি······"

কিন্তু বন্ধুর দুঃখের কারণ বিশেষ কিছুই ছিল না। কারণ, সেই সঙ্গেই খবর পাওয়া গেল, স্বর্গে প্রবেশাধিকার পেয়েও তিনি সে-স্বর্গে প্রবেশ করবেন না······

সেই মহামূল্য তিনটি অক্ষর তিনি অর্জ্জন করেছেন, অর্জ্জন-মুহূর্ত্তেই তাকে বিসর্জ্জন করবেন বলে। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো, তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী আর এক তরুণের মূর্ত্তি···তিনিও ঠিক এমনি আই-সি-এস-এর সিংহদ্বার থেকে ফিরে গেলেন দেশের মাটির বুকে···শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দের কথা স্মরণ ক'রে তিনি আই-সি-এস্-হীন হয়েই ফিরলেন ভারতের দিকে······

যে-নরকে তাঁর দেশবাসী অনশনে পচে মরছে, সেই নরকেই তিনি সহাস্য-বদনে এসে ঢুকলেন।

একদিন জীবনের আরম্ভমুখে তিনি বেরিয়েছিলেন গুরুর সন্ধানে···মঠে, মন্দিরে, তীর্থে, সন্ন্যাসীদের আখড়ায়, আশ্রমে।

সেখানে সেদিন মেলেনি গুরুর সন্ধান।

তবে সে-অনুসন্ধান থেমে যায় নি সেদিন সেখানে।

একলব্য-অন্তর গুরু-দ্রোণের জন্যেই নীরবে ছিল অপেক্ষা করে।

ভারতে পদার্পণ করেই তাই ছুটলেন, ভারতের নগ্ন ফকিরের দ্বারে···তিনি তখন ঘোষণা করেছেন, বৃটিশের বিরুদ্ধে, সামরিক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক নতুন সংগ্রাম···

প্রবাস থেকে প্রবাসী ফিরে বাড়ীতে না ঢুকে, প্রথম ঢুকলেন মহাত্মাজীর আশ্রমে। মহাত্মা তখন বম্বেতে।

মহাত্মাজী বল্লেন, তুমি বাংলায় গিয়ে দেখা কর দেশবন্ধুর সঙ্গে।

হাওড়া ষ্টেশনে নেমেই সুভাষচন্দ্র ছুটলেন দেশবন্ধুর বাড়ী।

প্রণাম করে দাঁড়ালেন সামনে। তরুণের রাজার সামনে এসে দাঁড়ালো, বাংলার নব-জাগ্রত তারুণ্যের প্রতীক···

শিষ্য দেখা পেল গুরুর।

২৭

নিরস্ত্র দেশের সংগ্রামের নতুন অস্ত্র···নিরুপদ্রব অসহযোগ। বাংলাদেশে সে-সংগ্রামের নেতৃত্ব পড়েছে দেশবন্ধুর ওপর।

নতুন রণ-নীতি···কর্ম্মক্ষেত্রে তার পরীক্ষা।

জনতা জানে না তার প্রয়োগ-সংহরণ বিদ্যা। প্রয়োজন-প্রচারের।

দেশবন্ধু নবীন শিষ্যকেই দিলেন সে গুরু-ভার। নব-মন্ত্রের প্রচার সচিব।

অসহযোগ নীতি বর্জ্জনের নীতি। বর্জ্জন মানেই নব-রূপে গ্রহণ।

বিদেশীর বিদ্যায়তন বর্জ্জন তখনই সম্ভব হবে যখন গড়ে উঠবে স্বদেশীয় সর্ব্ব-বিদ্যায়তন।

চলে তার আয়োজন।

ফরবেস্ ম্যানসন রাতারাতি পরিণত হয়ে ওঠে গৌড়ীয় সর্ব্ব-বিদ্যায়তনে।

চারিদিকে উৎসাহ। নতুনের আকর্ষণ।

দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রকে করলেন তার অধ্যক্ষ। তরুণ অধ্যক্ষ।

প্রবীণদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিল।

জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবন্ধুকে ডেকে বল্লেন, একেবারে ছেলেমানুষ···সবে আই-সি-এস পাশ করেছে···কোন অভিজ্ঞতাই নেই···তার ওপর এতবড় গুরুদায়িত্ব দেওয়া···

দেশবন্ধু হেসে বলেন, আমি মানুষ চিনি। আপনারা উতলা হবেন না।

২৮

দলে দলে ছাত্র আসে।

বহুদিন পরে বাংলাদেশে এসেছে ভাবের জোয়ার বাঙালীর আধ-শুকনো মন হঠাৎ একেবারে ভিজে উঠলো।

স্বপ্ন জাগে, নালন্দার···বিক্রমশিলার···

নানারকমের পরিকল্পনা তৈরী হয়…নতুন নতুন পরিভাষার সৃষ্টি হয়…

ফরবেস্ ম্যানসনের সিঁড়িতে পায়ের শব্দে সারা বাড়ীটা অনু-রণিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতে দেখা গেল, সিঁড়িতে ছাত্রের ভিড় কমে আসছে…

যে-সব অধ্যাপক এসেছিলেন, দারিদ্র্যকে বরণ করে, জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে, নিজের আর্থিক জীবনের ভিত্তি শিথিলতর হওয়াতে, তাঁরা ক্রমশ অদৃশ্য হতে লাগলেন।

অধ্যাপকের অভাবে ক্লাস বসে না।

যে কয়েকজন আসেন, নিয়মিত আসেন না।

ক্রমশ অধ্যাপকহীন ক্লাসে ছাত্রেরাও অদৃশ্য হতে থাকে।

কিন্তু এই কর্পূরীয়মান ছাত্র এবং অধ্যাপকদের মধ্যে একজন ঘড়ি ধরে নিয়মিত আসেন, ঘড়ি ধরে নিয়মিত ক্লাসে যান। অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র।

একদিন দেখেন, ক্লাসে শুধু তিনিই আছেন, শূন্য বেঞ্চিগুলি আছে…দেয়ালে হয়ত দু'একটা গিরগিটি আছে…

নিয়মিত একঘণ্টা কাল সেই শূন্য ক্লাসে বসে তিনি আপনার মনে লিখতে সুরু করে দিলেন।

ঘণ্টা হয়ে গেলে ক্লাস থেকে নেমে এলেন।

বুঝতে পারেন, আদর্শের পথ এমনি নিঃসঙ্গ নির্জ্জন।

২৯

তবু সেই পথেই চলতে হবে…

কংগ্রেসের নির্দ্দেশে সুরু হয় পিকেটিং।

সুভাষচন্দ্র গুটীকতক স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে রাস্তায় পিকেটিং করতে বেরুলেন।

ক্রমশ স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা বাড়তে লাগলো…

সুভাষচন্দ্র দলে থাকেন…কিন্তু নীরব…কথা যা বলবার অন্য লোকে বলে…

কিন্তু সকলের দৃষ্টি সেই নির্ব্বাক তরুণটার ওপরই গিয়ে পড়ে।

ভবানীপুরের রাস্তা দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের দল পায়ে হেঁটে ফরবেশ ম্যানসনের দিকে চলেছে।

সুভাষচন্দ্র দলের আগে।

এলোমেলো যাবার হুকুম নেই···সারি বেঁধে, প্রত্যেক সারিতে দুজন করে···

হলেই বা নিরস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক···মানতে হবে সামরিক শৃঙ্খলা···

এমন সময় ভারতবর্ষে এলেন যুবরাজ। কংগ্রেস ঘোষণা করলো, সাধারণ হরতাল। যুবরাজ দেখে যান শূন্য নগরের মধ্যে জাতির জাগ্রত প্রতিবাদ।

কিন্তু হরতাল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের ঘাড়ে এসে পড়লো ভীষণ দায়িত্ব। ট্রেণে যারা আসছে···তাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়া। গাড়ী নেই, কুলী নেই, খাদ্যের কোন দোকানই খোলা নেই।

সুভাষচন্দ্রের ওপর ভার পড়লো, যাতে যাত্রীরা কোনরকমে বিপন্ন না হয় তার আয়োজন করা।

রাত জেগে প্লান্ অফ্ এ্যাক্সন্ তৈরী হলো···সেনাপতি যুদ্ধের আগে যেমন প্লান তৈরী করেন···

পরের দিন ভোর বেলাতেই প্রত্যেক ষ্টেশনের সামনে দেখা গেল, মোটর গাড়ী···লরী···তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা, on national service···স্বেচ্ছাসেবকেরা ট্রেণ আসতেই যাত্রীদের মাল-পত্র কাঁধে তুলে নিল···কারুর কোন অসুবিধা হলো না···এমন কি শিশুদের জন্যে দুধ পর্য্যন্ত আগে থাকতে জোগাড় করা ছিল···

নিতান্ত যে চোখ বুঁজে না ছিল, সে ছাড়া প্রত্যেকেরই চোখে পড়লো, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীদের কাজে একটা নতুন প্রেরণা···কোলাহলহীন সুশৃঙ্খলা···

বিশেষ করে তা চোখে পড়লো বাংলা সরকারের।

৩০

বাংলা সরকার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে বে-আইনী সঙ্ঘ বলে ঘোষণা করলো।

সভা করা, রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা করে যাওয়া, রাজদ্রোহ।

দেশবন্ধু কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ঘোষণা করলেন, এ আইন কংগ্রেস মানবে না।

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে আরো দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে হবে। সুভাষচন্দ্র হলেন সেই নিরস্ত্রবাহিনীর জেনারেল অফিসর কমাণ্ডিং।

প্রতিদিন পাঁচজন করে স্বেচ্ছাসেবক রাস্তায় বেরুবে···দ্বারে দ্বারে খদ্দর ফিরি করবে।

প্রথম দু'একদিন পুলিশ তাদের বাধা দিল না।

সুভাষচন্দ্র নিজে যাবার জন্যে উৎসুক হয়ে পড়লেন। কিন্তু দেশবন্ধু বাধা দিলেন।

গম্ভীর মানুষটীর চোখ ছল ছল করে উঠলো।

কিন্তু তারপর থেকে সুর হলো ধরপাকড়।

যে-পাঁচজন যায়, তারা আর আসে না ফিরে।

সুভাষচন্দ্র যাবার জন্যে শিশুর মতন আক্ষেপ করেন।

দেশবন্ধু হেসে বলে উঠলেন, Our crying captain!

কিন্তু অন্তরের সে-আক্ষেপ অচিরেই বাংলাসরকার পূরণ করলেন।

যেদিন দেশবন্ধু বন্দী হলেন, সেদিন সুভাষচন্দ্র অন্যত্র কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শুনলেন, পুলিশ তাঁর অনুসন্ধানে এসেছিল।

সন্ধ্যার সময় ফরবেস ম্যানসনে ফিরে এসেই নিজে পুলিশকে ফোন করলেন, আপনারা কি আমাকে খুঁজছেন?···আমি প্রস্তুত··· আসতে পারেন···

কিছুক্ষণ পরেই পুলিশের কালো গাড়ী ফরবেস্ ম্যানসনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

নিজের দায়িত্ব পরবর্ত্তী অফিসরকে বুঝিয়ে দিয়ে সুভাষচন্দ্র কারাযানে চড়ে বসলেন।

দূর হলো অন্তরের আক্ষেপ, সুরু হলো···নতুন অভিযান।

৩১

আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতেই বিচারক রায় দিলেন,

বিনাশ্রমে ছ'মাস কারাদণ্ড!

আসামী ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, মাত্র ছ'মাস?

—হ্যাঁ!

—নিতান্ত লজ্জার কথা! Have I robbed a fowl?

শেষ হয়ে যায় বিচার।

সুভাষচন্দ্র ঢুকলেন কারাগারে···সেই প্রথম পরিচয়।

৩২

স্যার আবতুর রহিম বাংলা সরকারের তরফ থেকে জেল পরিদর্শনে এসেছেন। .

দেশবন্ধুর কামরায় এসে দেখেন, তাঁর কাছে অন্য তুজন কয়েদী রয়েছেন। একজন তাঁর পাচক, আর একজন তাঁর ভৃত্য। সেই হিসেবেই তাঁরা দেশবন্ধুর সঙ্গে থাকতে পেয়েছেন।

পাচকটী, ভূত-পূর্ব্ব আই-সি-এস্ অফিসর···সুভাষচন্দ্র ; ভৃত্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেমন্তকুমার···

স্যার রহিম রহস্য করে বল্লেন, দাশ, তুমি দেখছি অত্যন্ত costly prisoner... তোমার একজন attendant আই-সি-এস্···আর একজন অধ্যাপক!

দেশবন্ধু হেসে প্রত্যুত্তর করলেন, যেহেতু অত্যন্ত costly একজন prisoner-কে তোমরা এখানে নিয়ে এসেছ!

কিন্তু পাচক ও ভৃত্য, তুজনেই পরম সৌভাগ্যস্বরূপ সেই তুটী বিনা-মাইনের চাকরী নিজেরাই বেছে নিয়েছিলেন।

পাচক অবশ্য অবসর সময়ে, মনিবকে দর্শন-শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গতত্ত্ব সম্পর্কে পাঠ দিতেন।

সেই ছোট্ট "সেলে"···সেই বন্দী-দশায়···সেই একান্ত নৈকট্যের মধ্যে···সেদিন যে-সম্পর্ক গড়ে ওঠে, রাজনীতির বাইরে মানবতার ক্ষেত্রে তা চিরমধুর হয়ে প্রত্যেক বাঙালীর অন্তরে অক্ষয়রূপে বিরাজ করছে···

৩৩

বাইশ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিক। পুজো আসন্ন।

উত্তর বাংলায় এলো বন্যা। বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর জলে ডুবু ডুবু।

খড়ের মত ভেসে গেল ঘর, বাড়ী, গোয়াল।

নওগাঁয় তখন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফারুকী। সেই বিশাল তরল মৃত্যুর আক্রমণে অসহায় হয়ে পড়লেন।

মধ্য রাত্রিতে স্বয়ং এক কংগ্রেসকর্ম্মীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে অনুরোধ করলেন, দেশ বাঁচাও! বন্যা! সাহায্যের জন্যে কলকাতায় তার করো!

সে উঠলো। নেমে পড়লো জলে। নদীর শাঁকো দেখা যায় না। সান্তাহারের পথে সাঁতার-জল। সাঁতরিয়েই সে এলো প্রায় দু'মাইল পথ।

ষ্টেশনে আর্ত্তনাদ...কলরব...চারিদিকে বন্যার জলের কলকল ধ্বনি।

ষ্টেশনমাষ্টার বল্লেন, লাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তার হবে না।

দুর্দ্দান্ত যুবক সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়লো, রাজসাহী পৌঁছল তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। তার পরণে তখন একটা ভিজে গামছা।

সেখান থেকে যুবক তার করলো সুভাষচন্দ্রকে...আর প্রফুল্লচন্দ্রকে।

...সহস্র নরনারী আপনাদের ডাকছে! বাঁচান!

সুভাষচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে তখন গ্রামের বাড়ীতে যাবার আয়োজন হচ্ছে।

গ্রামের বাড়ীতে দুর্গা পূজা। জানকীবাবু ঠিক করেছেন, সপরিবারে যাবেন। আয়োজন সম্পূর্ণ, রাত্রি প্রভাতেই রওয়ানা হতে হবে।

এমন সময় সুভাষচন্দ্র এসে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন।

—কি ব্যাপার? প্রণাম?

—আমি সান্তাহারে যাচ্ছি!

—সে কি কথা! বাড়ীতে দুর্গাপূজা...সকলে মিলে যাব... এ সময় তোমার চলে গেলে চলবে কেন?

সুভাষচন্দ্র হেসে বল্লেন, তাতে কি! আপনারা বাড়ীতে মাটীর প্রতিমা পূজো করতে যাচ্ছেন...আমি যাচ্ছি সান্তাহারে সত্যিকারের বিশ্বজননীর পূজো করতে!

জানকীবাবু জানতেন, বাধা দেওয়া বৃথা।

টেলিগ্রামের উত্তর না দিয়েই সুভাষচন্দ্র সান্তাহারে যাত্রা করলেন।

সেখানে সেই ভয়াবহ মৃত্যুর অরাজকতার মধ্যে সুভাষচন্দ্র রিলিফের কাজ সুরু করলেন। দেখতে দেখতে প্রায় দু'হাজার লোক স্বেচ্ছায় সেখানে সমবেত হলো...দু'হাজার তাজা প্রাণ!

রিলিফের কাজ এই দুঃস্থ দেশে অনেকেই করেছেন...দুঃস্থের

সেবায় অনেকেই অকাতরে দান করেছেন—কিন্তু উত্তরবঙ্গ-বন্যার এই রিলিফ কাজের মধ্যে সকলেই অবাক হয়ে দেখলেন, সেই কাজের মধ্যে অদ্ভুত শৃঙ্খলা…একটা সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতা।

সেই বন্যার মধ্যে, সেই হাহাকার আর নির্ম্মম অসহায়তার মধ্যে, সুভাষচন্দ্র দেখলেন, দেশের তরুণদের…দেশের তরুণরা দেখলো, তাদের ভবিষ্যৎ নেতাকে।

সেই নিদারুণ দুর্যোগের মধ্যে, সুভাষচন্দ্র খুঁজে পেলেন, দেশের অন্তরে পৌঁছবার পথ।

এই পাথর-ভেঙ্গে-বেরিয়ে-পড়া প্রাণের ঝর্ণাধারা বালিতে শুষে যাবার আগে, তাকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা যায় না? এই সদ্যজাগ্রত তরুণ-শক্তিকে নতুন সামরিক সংহতিতে বাঁধা যায় না? কংগ্রেসের প্রচলিত মতবাদের আড়ালে মনে জেগে ওঠে, একটা স্বতন্ত্র মত…একটা নতুন আশা…

৩৪

এলো গয়া কংগ্রেস…সভাপতি হলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। সুভাষ হলেন তাঁর সেক্রেটারী।

কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন দেশবন্ধু। অতি পরিচিত ঘটনা…প্রত্যেক লোকেরই স্মরণে আজও তা আছে।

কিন্তু তার মধ্যে থেকে একটা কথা সুভাষচন্দ্রের মনে গাঁথা রয়ে গেল। এশিয়ার সর্ব্ব-জাতি-সম্মেলন। ভারতবর্ষকে আজ বাইরে বেরুতে হবে…এশিয়ার অন্যজাতির সঙ্গে তাকে মিতালি করতে হবে…এশিয়ার সব স্বাধীন জাতি মিলে গড়ে তুলতে হবে, প্রাচ্য জগতের জাতি-সঙ্ঘ।

দেশবন্ধুর সে-আদর্শবাদ কংগ্রেসের সাময়িক প্রোগ্রামের হট্ট-গোলে চাপা পড়ে গেল। কিন্তু বেঁচে রইলো সুভাষচন্দ্রের মনে।

পরাজিত হয়ে দেশবন্ধু ফিরে এলেন।

কিন্তু সেই পরাজয়ই তাঁকে দিল আর এক দিক থেকে মুক্তি। নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে চলবার স্বাধীনতা। বাংলার এই স্বাতন্ত্র্যে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো, ভারতের অন্য সব প্রদেশ।

বাংলার মধ্যেই বিরূপ হয়ে দাঁড়ালো, পুরোণো কংগ্রেসী দল। পরিবর্ত্তন তাঁরা চান না।

তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন দেশবন্ধু। তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ালো, বাংলার বিপ্লবী নেতারা।

এলো স্বরাজ্য দল। কাউন্সিল নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতা।

খড়ের সিপাহীর মত পড়ে গেল সুপ্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন সব নেতারা। যেন ইন্দ্রজাল।

তাঁদের জায়গায় এলো নতুন সব লোক। নতুন নাম। কাঁচা বয়স। মুমূর্ষু বাংলা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো ভারতের মানচিত্রে।

অহিংস-নীতি আর চরখা নিয়ে তাড়া করে এলো কংগ্রেস। বিদেশী সরকার তাড়া করে এলো, বিপ্লবের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ নিয়ে।

সেই ঝড়ের দোলায় দেশবন্ধু তাঁর রথীদের নিয়ে প্রবেশ করলেন, কাউন্সিলে, প্রবেশ করলেন, করপোরেশনে।

সারা দেশে সংগ্রামের, সংঘর্ষের, একটা বিদ্যুৎ-ঝলক ক্ষণে ক্ষণে দীপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো।

"পুরণো বিপ্লবী দলের...সকলেই স্বরাজ্য দলের ভিতর এসে পড়ছিলেন। তাঁদের ভিতরকার পুরানো দলাদলির ভাব লোপ না পেলেও, তাঁদের সকলের টান ছিল সুভাষচন্দ্রের ওপর... তাঁরা মনে করতেন যে সুভাষকে নিজের দলে টানতে পারলেই, বাংলা দেশে তথা বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে। সুভাষচন্দ্রের চেষ্টা ছিল, কোন বিশেষ দলে যোগ না দিয়ে সব দলগুলিকে স্বরাজ্যদলের অন্তর্ভুক্ত করে দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে লাগানো।"*

যুগ-সঞ্চিত বিচ্ছেদ আর বিভেদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র হয়ে উঠলেন মিলনের যোগসেতু।

৩৫

এলো ফরওয়ার্ড কাগজ। ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে শেষ উল্লেখযোগ্য স্মরণ-চিহ্ন।

সুভাষচন্দ্রের ওপর ভার পড়লো, তাকে গড়ে তোলবার।

মেসিন-বসানো থেকে আরম্ভ করে কম্পোজিটরের ঘর সাজানো সমস্ত নিজে দাঁড়িয়ে করেন...সুভাষচন্দ্র বাড়ী ফেরেন না...সারাদিন

* উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

···সারারাত সেই নতুন অফিসেই। ক্ষিদে পেলে আসে মুড়ি। রাত্রিতে বেঞ্চি বা মেসিনের ওপরই শয্যা।

বেরুলো ফরওয়ার্ডের প্রথম সংখ্যা।

বাংলার থেমে-যাওয়া সংবাদ-পত্রের গতি, এক নিমেষে হয়ে উঠলো বেগবান্···

রাতারাতি যেন জ্বলে উঠলো হাজার বাতি···

ভেতরের সঞ্চিত কর্ম-শক্তি পেলো একটা বহির্গমনের পথ। সাংবাদিক-রূপে সুভাষচন্দ্র আনলেন যুগান্তর। মরাকাগজ হয়ে উঠলো জ্যান্ত আগুন।

যা কিছু তাজা, যা কিছু নবীন, যা কিছু সংগ্রামশীল···ফরওয়ার্ড হয়ে উঠলো তার মুখপাত্র।

যেখানে থেমে গিয়েছিল, সন্ধ্যা, যুগান্তর, বন্দেমাতরম্ সেখান থেকে আবার নতুন করে সুরু হলো যাত্রা বৈপ্লবিক-চিন্তাধারার।

ঘরের ছোট্ট পাঁচিল ভেঙ্গে দিয়ে সুভাষচন্দ্র ঘরের সঙ্গে যোগ করে দিলেন বাইরের বৃহৎ বিশ্বের। জগতে যেখানে যে ভাবছে নতুন, যে করছে সংগ্রাম, যে চলছে এগিয়ে, আঘাত সয়ে এবং আঘাত করে, সকলের সংবাদ নিয়ে এলেন জড় করে ফরওয়ার্ডে। নবীন আয়ার-ল্যাণ্ড, তরুণ মিশর, সত্ত-জাগা তুরস্ক···তাদের সংগ্রাম-জীবনের প্রত্যেকটী সংবাদ প্রত্যেক সংখ্যায় তরুণ বাঙালীর কাছে এসে পৌঁছতে লাগলো।

স্বদেশকে ভালবাসবার অপরাধে এতদিন যে-সব বাঙালী পড়েছিল দূর বিদেশে, আজকের তরুণ যাঁদের ক্রমশঃ যাচ্ছিল ভুলে, সুভাষচন্দ্র তাঁদের সকলকে এনে জড় করলেন এই কাগজের চণ্ডী-মণ্ডপে। জগতে যেখানে যে কেউ ভাবছে নতুন জগতের কথা, যে কেউ দেখছে নতুন স্বপ্ন, গতানুগতিক পথ ছেড়ে যে কেউ চলছে কণ্টক-পথে, তাদের সকলকে তিনি দিলেন ডাক। জার্ম্মাণী থেকে বীরেন বাঁড়ুজ্জে, নাম্বিয়ার আর তারক দাস···জাপান থেকে রাসবিহারী বসু....চীন থেকে এগনিস্ স্মেড্লী···আমেরিকা থেকে শৈলেন ঘোষ···সকলের সঙ্গে যোগসূত্র করলেন স্থাপন। ভারতবর্ষ থেকে পাঠালেন পুলিন শীলকে, সাক্ষাৎভাবে বিপ্লবী আয়ারল্যাণ্ডের সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠানোর জন্যে।

বিদেশী সংবাদ-সংগ্রাহকদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের পক্ষপাতিত্বের হাত থেকে ভারতীয় সংবাদপত্রদের উদ্ধার করবার জন্যে দেশীয় সংবাদ-সংগ্রহ-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার আয়োজন করলেন। জন্ম হলো ফ্রী প্রেস্ অফ্ ইণ্ডিয়ার, ওরিয়েণ্ট্যাল প্রেস সার্ভিসের।

অথচ, এমন নীরবে, নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে, এই বিরাট সংঘটন গড়ে তুললেন যে, অনেকে আজও পর্য্যন্ত জানে না, এই সব যুগান্তকারী পরিবর্ত্তনের নায়ক কে।

ফরোয়ার্ড হয়ে উঠলো, ভারতের অগ্রগামী বিপ্লবী চিত্তের বাণী-বাহক।

৩৬

হঠাৎ একদিন সেই সময় চৌরঙ্গীর ওপর একুশবছরের একটী বাঙালী ছেলে পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে খুন করতে গিয়ে ভুলক্রমে খুন করে ফেল্লো আর্নেষ্ট ডে নামে একজন সাহেবকে।

ছেলেটীর নাম গোপীনাথ সাহা।

বিচারে গোপীনাথের ফাঁসি হলো।

বিচারপতি পিয়ার্সনের দণ্ডাদেশ শেষ হতে না হতে আসামীর কাটগড়া থেকে গোপীনাথ বলে উঠলো, আমি চললুম···কিন্তু আমার রক্তের প্রতি বিন্দু থেকে যেন ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠে।

যাবার সময় নিজের মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে গেল, মা গো, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, যেন তোমার ছেলের মতন ছেলে বাঙলার ঘরে ঘরে জন্মায়।

গোপীনাথকে নিয়ে সারা দেশে পড়ে গেল সাড়া। কারুর কাছে তার ভুলটাই বড় হলো, কারুর কাছে বড় হলো তার স্বদেশপ্রেম।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, ফাঁসীর পর তার মৃতদেহ জেলের ভেতরেই সৎকার করা হবে। মুখাগ্নি দেবার জন্যে মাত্র তার ভাই মদনমোহনকে জেলের ভেতরে যাবার অনুমতি দেওয়া হলো।

সুভাষচন্দ্রও জেলের দ্বারে উপস্থিত হলেন। অনুমতি চাইলেন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত থাকবার জন্যে।

সে-অনুমতি পাওয়া গেল না।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে যখন মদনমোহন গোপীনাথের পরিত্যক্ত

বস্ত্র হাতে নিয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে এলো, সুভাষচন্দ্র প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে···শুধু ডান হাতটী এগিয়ে গেল···অতি সন্তর্পণে স্পর্শ করলেন সেই পরিত্যক্ত বস্ত্র···স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থির শান্ত দুটি চোখ বিদ্যুন্ময় হয়ে উঠলো।

৩৭

অপ্রাসঙ্গিক হলেও, উল্লেখ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক সম্মেলন বসেছে। মাত্র বাইশ বছর আগে।

সম্মেলনের সভাপতি, মৌলানা আক্রাম খাঁন···সেই সম্মেলনের সঙ্গে বিপ্লবী যুব-সঙ্ঘেরও একটা সম্মিলনী বসে।

তার সভাপতি, সহিদ সুরাহবর্দ্দী সাহেব।

এই দুই সভাতেই গোপীনাথের প্রশংসা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়,

—অহিংসায় পূর্ণ আস্থা রাখিয়া, এই সম্মিলন···স্বর্গীয় গোপীনাথ সাহার দেশপ্রেমিকতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে।

মাত্র বাইশ বছর আগে। সভাপতি, আকরাম খাঁ আর সুরাহওয়ার্দ্দি।

৩৮

স্বরাজ্যদলের নীতি-অনুযায়ী দেশবন্ধু নবগঠিত কলিকাতা করপোরেশনের প্রথম নির্ব্বাচনে স্বদলবলে দাঁড়ালেন।

নির্ব্বাচনে তিনি এবং তাঁর দলের প্রত্যেকটী মনোনীত লোকই নির্ব্বাচিত হলেন।

নবগঠিত করপোরেশনে তিনিই হলেন প্রথম মেয়র।

সুভাষচন্দ্রকে করলেন, চীফ এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসর।

করপোরেশনের পুরোণো অফিসররা, দেশী এবং বিলিতী উভয় জাতিরই বয়োজ্যেষ্ঠ অফিসররা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন, ২৬৷২৭ বছরের একজন ছোকরা, এত বড় এই করপোরেশন, এর দায়িত্ব বহন করতে কি পারবে?

কিন্তু এই ২৬৷২৭ বছরের ছোকরাটী করপোরেশনের সর্ব্বময়-কর্ত্তার আসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে সারা করপোরেশনের মধ্যে ত্রাহি মধুসূদন রব পড়ে গেল।

চেয়ার আছে লোক নেই, লোকের বদলে শুধু চাদর বাঁধা···সুভাষচন্দ্র এসেই কলেজের প্রফেসরের রোল্‌কলের মত প্রতিদিনের উপস্থিতির খাতা তদারক করেন। আসেন সকলের আগে। নিজে ঘুরে দেখে আসেন সমস্ত বিভাগ। প্রত্যেকটী ফাইল নিজে পড়েন। প্রত্যেকটী অর্ডার নিজে হাতে লিখে দেন। শুধু অফিসের মধ্যেই নয়···অফিসের বাইরেও···যেখানে করপোরেশনের আসল দায়িত্ব···কাজ। সেখানেও ঘুরে ঘুরে তদারক করেন। দরকার হলে ম্যান্‌-হোলের মধ্যেও ঢুকে পড়েন।

দেখতে দেখতে সেই মান্ধাতার আমলের জমিদারী সেরেস্তা সুইজ্যারল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ঘড়ির কাঁটার মত চলতে লাগলো।

৩৯

চীফ একজিকিউটিভের আসন আগে ছিল না···সে জায়গায় ছিল চেয়ারম্যান। করপোরেশনের বিভাগীয় উচ্চপদস্থ অফিসররা, বিশেষত য়ুরোপীয় অফিসররা, নিজেদের চেয়ারম্যানেরই সমকক্ষ ভাবতেন।

অন্তত চীফ্‌ এন্‌জিনীয়ার মিঃ কোট্‌স্‌ সেইভাবেই চলতে অভ্যস্ত ছিলেন। একে সিনিয়ার অফিসর, তার ওপর শ্বেতাঙ্গ। তরুণ চীফের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর ঘরে এসেছেন....

হাতে চুরুট···পূর্ব্বাপর চেয়ারম্যানদের সামনে তিনি এই ভাবেই দেখা করে এসেছেন···

সেদিন সুভাষচন্দ্র কিছু বল্লেন না।

তারপরের দিন, কি একটা দরকারে আবার তাঁর ঘরে এসেছেন, জ্বলন্ত সিগার হাতে···

ধীর গম্ভীরভাবে সুভাষচন্দ্র বলে উঠলেন, মিঃ কোট্‌স্‌, সুপি-রিয়র অফিসারের সামনে সিগার খাওয়াটা কি ভব্যতা?

মিঃ কোট্‌স্‌ তারপর থেকে আর সিগার হাতে তাঁর ঘরে ঢোকেন নি। অবশ্য তিনি সিগার খান জেনে, সুভাষচন্দ্রই সময় সময় তাঁকে 'অফার' করতেন।

আর একদিন।

ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন।

সুভাষচন্দ্র বিরক্ত হলেন।

মিঃ কোটস্, সুপিরিয়র অফিসরের সামনে এ-ভাবে পা ঝুলিয়ে বসা সঙ্গত কি ?

মিঃ কোট্স্ তারপর থেকে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েই কথা বলতেন। সুভাষচন্দ্র বসতে বল্লে বসতেন। অবশ্য ঘরে ঢুকলেই, সুভাষচন্দ্র যথারীতি আসন গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানাতেন।

মিঃ কোট্সের সঙ্গে সঙ্গে করপোরেশনের প্রত্যেকটী লোকই বুঝলো, এই লাল-বাড়ীতে একজন লোক এসেছে বটে।

৪০

সুভাষচন্দ্রের এই বিপুল-সংগঠন শক্তির পেছনে ছিল বাংলার বিপ্লবী দল···করপোরেশনের ভেতরে এবং বাইরে।

যে বিপুল শক্তি অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, কারাগারে বিদেশীর হাতে লাঞ্ছনায়, স্বদেশীয়দের উদাসীনতায় তখনও পর্য্যন্ত নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল···বাংলার সেই দুরন্ত মনের প্রতিনিধিদের নিয়েই সুভাষচন্দ্র ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন···

সরকার এবং সরকারের চরেরাও সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করে চলেছিলেন।

কংগ্রেস এবং বাংলা দেশের কংগ্রেসের পুরাতন-পন্থী নায়কেরাও পর্য্যন্ত ক্রমশঃ প্রকাশ্যে বিরোধিতা ঘোষণা করলো।

সেই সময় দলের আভ্যন্তরিক গঠনকার্য্য সম্পূর্ণ করে, সুভাষ-চন্দ্র বাগবাজারে পশুপতি বোসের বিখ্যাত বাড়ীতে স্বরাজ্যদলের প্রধানকর্ম্মীদের এক বিরাট সভা আহ্বান করলেন।

সেই সভায় উপস্থিত করা হলো, পরিষ্কার স্বচ্ছ ভাষায়, স্বরাজ্য দলের আদর্শ ও লক্ষ্য, পূর্ণ স্বাধীনতা···ইংরাজ-সম্পর্ক-রহিত পূর্ণ স্বাধীনতা।

"কুইট্ ইণ্ডিয়া" প্রস্তাবের বাইশ বছর আগে।

কিন্তু এই সভার কয়েকদিন পরেই সুরু হলো ধর-পাকড়। পুরোনো জেল-ফেরৎ বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রও কারারুদ্ধ হলেন।

দেশবন্ধু ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, নিজের দেশকে ভালবাসলে,

যদি তা ক্রাইম্ হয়, আমিও ক্রিমিন্যাল। সুভাষ যদি ক্রিমিন্যাল হয়···আমিও ক্রিমিন্যাল।

৪১

নতুন অর্ডিন্যান্স তৈরী করে সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর সহকর্ম্মিদের গ্রেফতার করা হলো।

বিচার হবে না···অনির্দ্দিষ্ট কাল বন্দীকে কারাগারে আটক হয়ে থাকতে হবে!

দেশবন্ধু সেন্ট্রাল জেলে অবরুদ্ধ শিষ্যের সঙ্গে দেখা করলেন।

বিদায়ের সময় শিষ্য বলে ওঠে, বোধ হয় শীঘ্র আর দেখা হবে না।

গুরু প্রতিশ্রুতি দেন, না···না···তা হতে পারে না···আমি আমার কাছে তোমাকে শিগ্‌গির ফিরিয়ে আনছি!

সেই শেষ দেখা!

দেশবন্ধু পরের বছর কাউন্সিলে স্বর্গমর্ত্ত্য এক করে সেই বে-আইনী আইনকে তুলে দেবার জন্যে বদ্ধ-পরিকর হলেন।

ভোটের দিন তিনি শয্যাশায়ী। উত্থানশক্তি রহিত। বিন্দুমাত্র উত্তেজনায় ডাক্তারেরা আতঙ্কিত হয়ে উঠছেন।

পুরুষ সিংহ উঠে বসলেন, শিষ্য তাঁর···শাবক তাঁর···লৌহ-পিঞ্জরে বদ্ধ···

আমি যাব কাউন্সিল হাউসে···যদি আমার একটা ভোটে আমরা হেরে যাই!

কোন নিষেধ···কোন বাধা শুনলেন না।

ষ্ট্রেচারে শুইয়ে তাঁকে আনা হলো—কাউন্সিল-হাউসে। ভোটে তিনি জয়লাভ করলেন।

কিন্তু ভোটই তো শেষ-কথা নয়।

গভর্ণর নিজের ক্ষমতায় সে-আইন বলবৎ রাখলেন।

৪২

মাসখানেক সুভাষচন্দ্র কলকাতায় সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন।

তিনি তখনও করপোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসর।

তাই জেলে বসেই করপোরেশনের কাজ চালাতে লাগলেন।

জেলের গরাদের ভেতরে চেয়ারে বসে খদ্দরধারী ভারতীয় যুবক।

আর তাঁর সামনে খাতাপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে চীফ এনজিনীয়ার কোট্‌স্ সাহেব।

জেলের ডিটেক্‌টিভরা মহানন্দে সে-দৃশ্য উপভোগ করে।

"ঠিক হয়েছে। মামাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, আমরা দাঁড়িয়ে থাকি···আর মামারা আমাদের ওপর তম্বি করেন। সুভাষ মামাদের ঠিক সায়েস্তা করেছে। এখন দাঁড়িয়ে থাকো বাবা, সুভাষের সামনে টুপি খুলে, আর বলো, Yes Sir!"*

কিন্তু ডিটেক্‌টিভ মহাপ্রভুদেরও সে-আনন্দ বেশীক্ষণ থাকে না।

সুভাষের প্রত্যেক কথাটা রিপোর্ট করবার জন্যে তারা সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো।

যদি করপোরেশনের ফাইলের মধ্যে কোন বৈপ্লবিক প্ল্যান চলে যায়!

একদিন এক ডিটেক্‌টিভ অফিসর মহা-অসুবিধায় পড়লো।

কথাবার্ত্তা যা হচ্ছিল, ভাল বুঝতে পারছিল না।

তাই মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে উঠছিল, ওটা কি বললেন, স্যার!

সুভাষচন্দ্র কোন উত্তর না দিয়ে বিষ-দৃষ্টিতে একবার শুধু চেয়ে দেখেন। আবার কাজ আরম্ভ করেন।

আবার কিছুক্ষণ পরে সেই জিজ্ঞাসা, ওটা কি বল্লেন স্যার।

সুভাষচন্দ্র গর্জ্জন করে উঠলেন, shut up! হতাশ হয়ে অফিসর বড় কর্ত্তাদের কাছে নালিশ করলো।

সুভাষচন্দ্র কলকাতা থেকে বহরমপুরে বদলি হয়ে গেলেন।

বহরমপুর থেকে একেবারে দেশের বার···মান্দালয়ের জেলে।

৪৩

মান্দালয় জেল···দীর্ঘ অবরোধ···অনির্দ্দিষ্ট মুক্তির কাল···

সমুদ্র-অভিযাত্রী নদী সহসা মরু-স্তরে ব্যাহত···গতির মহা-অপঘাত।

বর্ম্মার নিষ্করুণ গ্রীষ্মে আতপ্ত কাঠের ঘর···বন্দীশালা···বায়ুহীন রুদ্ধ কক্ষ···

নির্য্যাতন···লাঞ্ছনা···আত্মার শত অপমান।

* উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়

সভ্য-শাসনের কারা-ব্যবস্থা, বর্ব্বর-যুগের দগ্ধ-লৌহের যন্ত্রণা নয়—

ভদ্রবেশী সভ্যতার ছদ্মবেশী মৃত্যুর ধারাবাহিক নিঃশব্দ দহন…

দেহের সঙ্গে সঙ্গে মলিন হয়ে আসে মন।

প্রতিদিনের জঘন্য অলস পুনরাবৃত্তি…

"সময় সময় মনে হয়, যেন কত যুগ ধরে এখানে আছি…এ যেন আমার ঘর-বাড়ী…কারাগারের বাইরের জগৎ যেন স্বপ্নের জগৎ… যেন ইহজগতে একমাত্র সত্য লৌহের গারদ আর প্রস্তরের প্রাচীর"।*

কেটে যায় চোদ্দ মাস…যেন চোদ্দ যুগ…অনিবার্য্য ভবিতব্যতার মত যেন এগিয়ে আসে বার্দ্ধক্য, দেহ ও মনের…অসহায় নৈরাশ্য… সজাগ হয়ে ওঠে বন্দী।

নির্জন-কক্ষে রাত্রি-অন্ধকারে সহসা কোথা থেকে যেন ভেসে আসে, গম্ভীর উদার-কণ্ঠে, স্নিগ্ধ অনুষ্টুপ ছন্দে বিশুদ্ধ-উচ্চারিত সংস্কৃত-শ্লোক…ভাগবত-গীতা…

মনে পড়ে, এই কারাগারে, ভারত-পথের আর এক পথিক মারাঠার বীর সন্তান, তাঁরই মত স্বদেশ থেকে বিচ্যুত হয়ে, দীর্ঘ ছ' বৎসর কাল বন্দী-জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন…

নিজের দিকে চেয়ে বন্দী বুঝতে পারে, কেন বালগঙ্গাধর তিলক অকালে দেহত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই সুনিশ্চিত আত্মিক অপমৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যেই সেদিন তিলক এই কারাগারে বসে গীতার অনুশীলনে মনকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন।

আত্মার অপমৃত্যু…সেই তো পরাজয়।

রুদ্ধকক্ষ কারাগারে সুরু হয় নতুন সংগ্রাম…

বিংশ-শতাব্দীর রাজনীতির ইতিহাসে ভারতের নতুন অনুশীলন …বস্তুর বিরুদ্ধে…বন্ধনের বিরুদ্ধে…দানবের বিরুদ্ধে মানব-চিত্তের অভিযান।

বন্দীশালা পারে না বন্দী করতে মনকে…কোন শৃঙ্খলই পারে না তাকে নিষ্পেষিত করতে।

* মান্দালয় জেল থেকে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তকে লিখিত পত্র থেকে

তাই কারাগারে অরবিন্দ পান ভগবৎ-নির্দ্দেশ,

তিলক রচনা করেন নব-গীতা…

বন্দী সুভাষচন্দ্র' নিষ্প্রাণ অন্ধকারে তাই নিজের অন্তরের দিকে ফিরে চাইলেন, আলোর শিখার সন্ধানে।

৪৪

কারাগারের একধারে একটী ছোট্ট ঘর হলো ঠাকুর-ঘর।

বন্দীশালায় বন্দনাগার।

সেই ঘরে বন্দী বসলেন ধ্যানে।

এতদিন টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে, বাইরের শত কাজে নিজেকে দিয়েছিলেন ছড়িয়ে, কারাগারের সেই ঠাকুর-ঘরে বসে আবার সেই টুক্‌রো টুক্‌রো আমি-গুলোকে টেনে নিয়ে একত্র করলেন মনে।

জীবনের সব চেয়ে বড় অনুসন্ধান, নিজেকে অনুসন্ধান করে বার করা। ব্যক্তিগত জীবনের সব চেয়ে বড় কীর্ত্তি।

এ কীর্ত্তির সাক্ষী কেউ থাকে না…এর নজীর ইতিহাসে লেখা হয় না।

বাইরের করতালি-মুখরিত খবরের কাগজের হেড-লাইনে-বিঘোষিত ঘটনার আড়ালে এই মানব-মনের মহা-সংবাদ নিঃশব্দে চাপা পড়ে যায়। বাইরের মানুষটী তাই যখন হাততালি পায়, ভেতরের মানুষটী নিঃশব্দে ম্লান হাসি হাসে।

তাই পেছন দিকে চেয়ে আজ আমি দেখছি, মান্দালয় জেলের আপাত ঘটনাবিহীনতার আড়ালে সেই আত্মগোপনকারী অদ্বিতীয় দ্বিতীয় মানুষটীকে…যার সন্ধান তখন দেশ নেয় নি বলেই 'গক্' বলে তারা হেসেছিল…ইথারে আই-এন্-এর ভেসে-আসা সংবাদ শুনে অবিশ্বাস করেছিল…অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল…তার জায়গায় অনায়াসেই বিশ্বাস করে নিয়েছিল, আই-এন্-এ মানে হলো ইম্পিরীয়াল নিপ্পন আর্মি…

মান্দালয় জেলের সেই তিনবৎসরব্যাপী দীর্ঘ অবরোধের আপাত-ঘটনা-বিহীন জীবনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সুভাষচন্দ্রের জীবনের, মানসিক জীবনের, অন্যতম সর্ব্ব-প্রধান ঘটনা…মানসিক সম্পূর্ণতা…

নিজেকে নিজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া।

যে কারাগার, যে কারাজীবন, বেদনার, যন্ত্রণার, আত্মক্ষয়ের নরক, তারি মধ্যে থেকে, বেদনার কণ্টক-আসনে বসে, সুভাষচন্দ্র বেদনা-বহির্ভূত আনন্দরসের মূল উৎসকে খুঁজে পেলেন।

তাই কারাগারে বসে বলতে পারলেন, "নীলকণ্ঠকে আদর্শ করে যে ব্যক্তি বলতে পারে, আমার মধ্যে আনন্দের উৎস খুলে গেছে, তাই আমি সংসারের সকল দুঃখকষ্ট নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি; যে ব্যক্তি বলতে পারে, আমি সব যন্ত্রণা-ক্লেশ মাথায় তুলে নিচ্ছি, কারণ এর ভেতর দিয়ে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি, সেই ব্যক্তিই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে। আমাদের আজ সেই সাধনায় সিদ্ধ হতে হবে।"

মান্দালয় কারাবাসের শৃঙ্খলিত জীবনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র নিজে সেই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। সেদিন নীলকণ্ঠের আদর্শকে প্রত্যেক্ষ সাধনায় নিজের মধ্যে উপলব্ধি করেই বলতে পেরেছিলেন, আমার মধ্যে আনন্দের উৎস খুলে গিয়েছে। তাই তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে যখন দেখি, কাবুলের তুষারে, শীতের রাত্রিতে যোজনান্ত নগ্ন-প্রান্তরে, সাব-মেরিণে, শত্রু ব্যূহের মধ্যে, মৃত্যু-কণ্টকিত বার্মার জঙ্গলে, তাঁর অসীম স্থৈর্য্য, অনাড়ম্বর অকুতোভয়তা, তখন তাকে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত ভাববার কোন হেতু দেখি না। অপরিসর ক্ষেত্রের অনুর্ব্বরতায় যা আত্ম-বিকাশের সুযোগ পায়নি, জগতের বৃহত্তর ব্যাপ্তির মধ্যে তা অনায়াসেই ফুটে উঠলো।

এই মান্দালয় জেলে বাস করবার সময়ই তাঁর প্রিয় বন্ধু দিলীপ-কুমার এক পত্রে তাঁকে লিখেছিলেন, "মানুষের অশ্রু দিনের পর দিন কেমন করে সমস্ত পৃথিবীর মাটীকে একেবারে তলা পর্য্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে—এই দৃশ্য আমাকে প্রতিদিন গম্ভীর ও বিষণ্ণ করে তুলেছে।"

তার উত্তরে সেদিন মান্দালয় জেল থেকেই সুভাষচন্দ্র লিখে ছিলেন, "সমৃদ্ধতর ও প্রশস্ততর আনন্দলোকে পৌঁছবার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি দুঃখকষ্টের ছোটখাট অগভীর ঢেউগুলি পার হয়ে যেতে অরাজী হতে?"

সেই প্রশস্ততর আনন্দলোকে সুভাষচন্দ্র পৌঁছতে পেরেছিলেন

বলেই, তাঁর জীবনে আনন্দ দেবার বাইরের উপকরণের কোন বাহুল্যই ছিল না।

এমন কি নারী পর্য্যন্ত নয়।

৪৫

রাজনৈতিক সুভাষচন্দ্রের আড়ালে, মান্দালয় কারাগারে অতি সংগোপনে দেখি, আর এক সুভাষ···বাইরের খোলসের আড়ালে ভেতরের মানুষটাকে।

ছেলেবেলা থেকে, ছায়ার মত নিঃশব্দে সেই দ্বিতীয় সত্তাটী তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে···সেই একদিন শৈশবে বিবেকানন্দের পটকে পূজো করেছে, কিশোর কালে গুরুর সন্ধানে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে, শান্তিপুরে গঙ্গাজলে আবক্ষ নিমজ্জিত থেকে কৃচ্ছ্র সাধন করেছে···জীবনের প্রথম চেতনা থেকে নারীকে মাতৃজ্ঞানে দেখেছে ···তাকেই আবার দেখি মান্দালয় জেলে ঠাকুর-ঘরে···বন্দীশালায় ধ্যান-সমাহিত মুক্তিকামী তাপস···যোগ-সাধনায় নিরত।

যোগ-সাধনা···চিত্ত-নিবৃত্তির সাধনা···যার ফলে অন্তর হবে অলৌকিক শক্তির অধিকারী।

তারি জন্যে ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন···তারি জন্যে গেরুয়া··· তারি জন্যে ব্রহ্মচর্য্য···সত্যভাষণ···কৃচ্ছ্র সাধন।

ভারতের কৃষ্টি-অর্জ্জনের ও শক্তি-সংগ্রহের সনাতন-ধারা।

এবং তা যে সম্ভব···তরুণ সাধকের সামনেই রয়েছে তার জীবন্ত প্রমাণ, বিবেকানন্দ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বন্দী বলে, আজ তিনি জীবিত থাকলে, আমি তাঁরি চরণে আশ্রয় নিতাম। *

সেই ভাব···সেই ভাবনা।

বাইরে শুধু গেরুয়াটুকু নেই।

সেই তাঁর মত, চরম লক্ষ্য, আত্মার মুক্তি নয়···ব্যক্তিগতসমাধির অমৃত-ফল-ভোগ নয়···

লক্ষ্য, দেশের মুক্তি।

“মুক্তি নানা মূর্ত্তি ধরি, দেখা দেয় জনে জনে।”

---

* যদিও এই উক্তি আছে, সিওনি জেল থেকে লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্রে।

বিবেকানন্দের চিন্তাধারার শেষ-ফল সুভাষের কাছে মুক্তি দেখা দিল, ভারতের মুক্তির মূর্ত্তি ধরে।

তারি জন্য প্রয়োজন এই আত্মিক শক্তি। নিগূঢ়, নীরবে চলে সেই শক্তি-সঞ্চয়ের সাধনা।

৪৬

জাতির পুণ্য-সঞ্চয়ের ভাণ্ডার যখন বিংশতাব্দীর তৃতীয় পাদে এসে তিল তিল করে নিঃশেষ হয়ে যাবার মতন হলো—

সমষ্টিগতভাবে যখন বাঙালী তার সব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ধাপে ধাপে সমুদ্র-নিঃক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডের মত অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল—

সেই সময়, জাতির ভাগ্য-বিধাতার শেষ করুণার দানস্বরূপ, এই একটী লোকের মনের মধ্যে,

তুর্ভিক্ষ-দিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট শস্য-সঞ্চয়ের মত—

জাতির সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে সঞ্চিত দেখতে পাই।

তাই জাতিগত ভাবে বাঙালী যা হারালো,

আত্মবিশ্বাস, তুর্দ্দান্ত কল্পনার তুরন্ত আবেগ, স্বপ্ন দেখবার তুঃসাহস, সব-হারিয়েও সব-পাবার তুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, নতুনকে বরণ করবার চির-নবীন উৎসাহ, ভারতের মানসিক অধিনায়কত্ব…

যা নিয়ে বাংলার বৈশিষ্ট্য, বাঙালীর গর্ব্ব,

ব্যক্তিগত ভাবে নিজের মধ্যে থেকে তা পূরণ করে দেবার মহা-দায়িত্ব যেন বিধাতা দিলেন এই একটী লোককে।

সেদিন না বুঝলেও, না জানলেও, অচিরকালের মধ্যে একদা সমগ্র বাঙলা দেখলো, সে এই একটী লোকের মধ্যে বেঁচে আছে… তার সব হারানো ঐশ্বর্য্য এই একটী লোক সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে এনে দিল। প্রত্যেক বাঙালী তাঁর মধ্যে খুঁজে পেল তার ঐতিহাসিক সত্তাকে। এমন করে একটা লোক একটা সমগ্র জাতির নৈতিক ভার এমন অনায়াসে একা আর আর কখনো বহন করে নি।

কিন্তু সে বহু-পরবর্ত্তী অধ্যায়ের কথা।

৪৭

কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে সেদিন চলেছিল সেই অপরূপ মানসিক প্রস্তুতি।

একান্ত দুঃখের বিষয় তার ইতিহাস কিছু নেই।

আছে শুধু মান্দালয় জেল থেকে লেখা কয়েকখানি অপরূপ পত্র। তারি মধ্যে আছে তার ইঙ্গিত। প্রমাণ।

বন্দী-অবস্থায় স্বভাবতই মন ফিরে চায় ভেতর দিকে। সেখানে চেয়ে সুভাষচন্দ্র দেখেন, ধীরে ধীরে বাঙ্গালী-চরিত্রে কখন আত্মবিশ্বাসের বদলে এসেছে অশ্রদ্ধা···সব বিষয়ে লঘু অশ্রদ্ধা··· বাস্তবের সঙ্গে বারবার রূঢ় সংগ্রামে ভেঙ্গে গিয়েছে তার কল্পনা করবার দুঃসাহস, স্বপ্ন দেখবার শক্তি, আদর্শের প্রতি সেই তীব্র অনুরাগ।

"কয়েকদিন আগে আমার (সুভাষচন্দ্রের) ছাত্রস্থানীয় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে আমাকে কতকগুলি প্রশ্ন করে। * * তার প্রশ্নের ভাব, আমাদের দেশে কিছুতেই কিছু হবে না। * * নৈরাশ্যব্যঞ্জক···অবিশ্বাস-পূর্ণ।

আমি বল্লাম, দেখ, তোমার বয়স আমার চেয়ে অনেক কম। * * আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আইডিয়ালিজম্ বেড়ে চলেছে কিন্তু তোমার দেখছি দিন দিন ক্ষীণ হয়ে পড়ছে।"

এই মারাত্মক ব্যাধির বিষয়ে সজাগ করবার জন্যেই তিনি সেদিনকার তরুণদের কাণে শোনালেন, "বাঙালীর আত্মবিশ্বাস আছে, বাঙালীর ভাব-প্রবণতা ও কল্পনাশক্তি আছে—তাই বাঙালী বর্ত্তমান বাস্তব জীবনের সকল ত্রুটী, অক্ষমতা, অসাফল্যকে অগ্রাহ্য করে মহান আদর্শ কল্পনা করতে পারে, সেই আদর্শের ধ্যানে ডুবে যেতে পারে এবং আপাতদৃষ্টিতে যা অসাধ্য তা সাধন করবার চেষ্টা করতে পারে।"

আপাত-দৃষ্টিতে যা অসাধ্য!

সেই অসাধ্য-সাধনই জীবনের চরম সাধ্য!

জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ নীরবে গ্রহণ করেন সেই ব্রত।

"নিঃশেষে জীবন দান করেই জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে" একথা যেদিন বলেছিলেন, সেদিন থেকে কোহিমার রণক্ষেত্র বহু বহুদূরে ছিল।

কিন্তু তার বহু আগে থাকতেই নিঃশব্দে চারিদিকের ভেঙ্গে-পড়ার মধ্যে তিনি নিজের মনকে প্রস্তুত করে চলেছিলেন।

জীবনের নিঃশব্দ উদ্যোগ-পর্ব্ব।

৪৮

এই মান্দালয় জেল থেকে লেখা চিঠিগুলির* মধ্যে সুভাষচন্দ্রের জীবনের মূল কেন্দ্রটীকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। দেখতে পাই, তাঁর মানসিক জীবনের মানচিত্র…

তার জন্যে সব কিছু বিসর্জ্জন দিতে হবে…অর্থ…সুখ…ব্যক্তিগত স্নেহ, প্রেম…

তার চেয়েও বেশী, নিজের অন্তরের সহজাত সৃজন-বাসনা পর্য্যন্ত…

এই চিঠিগুলির ভাষা পড়তে পড়তে মনে হয়, কত বড় সাহিত্যিক, কত বড় কবি, কত বড় দার্শনিকই না তিনি হতে পারতেন…নিজের হাতে একে একে তাদের সমাধি রচনা করতে হয়েছে নিজের মনে।

একদিন কোন রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অবসরে একজন ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নারী সম্বন্ধে কোনদিন কি আপনার কোন আকাঙ্ক্ষা জাগে না?

সহজভাবে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ও প্রশ্ন ভাববার সময় পাই নি।

সে-সর্ব্বগ্রাসা প্রেমের খাণ্ডব-দাহন-অগ্নি-ক্ষুধায় অন্য সব কিছুই আহুতি দিতে হয়েছিল…

এমনি সর্ব্বগ্রাসী প্রেম…অন্য কিছুর এতটুকু সতীনত্ব সইলো না সে…

তাই কারাবাসের যন্ত্রণার কথা শুনে বলেছিলেন সেদিন, "পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত করে যে-জ্বালা বোধ হয়, সে-জ্বালার মধ্যেও যে কোন সুখ পাওয়া যায় না, তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালবাসি, যাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসি বলে আজ আমি এখানে (কারাগারে), তাঁকে বাস্তবিকই ভাল-বাসি, এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয়, বদ্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষত-বিক্ষত হলেও, তার মধ্যে সুখ আছে, শান্তি আছে, তৃপ্তি আছে। * * এখানে না এলে বুঝতাম না সোনার বাংলাকে

কত ভালবাসি। * * কে আগে জানতো বাংলার মাটী, বাংলার জল, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।" *

কিম্বা আর একখানি চিঠিতে যখন পড়ি, "প্রাতে কিম্বা অপরাহ্ণে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্য মনে হয়, মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথা কয়েকটি বঙ্গ-জননীর চরণ-প্রান্তে পাঠিয়ে দিই। অন্তত বলে পাঠাই, বৈষ্ণবের ভাষায়,

তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা
বহিতে আমার সুখ।"†

জগতের যে কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে এই কয়টি রক্ত-রাঙা অক্ষর বসিয়ে দেওয়া যায়···আর এই অক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে-প্রেম···আজ তারি স্পর্শে রাঙা হয়ে উঠেছে শ্যাম-কম্বোজ-বলি-যবদ্বীপ থেকে শুরু করে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া···ঢেউ উঠেছে প্রশান্ত মহাসাগরের বুক থেকে আরব-মহাসাগরের বুকে।

৪৯

বন্দী জীবন···বাইরের জগতের সঙ্গে কর্ম্ম-সম্পর্ক সব ছিন্ন···

পারিবারিক সংবাদ ছাড়া অন্য কোন সংবাদ জেলের দরজা দিয়ে ঢুকতে পারে না।

এ হেন অবস্থায় একদিন এলো সংবাদ, দেশবন্ধু নাই।

অসমাপ্ত কর্ম্ম-ভার ফেলে রেখে চলে গিয়েছেন রাজর্ষি···

অসমাপ্ত যুদ্ধের মধ্যে বিদায় নিয়েছে সেনাপতি।

তাঁর বিশ্বস্ত সেনা-নায়কেরা তখন অধিকাংশই মান্দালয় জেলে···

বিশেষত সুভাষচন্দ্র।

দুদিন সুভাষচন্দ্র মুখে অন্নজল দিতে পারলেন না। দুদিন কারুর সঙ্গে একটিও কথা বল্লেন না। বলতে পারলেন না।

৫০

দীর্ঘ অবরোধ···অনির্দ্দিষ্ট মুক্তির কাল···

ক্রমশ দেহ ক্ষীণ হয়ে আসে।

---

* মান্দালয় জেল থেকে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে

† ,, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তকে লেখা পত্রে

দেহ মন নয়।

তাতে অনায়াসে পড়ে লোহার দাগ।

দেখা দেয় উত্তাপ। প্রতিদিন নিয়মিত আসে জ্বর।

ভাঁটার টানে নদীর জল শুকিয়ে আসার মতন, কমে আসে দেহের ওজন…

ক্রমে নিতে হয় শয্যা। বন্ধ হয়ে আসে চলৎ-শক্তি। সর্ব্বাঙ্গে কঠিন ব্যথা।

জেলের রুদ্ধদ্বারের ছিদ্র দিয়ে দেশের মধ্যে যেটুকু আসে সংবাদ, তাতে আশঙ্কায় দুলে ওঠে লোকের মন।

দেখতে দেখতে চল্লিশ পাউণ্ড ওজন কমে গেল। একেবারে শয্যাশায়ী হলেন।

সরকার এবার সজাগ হয়ে উঠলেন।

রোগীর তরফ থেকে তাঁর দাদা ডাঃ সুনীল বোস্ এসে পরীক্ষা করবার অনুমতি পেলেন....

পরীক্ষা করে বল্লেন, অবস্থা একান্ত আশঙ্কাজনক…

কিন্তু সরকারী বিবরণে বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে মিঃ মোবার্লি বল্লেন, সুভাষচন্দ্র যে অত্যধিক পীড়িত হয়েছেন, একথা বলা চলে না।

বন্দীর মনে কৌতূহল জাগে।

—আমার জানতে কৌতূহল হয়, সরকার কবে আমাকে "অত্যধিক পীড়িত" বা "একেবারে কর্ম্ম-শক্তিহীন" মনে করবেন। যেদিন সব চিকিৎসক ঘোষণা করবেন, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে মৃত্যু হতে পারে, সেদিন ?

সেদিন সত্যিই যখন এলো, তখন মিঃ মোবার্লি জানালেন, সুভাষচন্দ্রকে তাঁরা ছেড়ে দিতে রাজী আছেন, তবে তাঁকে ভারতবর্ষ ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে যেতে হবে… ।

সুভাষচন্দ্র জানালেন, ভারতবর্ষ ছেড়ে তিনি কোথাও যেতে চান না…তার চেয়ে তিনি জেলেই মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত।

আত্মীয়-স্বজনেরা উদ্বিগ্ন হয়ে সুভাষচন্দ্রকে বাইরে য়ুরোপের কোন স্বাস্থ্যনিবাসে যাবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন।

কিন্তু সে-সর্ত্তে মুক্তি নিতে সুভাষচন্দ্র কিছুতেই সম্মত হলেন না।

এক বন্দী-দশার বদলে আর এক বন্দী-দশা। স্বদেশ থেকে কে জানে চির-নির্ব্বাসন কী না!

এধারে দিন-দিন তাঁর অবস্থা ক্রমশ সরকারী মতেও আশঙ্কা-জনক হয়ে উঠতে লাগলো।

অবশেষে একদিন গভর্ণমেণ্ট "এরোণ্ডা" জাহাজে নিঃশব্দে তাঁকে কলকাতায় এনে পৌঁছে দিল।

১৫ই মে (১৯২৭) কলকাতার লোকেরা জানতে পারলো, সুভাষচন্দ্র কারামুক্ত।

৫১

ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন, কিছুকাল সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম নিতে হবে···

কিন্তু তা সম্ভব হলো না।

দেশের মধ্যে তখন একটা অনিশ্চিত অস্থির আলোড়ন।

বল্লেন, দেশের এ অবস্থায়, অসুস্থ হয়ে থাকা সাজে না।

বিশেষ করে তখন ইংলণ্ড থেকে আসছে সাইমন কমিশন··· ভারতের দাবীর প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ডের কুণ্ঠিত মুষ্টি-ভিক্ষার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করবার জন্যে।

কংগ্রেস নির্দ্দেশ দিল, সাইমন কমিশনকে বয়কট করতে। সাইমন কমিশন যেখান দিয়ে যাবে, সেখান দিয়ে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, শূন্য রাজপথে, রুদ্ধদ্বারে, জাতির বিরূপ অভিবাদন।

সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী মন তাতে সন্তুষ্ট হলো না।

রুদ্ধ-দ্বারে বসে থাকা নিষ্ক্রিয়তা।

বহুদিন পরে এমন একটা সুযোগ পাওয়া গিয়েছে, যাতে সমগ্র দেশের চিত্ত একমুখীন। এই একমুখীনতাকে সক্রিয় করে তুলে স্বাধীনতার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

আবেদন, নিবেদন, বাদ, অনুবাদ, প্রস্তাব, প্রত্যাখ্যান, বহুদিন বহুভাবে হয়ে গিয়েছে···এখন প্রয়োজন কর্ম্মের···সংগ্রামের···

ছুটলেন সবরমতী আশ্রমে, মহাত্মা গান্ধীর কাছে। উপস্থাপিত করলেন, তাঁর প্রস্তাব। বল্লেন, অধিনায়ক হন এই সংগ্রামের।

মহাত্মা গান্ধী রাজী হলেন না। তাঁর ধারণা, সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয় দেশ।

ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এলেন সুভাষচন্দ্র।

পুণা শহরে মহারাষ্ট্র যুবকদের স্পষ্টভাবে জানালেন অন্তরের এই ক্ষোভের কথা। তীব্র সমালোচনা করলেন মহাত্মা গান্ধীর এই সংগ্রাম-বিমুখতার।

সেদিন দেশবাসী স্পষ্ট করে না বুঝলেও, আজ বোঝা যাচ্ছে, সেই দিন থেকেই সুরু হলো, কংগ্রেসের মধ্যে দুটো ভিন্ন-ভাবের গোপন সংঘর্ষ। পুরাতনের সঙ্গে নতুনের সংঘর্ষ।

পুরাতন চাইলো, অহিংস-অসহযোগের নিয়মতান্ত্রিক পথে আপোষনিষ্পত্তির দ্বারা দফায় দফায় যেটুকু স্বাধীনতা পাওয়া যায়, সেই নিয়েই অগ্রসর হয়ে যাওয়া।

নতুন চাইলো, দফায় দফায় যে স্বাধীনতা অনিচ্ছুক দাতার কাছ থেকে পাওয়া যায়, তা আর যাই হোক্ স্বাধীনতা নয়। নিয়মতান্ত্রিকতার বালুচরে জাতির সংগ্রাম-স্পৃহা নিঃশব্দে কখন যাবে হারিয়ে।

প্রথম পথের নেতা, মহাত্মাজী।

দ্বিতীয় পথের আহ্বান বেজে উঠলো সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে।

কিন্তু মহাত্মাজীর প্রভাবকে অস্বীকার করে সমগ্র দেশকে অন্য কোন দ্বিতীয় পথে আনা, আজকের মতন সেদিনও অসম্ভবই ছিল।

কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করবার দুঃসাহস একমাত্র বাংলারই ছিল।

তবে বাংলা তখন দিনান্তে পরিশ্রান্ত ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত ঝিমিয়ে আসছিল।

তার ওপর, ধনী দরিদ্র হয়ে গেলে, যেমন তার মধ্যে অসম্ভব নীচতা দেখা দেয়, তেমনি নীচতায়, দুর্ব্বলতায়, একদা-ছিলাম-এর অন্তঃসারশূন্য দম্ভে ও দলাদলিতে, বাংলা তখন জলের তলায় ঢিলের মত ডুবে চলেছে।

তাই জাতির সমস্ত বৈশিষ্ট্য পুঞ্জীভূত হয়ে দেখা দিল, এই একটী মানুষের মধ্যে…তারি কণ্ঠে ধ্বনিত হলো প্রতিবাদের সুর…আবার দেখা দিল চিরকালের বিদ্রোহী বাঙালী।

৫২

কালের পরিপ্রেক্ষিতে আজ স্পষ্ট দেখা যায়, সেদিন সুভাষচন্দ্রের অন্তরের অন্তরতম স্থলে স্বাধীনতা-অর্জ্জনের যে উপায় নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিতে

দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক অহিংসবাদের কোন আত্মিক যোগ ছিল না।

তাই উনিশ শো আটাশে কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে পণ্ডিত মতিলাল যখন কলকাতায় এলেন, দেখেন, তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্যে সারি সারি নিখুঁত যোদ্ধার বেশে সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর দল। শুধু পুরুষবাহিনী নয়, সামরিক সজ্জায় নারী-বাহিনীও…ঝান্সীর রাণী-বাহিনীর অগ্রছায়া। সে দলের অধিনায়ক সেনাপতির সর্ব্বাঙ্গভূষণে ভূষিত সুভাষচন্দ্র—তাঁর পদবী, জেনারেল অফিসর কমাণ্ডিং।

জি. ও. সি.র কণ্ঠে সামরিক পরিভাষায় ধ্বনিত হলো, ফল্ ইন্।

সামরিক রীতি অনুসারে তারা সভাপতিকে জানালো অভিবাদন।

অহিংস-আন্দোলনের বাৎসরিক সভায় সেই নিখুঁত সমর-সজ্জা, সামরিক পরিবেশ, কংগ্রেসের ভেতরকার ভাব-গত দ্বন্দ্বের যেন যোগ্য বহিপ্র্কাশ।

সেই সামরিক আয়োজন যেন কংগ্রেসের মূল নীতির বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের নীরব প্রতিবাদ।

বিস্মিত নেতারা ঈষৎ লজ্জিত হয়ে সেই সামরিক সজ্জার মধ্যে দেখলেন সার্কাসের নকল অভিনয়।

রসিক যাঁরা তাঁরা বল্লেন, পার্ক সার্কাস…*

জি ও সি একত্র করে হেসে বল্লেন, গক্!

বিরক্ত হলো না, প্রতিবাদ করলো না, মহামৌনী।

জাতির অসহিষ্ণু বাচালতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যেন তিনি মহামৌনী, সুগম্ভীর!

সে-গাম্ভীর্য্যের আড়ালে তখন চলেছে কি মহা-আলোড়ন, তার সংবাদ তখন কে-ই বা জানতো।

৫৩

জাতীয় মহাসভার অধিবেশন বসেছে।

মহাত্মা গান্ধী মূল প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, নেহরু-কমিটি-নির্দ্দিষ্ট ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন…এক বছরের মধ্যে বৃটিশকে তা দিতে হবে ভারতবর্ষকে…

* কারণ পার্ক সার্কাস নামক স্থানে অধিবেশন বসে

নব-জাগ্রত তরুণের প্রতিনিধিস্বরূপ সুভাষচন্দ্র প্রতিবাদ করে উঠলেন, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন নয়, বৃটিশের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বাধীনতার কোন মানে নেই। এবং এই সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র কাম্য। বাংলা দেশ, এই স্বাধীনতার জন্যেই আন্দোলন সুরু করে। এই স্বাধীনতার জন্যেই দলে দলে শহীদেরা প্রাণ দিয়েছে, এই স্বাধীনতার কথাই বাংলার কবি গেয়েছেন। সদ্যজাগ্রত জাতির কাছে, এই স্বাধীনতার অন্য কোন দ্বিতীয় রূপ নেই।

উনিশশো বিয়াল্লিশ সেদিন এগারো বৎসর আগে এই তরুণ বাঙালীর অন্তরে জন্মগ্রহণ করে।

এবং সেদিন তাকে সব চেয়ে বেশী বাধা দিল, এগারো বৎসর পরে, উনিশশো বিয়াল্লিশে যারা সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলো।

ভোটে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

৫৪

কিন্তু ভোটের সংখ্যায় জগতের মূল নীতির পরিবর্ত্তন হয় না।

ভোটের সংখ্যার তারতম্যে জল আগুন হয় না।

ভোটের জয়-পরাজয় তাদের জন্যে, যারা জীবনটাকে জানে একটা বৃহৎ তর্ক-সভা ব'লে।

সৈনিকের কাছে জীবন তর্ক-সভা নয়, সংগ্রাম। সংখ্যা-নিরপেক্ষ গতি।

তাই কোন সংখ্যা কোন গতিকে অচল করতে পারে না।

গতির অঙ্কে সংখ্যার ধারাপাত নেই। তার ধারা দুর্নিবার।

তাই কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষচন্দ্র, যে-কথা কংগ্রেস বলতে দিল না, সেই কথা স্পষ্ট করে দেশের সামনে তুলে ধরবার জন্যে স্বাধীনতা-সঙ্ঘ গঠন করলেন। যোগদান করলেন জওহরলাল, শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার। দেশের তরুণ চিত্তে জাগাতে হবে এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা...সম্মানিত অস্তিত্বের একমাত্র ভিত্তি...সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

রুদ্ধ পাষাণের গায়ে বার বার আঘাত করে বন্দী ঝর্ণা...

কবে সে পাষাণ ভেঙ্গে পাবে নিষ্ক্রমণের পথ?

৫৫

বাংলাদেশে তখন স্যার ষ্টানলী জ্যাকসন বারবার চেষ্টা করেও তাঁকে মন্ত্রণা দেবার মত স্থায়ী পারিষদ্‌বর্গ খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

অগত্যা তিনি শাসন-সভাই ভেঙ্গে দিলেন। হোক্‌ পুনর্নির্ব্বাচন।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের তরফ থেকে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান গ্রহণ করলেন···সারা দেশ ঘুরে জনমত তৈরী করতে লাগলেন।

বিশ্রামহীন······

এক এক দিনে পাঁচটা বিভিন্ন শহরে পাঁচটা বিভিন্ন সভা···

সকালবেলা ডায়মণ্ড হারবার···সেখান থেকে কুলপী হাট··· তারপর করঞ্জালী···

করঞ্জালীতে সেদিন সন্ধ্যায় আটক পড়ে গেলেন···নিমন্ত্রণ··· নিমন্ত্রণ সেরে আবার রওয়ানা দিলেন···রাত তখন সাড়ে বারোটা···

চারদিকে অরণ্য···অন্ধকার···

হঠাৎ মাইল তিনেক যাওয়ার পর মোটর গাড়ী পথের ওপরই গেল থেমে···

যাত্রী রাজী হলেও, যন্ত্র রাজী নয়। তার পেট্রল গিয়েছে ফুরিয়ে।

চারদিকে সুন্দরবনের জঙ্গল। জনমানববিহীন। মাঝে মাঝে কানে আসছে নিশাচর প্রাণীদের রাত্রি-অভিসারের শব্দ···খুব শ্রুতি-মধুর যে তা নয়।

এ অবস্থায় কি করা যায়?

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মুখ দেখে, সহযাত্রীদের মনে হলো না যে, বিশেষ কোন বিপত্তির কারণ ঘটেছে।

তিনি অন্য তুজন সহযাত্রীকে ডেকে বল্লেন, গাড়ীর ভেতর শুয়ে পড়তে। নিজে পথের ধারে গাছতলায় একটা চাদর বিছিয়ে অব-লীলাক্রমে শুয়ে পড়লেন। এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। যেন এলগিন রোডে তাঁর ঘরেই শুয়েছেন···এবং সেটা সুন্দরবন এলাকায় নিশীথ-রাত্রির অরক্ষিত গাছের তলা নয়···

ভোর হতেই, ঘুম থেকে উঠেই পায়ে হেঁটে কিছুদূরের এক গ্রামে গিয়ে সভা আহ্বান করলেন···

সেখান থেকে নিকটবর্ত্তী রেল-স্টেশন দশ মাইল দূরে··

সভার শেষে তিনি ঠিক করলেন হেঁটেই স্টেশনে যাবেন।

সহযাত্রী অনুরোধ জানালেন, একটু অপেক্ষা করে যান···অজানা পথে দশ মাইল পায়ে হেঁটে···

—যেতেই হবে···দশ মাইলের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকা যায় না।

৫৬

মানুষের মধ্যে এমন দু'একজন মানুষ থাকেন, যাঁরা অমর···মরেন না···বারেবারে নানারূপে তাঁরা জাতির জীবনে দেখা দেন···

মনে হয়, এমনি আছে দু'একটা সন-তারিখ···যারা তিন শো পঁয়ষট্টি দিনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও বেঁচে থাকে···নানারূপে জাতির ইতিহাসে দেখা দেয় বারে বারে···

"১৮৭৫" ভারতের আধুনিক ইতিহাসে তেমনি একটি সন-তারিখ···

"১৯০৫"-এর ছদ্মবেশে আবার সেই দেখা দেয় বাংলায়···

তারি বিদেহী সত্তা দেহশূন্য আত্মার মত—বারেবারে চেষ্টা করেছে নতুন আধারে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করতে···

আমরা মনে করেছি, তার শ্রাদ্ধকৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি সে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে···কিন্তু সে বারেবারে ইঙ্গিতে আভাসে আমাদের জানিয়ে দিয়েছে···কালের শাসনে এখনো মরে নি আমার দুর্বিনীত আত্মা···

তাই অহিংস-আন্দোলনের সমস্ত নৈতিক প্রভাব এড়িয়ে, যে-সময়ের কথা আলোচনা করছি, সে-সময়, সহসা আধিদৈবিক উৎপাতের মত বারেবারে বাংলা দেশকে সচকিত করে তোলে সেই মৃত উনিশ শো পাঁচের পুনর্ভব-চেষ্টা।

সাধারণ লোক খবরের কাগজের পাতায় দেখলো, বাংলা দেশে, বাংলা দেশের কংগ্রেসে, কিসের-যেন-কি-ব্যাপার নিয়ে ভীষণ দলাদলি।

একদল সামনে তুলে ধরলো যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে...আর এক দল তুলে ধরলো সুভাষচন্দ্রকে।

নির্ব্বাচনের গোলমাল, সভাপতির পদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, করপোরেশন···এই তিনটি ব্যাপার হলো প্রত্যক্ষ, যা সবাই খবরের কাগজে দেখতে পেলো।

দেখতে পেলো একদলের পেছনে রয়েছে অনুশীলন সমিতি,

আত্মোন্নতি সম্প্রদায়···আর একদলের পেছনে যুগান্তর এবং এই দুই দলের সংঘর্ষের মধ্যফলস্বরূপ সৃষ্ট হলো নতুন একটী দল, কর্ম্মীসঙ্ঘ।

এই আপাতদ্বন্দ্বের আড়ালে দেখি, ভূতপূর্ব্ব উনিশ শো পাঁচের সেই প্রাণান্ত পুনর্ভব-চেষ্টা।

নব-জাগ্রত কংগ্রেসের অহিংস-নীতির সঙ্গে বাংলা দেশের দুর্বিনীততম আত্মার অসহায় সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা।

বাংলা দেশ কংগ্রেসকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি···সে-সময়ের সমস্ত কুৎসিৎ দলাদলির উর্দ্ধে আজ এই কথাটাই বেঁচে আছে। যা কুৎসিৎ, তা সাময়িক। আজ আর সে-প্রসঙ্গকে টেনে এনে কোন লাভ নেই।

এই দলাদলি মেটাবার জন্যে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি বাইরে থেকে প্রতিনিধি পাঠিয়ে বারবার চেষ্টা করেছেন মিটমাট করিয়ে দিতে। বাংলার এমনি স্বাতন্ত্র্য-অভিমান যে, গণতান্ত্রিকতার নীতি-বোধের প্রভাবেও, এই বাইরের বিচারকত্ব সে স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারিনি।

বাংলা ভারতের মানচিত্রে স্বতন্ত্র।

এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমশ আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠলো, বাংলার শেষ-প্রতিনিধি সুভাষচন্দ্রের মধ্যে দিয়ে।

সেই তার অপরাধ, সেই তার মহৎ বৈশিষ্ট্য।

তাই সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীর মধ্যে যে বিরোধিতা···সে-বিরোধিতা ব্যক্তিনিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ধারার বিরোধিতা।

হয়ত কোন বৃহত্তর মহাসাগরসঙ্গমে এই দুই আপাতবিভিন্ন ধারা এক হয়ে মিশেছে বা মিশবে।

৫৭

কলকাতা কংগ্রেসের পর থেকে দেখি, ভারতের রাজনৈতিক জীবনে, এই দুটী ধারা অস্পষ্ট বিমুখীনতা থেকে ক্রমশ স্পষ্ট বিরোধিতায় পরিণত হয়ে চলেছে।

লাহোর কংগ্রেসের আগে, হঠাৎ একদিন বড়লাট লর্ড আরউইন যখন সিমলায় যাচ্ছিলেন, তখন কে বা কারা তাঁর গাড়ীতে বোমা ফেলে।

কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বাধীনতা-প্রস্তাবের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী একটা লাইন জুড়ে দিলেন, বোমার আঘাত থেকে দৈবকৃপায় পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে, কংগ্রেস বড়লাটকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

স্বাধীনতা-প্রস্তাবের সঙ্গে সেই লেজুড়ে সুভাষচন্দ্র আপত্তি করলেন।

কিন্তু আপত্তি টিকলো না।

মূল প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বল্লেন, শুধু স্বাধীনতার প্রস্তাব করে বসে থাকার দিন চলে গিয়েছে...সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করতে হবে...আয়ারল্যাণ্ডে সিনফিনেরা যেমন করেছে। বৃটিশ-শাসনের পাশাপাশি চলবে সেই নতুন স্বদেশী সরকার। বাস্তব সংগ্রামের মধ্যে গড়ে উঠবে—রাষ্ট্রীয় আত্মশাসনক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা।

দুর্বিনীত যৌবনের স্পর্দ্ধিত বাণী। রুদ্ধ ঝর্ণার সেই নিরুদ্ধ তরঙ্গ-বিক্ষোভ।

কংগ্রেস অনুমোদন করলো না। মহাত্মা গান্ধী বল্লেন, দেশ তার জন্যে প্রস্তুত নয়।

সুভাষচন্দ্র বল্লেন, সংগ্রামই তৈরী করবে সংগ্রাম-শক্তি।

কিন্তু ভোটে টিকলো না তাঁর কথা।

অন্তরের নিরুদ্ধ বেগ অন্তরেই আবর্ত্ত তোলে। কোথা তার নিষ্ক্রমণ-পথ ?

কংগ্রেসের অধিবেশনের পর, বসলো নতুন সভাপতির মন্ত্রণা-দাতা নির্ব্বাচনের পালা...কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচন।

নির্ব্বাচন বটে কিন্তু প্রথা-মত তা দাঁড়িয়েছে মনোনয়নে।

প্রত্যেক সভাপতিই মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত সদস্যদের নিয়েই কমিটী গঠন করেন। তার মধ্যে বাদ-বিতণ্ডা, রেষারেষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান থাকে না। কারণ প্রত্যেক সভ্যই একমতাবলম্বী। যাতে সভাপতিকে কাজ চালাবার সময়, প্রতিপদে নিজের মন্ত্রণাদাতাদের সঙ্গে সংঘর্ষ না করতে হয়, তারি জন্যে এই ব্যবস্থা।

এই প্রথা, এই রীতি। এখন আইনে পরিণত হতে চলেছে। সংস্কার।

তার বিরুদ্ধে যাওয়া মানে, মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে যাওয়া।

মহাত্মা গান্ধী জাতির চিত্তে নিজের মহিমায় বিগ্রহের স্থান অধিকার করে আছেন।

এমন কি জওহরলাল, বৈজ্ঞানিক নব-যুগের সংস্কার-মুক্ত সাধক জওহরলাল, সে-ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

এ এক অপূর্ব্ব সম্মোহন।

এই সম্মোহনের নাগ-পাশ থেকে নিজেকে ছিন্ন করতে হলে, চাই তেমনি ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র শক্তি। সমগ্র ভারতবর্ষ বিস্ময়ে দেখলো, সুভাষচন্দ্র সেই সম্মোহন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়ালেন।

সাধারণ লোকের কাছে সেটা দেখালো দাম্ভিকতা…

পৌত্তলিক-বিগ্রহ-পূজার দেশে পূজার মন্ত্র বদলানো মানে বিগ্রহের অপমান, দেবতার লাঞ্ছনা।

কংগ্রেস-ভক্তদের কাছে মনে হলো, অন্যায়, নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতিবন্ধকতা।

শুধু মহাকাল দেখলো, দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ। একজনের ব্যক্তিত্ব তখন পরিস্ফুট, পূর্ণ-বিকশিত, অপর জনের নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ হলেও, বাইরে তখনও পূর্ণ-বিকশিত হবার সুযোগ পায় নি।

প্রবীণতার বিরুদ্ধে যৌবনের স্বভাব-বিদ্রোহ।

সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত সেই সদস্য-গঠন-প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন তুল্লেন, লক্ষ্য যেখানে এক, সেখানে মত যদি ভিন্ন হয়, পথও কি ভিন্ন হবে? প্রতিবাদ কি শুধু প্রতিপক্ষেরই ধর্ম্ম?

তার উত্তর সেদিন ভোটে নির্দ্ধারিত হল প্রশ্নকর্ত্তার বিরুদ্ধে।

গণতান্ত্রিকতার ত্রুটী, সংখ্যার আধিপত্য।

সুভাষচন্দ্র ভোটে পরাজিত হলেন এবং ওয়ার্কিং কমিটী থেকে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হলো।

এই ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া প্রত্যেক দলের কাগজে এবং উপনেতাদের মধ্যে কুৎসিৎ ব্যক্তিগত আক্রমণে দেখা দিল।

সেটা বোধ হয়, এদেশের মাটীর দোষ।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁর চরিত্রে দেখালেন, ব্যক্তিত্বের প্রতিবাদ ব্যক্তির প্রতি অসম্মান নয়।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা একবিন্দুও হ্রাস হয় নি। বরঞ্চ তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে ভিন্ন পথে দাঁড়িয়েও মহাত্মা গান্ধীকে তিনি যে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন···জগতের বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে ভাবে মহাত্মা গান্ধীকে উপস্থাপিত করেছেন, প্রত্যেক রাজনৈতিক তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

বিশেষ করে, একথা এখানে উত্থাপন করলাম, কারণ, এই দুর্ভাগ্য দেশে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্ব্বদাই ব্যক্তিগত সংঘর্ষে কলুষিত হয়। এক পক্ষের লোক অপর পক্ষের লোককে চর বলে সন্দেহ করে···প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূলে তারা প্রথমেই দেখতে পায়, কোন গোপন স্বার্থ-সিদ্ধির ইঙ্গিত।

৫৮

যে-নিরুদ্ধ নির্ঝরিণী মহানদীতে পরিণত হবে, সে যত বাধা পায় কঠিন পাষাণের বন্ধনে, ততই ভেতরে ভেতরে পুঞ্জীভূত হতে থাকে তার পাথর-ভেঙ্গে-বেরুবার আবেগ।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী থেকে বিচ্যুত হয়ে, সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন, দেশের তরুণদের মনে ধীরে ধীরে যে-সংগ্রাম-বাসনা জেগে উঠছে তাকে সংগ্রাম-শক্তিতে পরিণত করতে হবে। নিয়মতান্ত্রিকতার বালুচরে যেন যৌবনের সংগ্রাম-শক্তি পথ হারিয়ে না ফেলে। জাতির জাগরণ-লগ্নে যৌবনের কাছেই তার সব চেয়ে কঠোর আবেদন। ভুলও যদি হয়, সে বৃহৎ ভুল করতে পারে একমাত্র যৌবন।

তাই সেই শক্তিকে আত্মসচেতন করবার জন্যে সুভাষচন্দ্র নতুন দল গঠন করলেন, কংগ্রেস ডেমোক্রাটিক পার্টি। স্মরণ করলেন, দীক্ষাগুরু দেশবন্ধুকে। গুরু আজ বিদেহী। তাই তাঁর বিধবা সহধর্ম্মিনীর কাছে আশীর্ব্বাদ চেয়ে পাঠালেন।

স্থির করলেন, নতুন ব্রত, যৌবন-জাগরণ-যজ্ঞ। তার জন্যে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে করবেন পরিভ্রমণ···

কিন্তু তখন পায়ে পুলিস আদালতের ওয়ারেণ্ট বাঁধা। নির্য্যাতিত রাজনৈতিক বন্দী দিবসে পুলিশআইন অমান্য করে শোভাযাত্রা বার করার দরুণ তিনি অভিযুক্ত হয়ে আছেন। পরের বছর জানুয়ারী মাসে বিচারে হলো ন'মাস সশ্রম কারাদণ্ড। আবার ক্ষণিক বিশ্রাম।

৫৯

আলীপুর সেন্ট্রাল জেল। সঙ্গে বহু সহকর্ম্মী, বন্ধু।

বাইরের কাজ বন্ধ।

সুরু হয় অন্তরের নিভৃত সাধনা। কারাগারের কর্ম্ম-বিরতির মধ্যে দেখা দেয়, সেই আত্মগোপনকারী দ্বিতীয় সত্তা। নিভৃতে আবার সুরু হয়, তার সঙ্গে বোঝা-পড়া।

ঘরের মধ্যে এক কোণে পর্দ্দা দিয়ে একটুখানি জায়গা আড়াল করে নেন।

অন্তরের প্রয়োজন। সেখানে পরম-পুরুষের সঙ্গে আলাপ চলে প্রাণ-পুরুষের।

ঘটনার বিপুল-শোভাযাত্রার মধ্যে, কারাকক্ষের ভেতরে পর্দ্দা-ঢাকা সেই একটুখানি জায়গা, নজরেই পড়ে না। ইতিহাসে ওঠে না।

কিন্তু আজ মনে হয়, সেই একটুখানি জায়গা জীবনের অনেকখানি জুড়ে ছিল।

পরিশ্রান্ত পথিক যেমন তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে দিনান্তে ঝর্ণার কাছে ছুটে যায়,

তেমনি কর্ম-ক্লান্ত জীবনের মহা-তৃষ্ণায় এ যেন প্রাণ-উৎসের কাছে ছুটে আসা,

শক্তি-সাধনার নেপথ্য-বিধান।

৬০

হঠাৎ একদিন কারাগারের "পাগলা-ঘন্টি" বেজে উঠলো।

বহুদিন থেকে কারাগারের ভেতরে অবরুদ্ধ বন্দীরা কারাব্যবস্থার নিত্যনব-নির্য্যাতনের প্রতিবাদ করে চলছিল,

এক ইয়ার্ড থেকে আর এক ইয়ার্ডে খবর চলাচল করে। নির্য্যাতনের খবর পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে সব বন্দীদের কাছে গিয়েই পৌছয়। মনে মনে সকলেরই ক্ষোভ জমে উঠতে থাকে।

সুভাষচন্দ্র এবং অন্য সব কংগ্রেসী বন্দীরা যে-ওয়ার্ডে ছিলেন, তার পাশেই "বোমার-ইয়ার্ড"···সেখানে বোমার মামলার আসামীদের রাখা হয়। তখন সেখানে মেছুয়াবাজার বোম্ কেসের আসামীরা ছিলেন।

হঠাৎ একদিন সর্দ্দার বলবন্ত সিং এবং প্রেম সিংকে পাঠান-প্রহরীরা বল-প্রয়োগ করে পাঁচিলের ভেতর ঠেলে নিয়ে যাবার

চেষ্টা করে। তাঁরা প্রতিবাদ করেন। ফলে গণ্ডগোল বেড়ে ওঠে। কারারক্ষী মেজর সোমদত্তের কাছে খবর যেতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

পাগলা-ঘন্টি বেজে উঠলো।

কিন্তু বন্দীরা আজ আর নীরবে অত্যাচার সহ্য করবে না।

সুরু হয়ে গেল, নিরস্ত্র বন্দীদের সঙ্গে সশস্ত্র কারা-প্রহরীদের সংঘর্ষ।

পাশেই ছিল সুভাষচন্দ্রের ওয়ার্ড।

মেজর দত্তের কানে এলো, সেই ওয়ার্ড থেকে আসছে তুমুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনি।

হুকুম করলেন পাঠান-রক্ষীদের গুলি চালাতে।

তারা বন্দুক নামিয়ে বল্লো, লিখিত আদেশ না পেলে তারা বন্দুক চালাবে না।

আবার সেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি।

মেজর দত্ত নিজের দলবল নিয়ে নিজেই সেই ওয়ার্ডে প্রবেশ করলেন, বীরদর্পে।

সামনে পড়লেন, সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন…

যতীন্দ্রমোহনকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হলো…বেপরোয়া চল্লো লাঠি আর বেয়নেট…

সুভাষচন্দ্র আঘাতের পর আঘাতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন।

সেই দুর্বিনীত কয়েদীদের সায়েস্তা করে বিজয়ী সেনাপতির মত মেজর সোম দত্ত নিজের ডেরায় ফিরে গেলেন।

আহত, অচৈতন্য বন্দীদের চিকিৎসার কথা হয়ত তিনি ভুলেই যেতেন যদি না ডাক্তার জে. এম. দাশগুপ্ত তাঁর কাছে উপযাচক হয়ে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার ভার নেবার জন্যে আবেদন করতেন। ডাক্তার দাশগুপ্ত অবশ্য কারাগারের ডাক্তার নন্, কারাবাসী ডাক্তার।

একবার একদল কিশোর-কিশোরীর সামনে এই কাহিনীটী ব'লে তাদের প্রশ্ন করি, মনে কর, এটা কথামালার কোন গল্প। এর "মরাল্" কি হতে পারে, সংক্ষেপে কে বল্‌তে পার?

মনে আছে একটী মেয়ে বলেছিল,—মেজর সোম দত্তও একজন বাঙালী।

৬১

কলকাতা করপোরেশনের মেয়রের পদ তখন খালি পড়ে।

যদিও যতীন্দ্রমোহন মেয়র নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু বাংলা সরকার তাঁকে মেয়রের গদীতে কায়েমী হয়ে বসবার আগেই কারাগারে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন।

নিয়ম-মত ছ'মাসের মধ্যে মেয়রের শপথ না গ্রহণ করলে, মেয়র-ত্ব থাকে না।

ছ'মাস তো জেলেই কেটে গেল।

তখন দেশবাসী এই পৌর-সম্মানের জন্যে সুভাষচন্দ্রের নাম উত্থাপন করলো।

যথারীতি তিনি মহানগরীর প্রথম নাগরিকের আসন পেলেন। কিন্তু বসতে পেলেন না।

কারণ তিনিও তখন কারাগারে রাজ-অতিথি। হলেনই বা লর্ড-মেয়র।

বিসদৃশতাই পরাধীনতার অঙ্গ-ভূষণ।

৬২

জেল থেকে মুক্ত হয়েই সুভাষচন্দ্র বেরুলেন বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করতে।

উত্তর-বঙ্গ।

কিন্তু বাধা পেলেন মালদহ স্টেশনে।

আমনুরা স্টেশনে পুলিশের লোক গাড়ীতে এসে জানালো, মালদহে ঢুকতে পারবেন না। ১৪৪ ধারা।

পুলিশের লোক তাদের কাজ করে চলে গেল।

সুভাষচন্দ্র মালদহে এলেন···

কিন্তু প্রবেশ করবার সময় বন্দী হলেন।

এবার মাত্র সাতদিনের বিশ্রাম।

১৪৪ ধারার মর্য্যাদা তো রক্ষা হলো।

৬৩

দেখতে দেখতে এসে গেল ২৬শে জানুয়ারী (১৯৩১)। স্বাধীনতা-দিবস।

এক বছর আগে এই দিনে জাতি শপথ গ্রহণ করেছিল, পূর্ণ-স্বাধীনতার।

এক বছর পরে সেই তারিখ স্মরণ করিয়ে দেয়, সে-প্রতিজ্ঞা এখনো শুধু মুখের কথা, এখনও শুধু কাগজে-কলমে প্রস্তাব।

শহরে তখনো শোভাযাত্রা, সভা-সমিতি নিষিদ্ধ।

সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন, গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের তলায় শোভা-যাত্রা করে গিয়ে যথারীতি সে-শপথ গ্রহণ করবেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ শপথ। অন্য লোকের কাছে যা মাত্র বাইরের অনুষ্ঠান, তাঁর কাছে জীবনের মহা-মন্ত্র।

সকালবেলা পুলিশের তরফ থেকে একজন বড় অফিসর তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন।

পুলিশ কমিশনারের অনুরোধ বহন করে তিনি এসেছেন, সুভাষচন্দ্র যেন শোভাযাত্রা নিয়ে না বেরুন।

হেসে তিনি জানিয়ে দেন, আপনার কর্ত্তাকে বলবেন, আমার যা কর্ত্তব্য আমি তা করবো। তাঁর যা কর্ত্তব্য তিনি যেন তাই করেন।

নগ্নপদে শোভাযাত্রার পুরোভাগে যখন চৌরঙ্গীর মোড়ের কাছে এলেন, তখন পুলিশ তাদের কর্ত্তব্য সুরু করলো।

তাঁর হাত থেকে জোর করে পতাকা কেড়ে নিতে এলো। জাতীয় পতাকা। জীবন দিয়ে দিতে হবে তার মর্য্যাদা।

ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পাঁচজায়গায় গুরুতরভাবে আহত হলেন।

সেই আহত-অবস্থায় হাজতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো।

পুরোদিনটাই তাঁকে, সেই অবস্থায় "ফেলে রেখে" দেওয়া হলো।

পরের দিন আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে জানালেন, অসহযোগী হিসেবে আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাই না বা এই আদালতের বিচারে কোন অংশই গ্রহণ করতে চাই না। তবে শুধু আপনাকে এই কথাটা জানাতে চাই, লালবাজার হাজতে বন্দীদের প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে, তাকে জঘন্য এবং লজ্জাকর বল্লে কিছুই বলা হয় না।

আইনমাফিকভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট উত্তরে জানালেন, আপনার বক্তব্য লিখে আবেদন করুন।

—আহত হাত লিখতে পারে না।

তাঁর হাতে তখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

বিচার হয়ে গেল···আবার নমাস সশ্রম কারাদণ্ড।

জীবনের পথ কারা-কণ্টকে ভরা।

৬৪

সামান্য এক মুঠো লবণ···

কে জানতো তার মধ্যে আছে সঞ্জীবন-মন্ত্র ?

এক বছর আগে একদা এক মঙ্গল-প্রভাতে সবরমতী আশ্রম থেকে এক শীর্ণদেহ বৃদ্ধ ক্ষীণ যষ্টির ওপর ভর দিয়ে যাত্রা করেছিল, পায়ে হেঁটে আড়াই শো ·মাইল দূরে ডাণ্ডির সমুদ্র-উপকূলের দিকে···

ডাণ্ডির সমুদ্র-উপকূলে গিয়ে সমুদ্রের লোণা জল থেকে নিজের প্রয়োজন মত লবণ তৈরী করে নিতে···

আড়াই শো মাইল পায়ে হেঁটে নুন তৈরী করতে, যার দাম এক পয়সাও নয়।

জগৎশুদ্ধ লোক হেসে উঠলো···কোথায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর কোথায় একটুখানি নুন !

অতি-সতর্ক শাসকেরাও উন্মাদের খেয়ালে বাধা দেওয়া প্রয়োজনই বোধ করলো না।

এক মুঠো লবণ....

কিন্তু সেই বদ্ধ-মুষ্টি দেখতে দেখতে মহাকালের উদ্যত বজ্রের মত শাসক-সম্প্রদায়ের মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়লো···

সত্যাগ্রহীর বদ্ধ-মুষ্টি···

পুলিশের লাঠি, সৈনিকের বেয়নেট মুষ্টি-বদ্ধ হাতকে চূর্ণ করে দিল কিন্তু বদ্ধ-মুষ্টিকে খুলতে পারলো না···

যে-আন্দোলন ছিল শহরে···নাগরিকদের মধ্যে আবদ্ধ··উন্মাদ তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে এলো, গ্রামে···গ্রামবাসীদের মধ্যে···যা ছিল গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, দেখতে দেখতে তা ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে···

ভারতের হৃদ্‌-পিণ্ডে এসে লাগলো বেদনার অঙ্কুশ···প্রত্যক্ষ-ভাবে···

কারাযাত্রীতে ভরে উঠলো কারাগার···

অবশেষে একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে, সুষুপ্ত পাণ্ডবশিবিরে অশ্বত্থামার মতন, চারিদিকে সুষুপ্ত জগৎ, অতি সন্তর্পণে পুলিশের দল করাদি শিবিরে এসে উপস্থিত হলো।

করাদি শিবিরে সত্যাগ্রহের ঋষি তখন নিদ্রামগ্ন।

সেই মধ্যরাত্রিতে ঘুম থেকে তাঁকে টেনে তোলা হল।

সেই অবস্থায় রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেই অনির্দ্দিষ্ট কালের মত তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হলো।

বন্দী·কর্ত্তারা ভেবেছিলেন, যাঁর জন্যে এই আন্দোলন, তাঁকে বন্দী করলেই বুঝি আন্দোলন থেমে যাবে। এই ছিল তাঁদের হিসাব।

কিন্তু এক আর দুয়ের হিসেবে কেমন করে ভুল হয়ে গেল।

মহাকালের বীজ-গণিতে সব সময় এক সূত্রে একই ফলোদয় হয় না।

বেতালের হেঁয়ালীর মত, তাই বন্ধন-থেকেই জাগে বন্ধন-মোচন-মন্ত্র। নিষ্পেষণ আনে নব-তেজ ঃ অবরুদ্ধ-কণ্ঠের মৌনতাই যুক্তির বিজয়দুন্দুভি।

মহাত্মাজীর অবরোধের সঙ্গে সঙ্গে তীব্রতম হয়ে উঠলো আইন-অমান্য আন্দোলন।

কারাগারে আর স্থান ধরে না।

টলমল করে উঠেছে দুই তীর···বুঝি আসে বন্যা···

এমন সময় লর্ড আরউইন কারাগারে বন্দীর কাছে পাঠালেন দূত···

আপোষ-মীমাংসার জন্যে...

সত্যাগ্রহী তাঁর আদর্শ-অনুযায়ী প্রতিপক্ষের আন্তরিকতাকে স্বীকার করে নিলেন।

সহসা একদিন সুভাষচন্দ্র দেখলেন, নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের আগেই তিনি ছুটি পেয়ে গিয়েছেন···মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে লর্ড আরউইনের চুক্তি হয়ে গিয়েছে···সেই চুক্তির ফলে আইন-অমান্যকারী সব বন্দীই আজ মুক্ত।

৬৫

কিন্তু যখন জানলেন, আইন-অমান্য-আন্দোলন প্রত্যাহার করার মূল্যে তাঁদের মুক্তি কিনতে হয়েছে, সুভাষচন্দ্র সেই চুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। সমগ্র দেশ যখন সংগ্রামের জন্যে একমুখী হয়ে উঠেছে, তখন আন্দোলনকে থামিয়ে দেওয়া মানে, পেছনে হাঁটা। চিরাচরিত সংগ্রামের রীতির বিরুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত সংগ্রামের রীতিকে অস্বীকার করেই মহাত্মাজী নতুন সংগ্রামের নতুন আক্রমণ-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

যদিও সে নতুন পদ্ধতি ইতিহাস অনুমোদন করে না।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তার জন্যে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ নন্। ইতিহাস তিনি রচনা করবেন।

দুই বিরুদ্ধ কর্ম্ম-পন্থার বিরোধিতা একটু একটু করে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। সুভাষচন্দ্র ইতিহাসকে অস্বীকার করতে পারলেন না।

মনের মধ্যে যে জিনিসের স্বীকৃতি নেই, বাইরে তাকে মেনে চলা, যে কোন কারণেই হোক্, আত্ম-প্রবঞ্চনা।

সে আত্ম-প্রবঞ্চনা কোন বিপ্লবীই প্রশ্রয় দিতে পারে না।

সুভাষচন্দ্র বিপ্লব-রীতির আদর্শ সামনে রেখে চুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন।

৬৬

করাচী কংগ্রেস।

বাংলা থেকে সুভাষচন্দ্র চলেছেন, প্রকাশ্য কংগ্রেসে এই চুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। যদি মহাত্মা গান্ধী ভুল করে থাকেন, গান্ধীজী করেছেন বলে, দেশ তা মেনে নিতে বাধ্য নয়। ব্যক্তিত্বের আওতায় পরিবর্দ্ধিত আন্দোলনকে, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখাই, এ যুগের বৈজ্ঞানিক বিপ্লববাদের শিক্ষা।

দীর্ঘ পথ, দুদিন, তিন রাত্রি।

ট্রেণে সহযাত্রী বন্ধুরাও আছেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর, হঠাৎ সহযাত্রীরা দেখেন, সুভাষচন্দ্র নিজে সকলের বাসন-পত্র নিয়ে ধুতে চলেছেন।

তাঁরা কুণ্ঠিত হয়ে বাধা দেন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র সে-বাধা কিছুতেই শুনলেন না।

সারা পথ, প্রত্যেকবার খাওয়া-দাওয়ার পর, তিনিই বাসন মাজেন, ধুয়ে ঠিক করে তুলে রাখেন।

সামান্য ব্যাপার…কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে বন্ধুরা বুঝতে পারেন, সুভাষ তাঁদের বহু উপরে উঠে গেলেও, তাঁদের গা ঘেঁসেই আছেন।

আজাদ্ হিন্দের সিপাহ্ সালারকে তাই সামান্য সৈনিকও জানতো তার বন্ধু বলে।

৬৭

যেদিন করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো, সেই দিনই পাঞ্জাবের এক কারাগারে ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইতে গাইতে তিনজন যুবক তাদের উন্মাদ দেশ-প্রেমের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল।

ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি তাদের জন্যে নয়।

প্রকাশ্য কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সেই চুক্তিকে আত্মঘাতী অপরাধ বলে ঘোষণা করলেন।

কংগ্রেস-সভার পাশেই বসলো নও-জোয়ান কংগ্রেস। সভাপতি, সুভাষচন্দ্র।

যৌবনের রাজটীকা রক্ত-চন্দনের মত ললাটে লেপন করে দিল তরুণ-তরুণীরা।

হে যৌবন, তোমারই একমাত্র অধিকার, দিবালোকে দুরন্ত দুঃসাহসের স্বপ্ন দেখার। হে মহা-অনিয়ম, তুমিই একমাত্র সব যুক্তির উর্দ্ধে।

করাচী মিউনিসিপ্যালিটী কলকাতার লর্ড মেয়র বলে তাঁকে অভিনন্দন জানালো।

উত্তরে ম্লান তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, পরাধীন দেশে কেউ লর্ড নয়…সবাই ক্রীতদাস।

করাচী থেকে ফিরলেন, যৌবনের অধিনায়কত্বের কণ্টক-মুকুট মাথায় নিয়ে…

৬৮

হঠাৎ এই সময়, অহিংস-আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকদের "মহাত্মা

গান্ধীকি জয়ে"র শব্দকে ছাপিয়ে বাংলা দেশে, টেরারিষ্টদের হাতের রিভলভারের আওয়াজ আবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো···

কলকাতার পথে অফিস-ফেরৎ কেরাণীর দল একদিন দেখলো দেয়ালে এক অদ্ভুত হ্যাণ্ডবিল কারা মেরে রেখেছে···ইংরেজী ভাষায়···:

"Congress Terrorism must be crushed.

Bengal Outrages

MURDERED !!!

Lowman, Simpson, Peddie,

Mukherjee, Garlik, Ashanullah.

Wounded !!!

Hotson, Nelson, Cassels.

Donavan sent home for safety.

Yesterday – Durno.

This morning—Villiers.

We want action. Royalists."

এই "কংগ্রেস-টেরারিজম্"কে সমূলে উচ্ছেদ করবার জন্যে বাংলা সরকার অর্ডিন্যান্স আবিষ্কার করলো···

সুভাষচন্দ্র বল্লেন, এ আইন নয়, বে-আইনী আইন।

এই ব্রহ্মাস্ত্র হাতে পেয়ে পুলিশের রুদ্ররূপ রুদ্রতম হয়ে উঠলো...

আঠাশে অক্টোবর ঢাকায় জনসন রোডের ওপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডুর্ণো গোপন আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন···

তার উত্তরে পুলিশ এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করলো যে সমগ্র ঢাকা শহর আর্ত্তনাদ করে উঠলো···

এই অনাচারের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র রুখে দাঁড়ালেন। একজন অপরাধীর জন্যে শত শত নিরপরাধ কেন লাঞ্ছিত হবে?

পুলিশের অনাচারের নানা রকম ভয়াবহ সংবাদ কলকাতায় আসতে লাগলো। সে সব সত্য না মিথ্যা, সে-সম্বন্ধে একটা নিরপেক্ষ তদারক হওয়া দরকার।

কলকাতার জনসাধারণ এক বিরাট সভায় এই তদন্তের ভার সুভাষচন্দ্রের ওপর দিল।

সুভাষচন্দ্র ঢাকায় চল্লেন।

ষ্টিমার নারায়ণগঞ্জের ঘাটে এসে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার পুলিসের কর্ত্তা এলিসন সাহেব তাঁর কামরায় এসে উপস্থিত হলেন।

—আপনি নামতে পারবেন না···ফিরে যাবার ষ্টিমার দাঁড়িয়ে রয়েছে···সেই ষ্টিমারে আপনাকে ফিরে যেতে হবে!

নদীকে উৎস-মুখে ফিরে যাবার আদেশ!

সুভাষচন্দ্র সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে তীরে নামলেন।

কিন্তু পুলিশ তাঁকে এগুতে দিল না। থানায় ধরে নিয়ে গেল।

—ওয়েল্ সুভাষ!

সাহেব মুরুব্বিয়ানা করে নাম ধরেই সম্বোধন করেন। সাহেব তাঁকে ঢাকাতে যেতে দেবেন না, তিনি যাবেনই। সুরু হয় বাদা-নুবাদ! সাহেব কিন্তু মনের আনন্দে নাম ধরেই কথাবার্ত্তা চালান্।

কিছুক্ষণ সহ্য করার পর হঠাৎ সুভাষচন্দ্র বলে উঠলেন, মিঃ এলিসন্, ভদ্ররীতি অনুসারে আমি আপনাকে যেভাবে সম্বোধন করছি, আপনারও উচিত আমাকে সেই ভাবে সম্বোধন করা···সুভাষ নয়···বলুন মিঃ বোস্···কিম্বা সুভাষবাবু···যা আপনার রুচি!

সাহেব থতমত খেয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

৬৯

অনুনয়-বিনয়, তর্ক-বিতর্ক, কোনতেই কিছু হলো না। বন্দী না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কোন কারণেই তাঁর গন্তব্য থেকে এক ইঞ্চি সরবেন না। ঢাকা তাঁকে যেতে হবেই।

নিরুপায় হয়ে মিঃ এলিসন একটা ফন্দী স্থির করলেন।

বন্দী করে সুভাষচন্দ্রকে ষ্টিমারে তুল্লেন।

পরের স্টেশন কমলঘাটে এসে ষ্টিমার এক মিনিটের জন্যে দাঁড়ালো।

তাড়াতাড়ি একটা তক্তা ফেলা হলো। মিঃ এলিসন মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই তক্তা দিয়ে নেমে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তক্তা সরিয়ে নিয়ে ষ্টিমার ছেড়ে দিল!

সুভাষচন্দ্র নামবার সুযোগই পেলেন না।

মিঃ এলিসন নিশ্চিন্ত মনে স্থলপথে ফিরে গেলেন।

ষ্টিমার নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য চাঁদপুরের দিকে চল্লো।

ডেকে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত সুভাষচন্দ্র ঘুরে বেড়ান।

চাঁদপুরে নেমেই তিনি আবার ঢাকা যাবার জন্যে অন্য পথ ধরলেন।

তেজগাঁও স্টেশনে পুলিশ তাঁর পথ আটক করে দাঁড়ালো।

স্টেশন মাষ্টারের কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বন্দী করে রাখা হলো। তিন দিন সেখানে অবরুদ্ধ থাকার পর ছাড়া পেলেন।

এবং ছাড়া পেয়েই ঢাকাতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

৭০

বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে মহাত্মা গান্ধী উনিশ শো একত্রিশ সালের শেষের দিকে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন।

সুভাষচন্দ্র বোম্বেতে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যাত্রা করলেন।

উদ্দেশ্য, সক্রিয় সংগ্রামের নেতৃত্ব করবার জন্যে তাঁকে আহ্বান।

আপোষ-নিষ্পত্তির পথে বহুদিন কংগ্রেস বিচরণ করেছে—আজ তাকে অবিচ্ছেদ সংগ্রামে নামতে হবে—এই তাঁর বিশ্বাস।

তারই জন্যে প্রকাশ্যে মহাত্মাজীর সঙ্গে বিরোধিতাকেও তিনি বরণ করে নিয়েছেন। তবে অন্তরের অন্তরতম স্থলে, তখনও ছিল এই চরম আশা, যদি এই সংগ্রাম-পন্থাই অবলম্বন করতে হয়, মহাত্মা গান্ধীই হবেন তার অধিনায়ক।

কিন্তু মহাত্মাজী সেবারেও তাঁর আবেদনে সায় দিলেন না।

ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে বম্বে থেকে যখন ফিরছেন, তখন কল্যাণ ষ্টেশনে পুলিশ এসে তাঁকে রেগুলেশন থ্রি-তে অবরুদ্ধ করে নিয়ে গেল।

আবার কারাগার।

মধ্যপ্রদেশের সিউনী কারাগার।

সেখানে কয়েক মাসের মধ্যেই স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়লো।

মান্দালয় জেলের পর থেকে ভগ্ন-স্বাস্থ্যকেই তিনি বহন করে চলেছিলেন। কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে যাকে জোর করে অস্বীকার করে চলেছিলেন, কারাগারের বাধ্যতামূলক অবকাশের মধ্যে সে আত্মপ্রকাশ করে উঠলো। ক্ষয়িষ্ণু ব্যাধি তার প্রাপ্য দাবী করলো। সুপুষ্ট দেহ শীর্ণ হয়ে এলো।

তাড়াতাড়ি তাঁকে ভাওয়ালী স্বাস্থ্যনিবাসে স্থানান্তরিত করা হলো।

কিন্তু সেখানেও বিশেষ কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না। তখন লক্ষ্ণৌর বলরামপুর হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে আসা হলো।

জীর্ণ পোড়ো বাড়ীর মত শরীর তখন থাকের পর থাক ভেঙ্গে পড়ছে।

ডাক্তারেরা হতাশ হয়ে জানালেন, য়ুরোপের কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে বাস করা ছাড়া রোগ-মুক্তির সম্ভাবনা নেই।

গভর্ণমেণ্ট চিকিৎসার জন্যে য়ুরোপে যাবার অনুমতি দিলেন। দুরন্ত লোক দেশের বাইরেই ভাল।

ভগ্ন-স্বাস্থ্য জীর্ণ-দেহ নিয়ে ভারতের তীর থেকে বিদায় নিলেন।

বন্ধুরা মৃত্যুর আশঙ্কায় মৌন-বিষাদে বিদায় দিলেন।

বন্ধুদের অন্তরের সংগোপন-বেদনার কথা বুঝতে পেরেই, বিদায়-মুখে বলে গেলেন,

If Bengal dies, who will live? If Bengal lives, who will die?

এ অমর উক্তির অনুবাদ হয় না।

উক্তি নয়···একটা সমগ্র জাতির হৃদ-স্পন্দন···

৭১

সারা জীবনের সংগ্রামের পর, এক বৃদ্ধ, তখন নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে ভিয়েনায় অবস্থান করছিলেন···শুভ্রকেশ···অশীতি-পর বৃদ্ধ···কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত সংগ্রাম-স্পৃহা এতটুকু শিথিল হয় নি...

সর্দ্দার বিঠলভাই প্যাটেল।

ভারতবর্ষ ত্যাগ করে, সেই জীর্ণ ভগ্ন দেহ নিয়েই ঝড়ের মত তিনি সারা আমেরিকা ঘুরে বেড়ালেন। উদ্দেশ্য, জগতের শ্রেষ্ঠশক্তিশালী তরুণতম জাতির অন্তরে হৃতশক্তি প্রাচীনতম ভারতের জন্য সহানুভূতিকে জাগানো। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের দাবীকে উপস্থিত করা। তিন মাসের মধ্যে আশীটি বিভিন্ন সভায় আশীটি বক্তৃতা দিলেন।

জীর্ণদেহ সেই অতিরিক্ত-ভার আর বহন করতে পারলো না।

চিকিৎসার জন্যে এলেন ভিয়েনা শহরে, আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক-নগরীতে।

ভাগ্যক্রমে তেমনি ক্ষত-বিক্ষত, ভগ্ন-দেহ সুভাষচন্দ্রও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দুই আহত সৈনিক।

অস্তাচল-যাত্রী বন্ধুর মত, পুত্রের মত, পাশে ডেকে নিলেন নব-উদিতকে।

তরুণ পার্শ্বচরের মধ্যে বৃদ্ধ দেখলেন, তাঁর জাতির ভবিষ্যৎ আশা ...আগামী সংগ্রামের অধিনায়ক।

বিদায়োন্মুখ বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদের মধ্যে সংগ্রাম-ক্ষত-বিক্ষত তরুণ পেলো, নব-সংগ্রামের প্রেরণা।

ভারতবর্ষ থেকে দূরে, ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে, তাঁরা দুইজনেই স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন, মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও, আজ ভারতের প্রয়োজন,

রাজনীতিক্ষেত্রে নতুন অধিনায়কত্ব।

রাজনৈতিক প্রয়োজনের বহু উর্দ্ধে মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শবাদ।

প্রতিদিনের জাগতিক প্রয়োজনে, কূটবুদ্ধি বৃটীশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নতুন রণ-নীতির প্রয়োজন। যে-নীতির পেছনে অন্তরের সম্মতি নেই, সে-নীতি মহাত্মা গান্ধী অনুসরণ করতে পারেন না, কোন কিছুর জন্যেই নয়। সুতরাং আজ কংগ্রেসের অধিনায়কত্ব, নতুন নেতার দাবী করে। এই মর্ম্মে তাঁদের যুক্ত-স্বাক্ষরে এলো এক আবেদন ভারতবর্ষে।

অসম্ভব বলে সে-আবেদনকে ভারতবর্ষ বিশেষ কোন মূল্য দিল না।

৭২

স্বদেশ, স্বজন থেকে দূরে, ক্রমশ বৃদ্ধ সেনাপতির মর্ত্ত্যবাস ফুরিয়ে এলো।

যে-সিংহের গর্জ্জনে অরণ্য কেঁপে উঠতো, থেমে গেল তার সে কম্বু-কণ্ঠ।

শেষ ক'দিন সুভাষচন্দ্র পাশে থেকে, পুত্রের মত, তাঁর সেবা করলেন।

তাঁর কোলেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো গুর্জ্জর-সিংহ।

মৃত্যুর পর তাঁর উইল খুলে দেখা গেল, তাঁর মানসিক সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর জাগতিক সম্পদের পরিবেশন ও পরিরক্ষণভার দিয়ে গিয়েছেন, সুভাষচন্দ্রের ওপর।

—যে-আদর্শ আমি সফল করে তুলতে পারলাম না, তোমারই ওপর দিয়ে গেলাম তাকে সম্পূর্ণ করবার ভার।

জাতির তরুণদের কাছে বিপ্লবীর শেষ উইল···তরুণদের প্রতিনিধি স্বরূপ সুভাষচন্দ্র নিলেন তার ভার।

১৩

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রদোষালোকের য়ুরোপ।

প্রেতমূর্ত্তির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে মৃত্যুর অগ্রদূতেরা।

তারি মধ্যে নিভৃতে চলেছে শব-সাধনা।

উঠছে হুংকার কাল-ভৈরবের।

উৎকর্ণ হয়ে শোনে প্রবাসী বিপ্লবী।

কাণে আসে প্রলয়ের মেঘের গর্জ্জন।

বিশ্ব-ব্যাপী আসন্ন প্রলয়।

কোন দেশই বেড়া দিয়ে তাকে আটক করে রাখতে পারবে না।

এই মহালগ্ন।

সেই মহাতাণ্ডবে যোগদান করে, মৃত্যুর সাগর-তল থেকে নিয়ে আসতে হবে মুক্তির মুক্তা।

ঝড়ো হাওয়ার ভরে ওঠে মন।

প্রবাসী ফিরে ফিরে চায় স্বদেশের দিকে।

যে-ঝড় এগিয়ে আসছে, সে যেন অতর্কিতে নিশীথ-নিদ্রার মধ্যে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে না যায়···

জাগ্রতভাবে ভারতবর্ষকে এই আসন্ন প্রলয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে...আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির আবর্ত্তে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নিতে হবে তার ষোল-আনা সুযোগ। স্বদেশের মুক্তি-আন্দোলনকে স্বদেশের ভূগোলের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে আর চলবে না। তাই সর্ব্ব-মন-প্রাণ দিয়ে মহা-আবর্ত্তের লীলাভূমি য়ুরোপের অন্তরকে বুঝতে চেষ্টা করে বিপ্লবী।

সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে দেখা করলেন য়ুরোপের ঋষি রোমাঁ রলাঁ্যার সঙ্গে।

রোঁমা রলাঁ্যা যিনি তাঁর অপরূপ সাধন-দৃষ্টি দিয়ে শাশ্বত ভারতের অন্তরের সঙ্গে পশ্চিম-জগতের পরিচয় করিয়ে দিতে ব্রতী হয়েছিলেন···যিনি দেখেছিলেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবের মধ্যে এই শতাব্দীর সর্ব্বোত্তম সম্ভাবনা···আদর্শের জগতে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী সতীর্থ···সুভাষচন্দ্র তাঁর অন্তরের দ্বন্দ্ব নিয়ে উপস্থিত হলেন তাঁর কাছে, যেমন যায় লোকে কষ্টি-পাথরের কাছে সোনা যাচাই করে নিতে।

যে-কথা তখন মনের মধ্যে সব চেয়ে বেশী আলোড়ন তুলেছে, সুভাষচন্দ্র আলোচনার মধ্যে সেই কথা উত্থাপন করেন।

—আজ যদি ভারতবর্ষে গান্ধী-প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ-আন্দোলনকে প্রত্যাহার করে' নতুন কোন সংগ্রাম-নীতি প্রবর্ত্তন করা হয়?

ম্লান বিষণ্ণকণ্ঠে রলাঁ্যা উত্তর দেন, যদি গান্ধীর প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ভারতের স্বাধীনতা লাভ করা না যায়, তার চেয়ে দুঃখের আর কিছু হতে পারে না। তাঁর এই সত্যাগ্রহের ফলাফলের দিকে সমগ্র জগৎ চেয়ে আছে···এবং শুধু চেয়ে আছে নয়, সকলের মনে তিনি একটা নতুন আশা এনে দিয়েছেন।

সুভাষচন্দ্র বলেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রকৃত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখছি, এই সুবিধাবাদী জগতে গান্ধীজির নীতি অতি দুর্ল্ভ উচ্চস্তরে বিচরণ করছে। তা ছাড়া রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি প্রতিপক্ষের সঙ্গে যে সহজ আন্তরিকতা দেখান, তা অনেকক্ষেত্রে সুবিধাবাদী প্রতিপক্ষ নিজেদের সুবিধাতেই প্রয়োগ করে। অন্যদিকে আমরা দেখছি, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে যে-সব অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে, তা সত্ত্বেও, বৃটীশ-সরকার তাদের জাগতিক শক্তির জোরে, আমরা না চাইলেও, ভারতবর্ষে জোর করে থেকে যাচ্ছে ও যাবে। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, যদি সত্যাগ্রহ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়, আপনি কি চান না যে আমরা অন্য কোন উপায়ে দেশের স্বাধীনতা আনবার চেষ্টা করবো, না, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সেক্ষেত্রে আপনি উদাসীন হয়ে থাকবেন?

অতি স্পষ্ট প্রশ্ন।

রলাঁ স্পষ্টভাবেই উত্তর দেন, নিশ্চয়ই, সেক্ষেত্রে যে কোন উপায়েই হোক্, স্বাধীনতার সংগ্রাম চলবেই!

আশ্বস্ত হয়ে সুভাষচন্দ্র য়ুরোপের নির্ব্বাসিত ঋষির কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

৭৪

এ-ধারে ভারতবর্ষে তখন বৃদ্ধ পিতা অন্তিমশয্যায় শায়িত।

প্রিয়-পুত্রের শেষ মুখদর্শনের জন্য পিতার অন্তর ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

পিতার হয়ে জননী ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানান পিতার শেষ-শয্যার পাশে পুত্র যাতে আসতে পারে, তার অনুমতির জন্য।

ভারত সরকার সে-অনুমতি দিতে অপারগ।

মাতা পুত্রকে সংবাদ পাঠালেন।

ভিয়েনার বৃটিশ কন্‌সালের কাছে সুভাষচন্দ্র মাতার টেলিগ্রাম নিয়ে উপস্থিত হলেন।

বৃটিশ-কন্‌সাল প্রয়োজনীয় ছাড়-পত্র দিলেন।

তৎক্ষণাৎ বিমান-পথে যাত্রা করে তিনি করাচীতে এসে নামলেন। বিমান থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই জামসেদ্‌জী মেহটা জানালেন, সব শেষ···

শেষ মুহূর্ত্তে প্রিয় পুত্রের মুখ-দর্শন করতে পান নি জানকীনাথ।

অর্কিডের ফুলের মত বিপ্লবীদের জীবন···মাটীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। বিপ্লবী কারুর পুত্রও নয়, কারুর পিতাও নয়। সংসারের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না তার জন্যে নয়।

কিন্তু করাচী এরোড্রোমে পুলিশের লোক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অবশ্য তখন অন্য চিন্তা। য়ুরোপ থেকে পুঁটলী করে ভয়ঙ্কর কোন জিনিস না সুভাষচন্দ্র এনে ফেলেন।

তৎক্ষণাৎ তন্নতন্ন করে তারা বাক্স-প্যাটরা সব অনুসন্ধান করে।

বোমা নয়, রিভলভার নয়, পাওয়া গেল টাইপ-করা কতকগুলি পাতা, প্রবাসে সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনের যে কাহিনী রচনা করছিলেন ···তারই অসম্পূর্ণ অংশ।

নিষিদ্ধ মারাত্মক দ্রব্য হিসাবে সেই লেখা পাতাগুলি পুলিশ তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল।

রিক্ত-ভার এলেন দম্-দম্ এরোড্রোমে।

করাচীতে যে-টুকু বাকি ছিল, দমদমে তা সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল।

বাংলার মাটীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের লোক তাঁকে গ্রেফতার করলো। ভূতপূর্ব্ব আঠারো শো আঠারো শালের সেই চিরসতেজ তিন ধারা। তবে বাংলা সরকার দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে কারাগারে আর নিয়ে গেলেন না। পিতৃ-শ্রাদ্ধের জন্যে বন্দী অবস্থায় এলগিন রোডের বাড়ীতেই তাঁকে থাকতে হবে। বাইরের কোন লোকের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা, দেখা-সাক্ষাৎ কিছুই করতে পারবেন না।

একমাস অশৌচ অবস্থা, বাড়ীতে বন্দী-দশায় কাটলো। মাসান্তে বন্দী অবরুদ্ধ কণ্ঠে পিতার এবং পিতৃ-পুরুষের কাছে, জগতের কল্যাণে মধু-মন্ত্র উচ্চারণ করে' প্রস্তুত হলেন রেগুলেশন থ্রি-র মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে।

আবার ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে হবে...কতদিনের জন্যে কে জানে?

বন্দীর মনে ছায়া দীর্ঘতর হয়ে ওঠে। জীবন যত অগ্রসর হয়ে চলে, বন্দীশালার প্রাচীরও তত ব্যাপক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে।

জীবন কি শুধু এক কারাগার থেকে আর এক কারাগারে যাওয়া-আসা?

বর্ত্তমান জগতের নির্য্যাতিত স্বদেশ-প্রেমিকদের জীবনী পড়তে পড়তে, বারে বারে এই প্রশ্ন মহা-জিজ্ঞাসার মত জেগে ওঠে, এ কি অসম্ভব দুরাশা, যে একদিন এই মানুষের পৃথিবী এমনি সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, যেদিন নিজের জন্মভূমিকে ভালবাসার দরুণ মানুষকে আর শৃঙ্খলিত হতে হবে না, যেদিন সভ্য মানুষ পেছন দিকে ফিরে চেয়ে, এই সব অবরুদ্ধ জীবনের নিষ্পেষিত ফুল-দলের দিকে চেয়ে, দুঃসহ লজ্জায় নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠবে, একদিন মানুষ কি সত্যই এমনি বর্ব্বর ছিল?

মহাকাল, মানুষের বহু কৌতূহলী জিজ্ঞাসার কোন উত্তরই

তুমি আজও পর্য্যন্ত দাও নি…এ প্রশ্নও কি তেমনি চিরকাল অনুত্তরিত থাকবে?

৭৫

ভিয়েনায় পৌঁছিয়ে চিকিৎসকদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেন।

যে-ধারা অনুযায়ী চিকিৎসা হচ্ছিল, তার শেষ প্রক্রিয়া হচ্ছে, অপারেশন। তার জন্যে রোগীর দেহকে প্রস্তুত করে আনতে হয়।

সেই বাধ্যতামূলক অবসরের মধ্যে রোগী অসমাপ্ত জীবনী রচনাকে শেষ করেন। তার নাম দিলেন, The Indian Struggle …আত্মচরিত বটে কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত হাসি-অশ্রুর কোন চিহ্ন নেই….

আমি নয়…আমার দেশ…

জীবন মানে এখানে শুধু সংগ্রাম।

প্রবাসী হয়ত ভেবেছিলেন, সেই আত্মচরিতের মধ্যে দিয়ে স্বদেশবাসীর কাছে পৌঁছবেন…কিন্তু তাঁর মত তাঁর পুস্তকও নিষিদ্ধ হলো…ভারতবর্ষের মাটী সে ছুঁতে পারবে না।

কায়ার সঙ্গে সঙ্গে ছায়াও অবরুদ্ধ।

৭৬

সুভাষচন্দ্র দেখলেন, স্বাধীন য়ুরোপেও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার অধিকার তাঁর নেই।

রাশিয়ায় প্রবেশ করতে পারবেন না।

আমেরিকাতেও না।

ইংলণ্ডে প্রবাসী ভারতীয়রা এক সভা আহ্বান করলো। সুভাষ-চন্দ্র সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন।

কিন্তু বৃটীশ-সরকার তাঁকে ইংলণ্ডে পদার্পণ করতে দিলেন না।

অগত্যা তাঁর অভিভাষণ লিখে পাঠিয়ে দিলেন।

তাঁর হয়ে একজন তা পড়ে দিল।

রোমে এশিয়ার ছাত্ররা এক সভায় সমবেত হয়ে সুভাষচন্দ্রকে আহ্বান করলেন।

স্বয়ং মুসোলিনী এই সভার উদ্বোধন করলেন।

আয়ারল্যাণ্ডে গিয়ে ডি ভ্যালেরার সঙ্গে দেখা করলেন। পরম-সমাদরে ডি ভ্যালেরা তাঁকে গ্রহণ করলেন।

যেখানেই যান, দেখেন উদ্যত-জটা-জাল মহাকাল যোগ-নিদ্রা পরিহার করে আজ মেতেছেন তাণ্ডবে।

সে-তাণ্ডবের লীলায় কি যোগদান করবে না ভারতবর্ষ ?

ভারতবর্ষ—দিন দিন করে ক্রমশ চলে যায় বৎসরের পর বৎসর।

তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে বিরহ-যন্ত্রণা। মাতৃ-বিরহ-যন্ত্রণা।

ভারতের নদ-নদী, গিরি-পর্ব্বত, তার সূর্য্যাস্ত, সূর্য্যোদয় অহরহ করে আহ্বান।

অষ্ট্রিয়ার সীমান্তে শুভ্র-চূড় আল্‌পসের রূপ-বর্ণনা লিখতে গিয়ে মনে পড়ে যায় ভারতের যোগ-মূর্ত্তির প্রতীক হিমালয়ের কথা; ব্রিণার আর টিরোলের পার্ব্বত্যপথে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে যায় কাশ্মীরের দুগ্ধ-শুভ্র তুষার-উপত্যকা, সাল্‌জবুর্গ-উৎসবে রঙীন নর-নারীর মেলায় মন আপনা থেকে চলে যায় বাংলার গ্রামে শরতে শারদীয়া পূজার প্রাঙ্গণে···

বিরহী যক্ষের মত মন কেঁদে ওঠে, সাধনার অলকাধাম··· জন্মভূমির পুণ্য-স্পর্শের জন্যে।

এমন সময় এলো সংবাদ, কংগ্রেসের সুবর্ণ-জয়ন্তী-উৎসব···

সম্পূর্ণ হলো সংগ্রামের অর্দ্ধ-শতাব্দী···

লক্ষ্ণৌ শহরে পণ্ডিত জওহরলালের সভাপতিত্বে এপ্রিল মাসে (১৯৩৬) হবে তার ঐতিহাসিক অধিবেশন।

দূর হোক্ প্রবাসের এই স্বচ্ছন্দ বন্দী-জীবন। তার চেয়ে প্রিয়তর স্বদেশের বদ্ধ-কারাগার।

যাত্রা করলেন ভারতের দিকে।

৭৭

বম্বের বন্দরে "কন্টিওয়ার্ড" জাহাজ এসে লাগলো (৮ই এপ্রিল, ১৯৩৬)।

মাটীতে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই এলো কারাগারের আহ্বান·· লৌহবাহু রেগুলেশন থ্রি। যেন সমুদ্রতীরে তাঁরি জন্য এতদিন অপেক্ষায় ছিল।

বন্দর থেকে বম্বের আর্থার রোড থানা।

সেখান থেকে যারবাদা জেল।

প্রবাসী ফিরে এল ঘরে।

ক্রমান্বয় কারাবাসে ভগ্নদেহ আরো পড়লো ভেঙ্গে। দেখা দিল জ্বর।

ভারত সরকার যারবাদা জেল থেকে তাঁকে সরিয়ে কার্সিয়ঙে নিয়ে এলেন।

কিন্তু সেখানেও স্বাস্থ্যোন্নতির কোন লক্ষণ দেখা গেলো না।

তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো।

তবু মুক্তি নেই। দেশের লোকের মনে এই ক্রমান্বয় কারাযন্ত্রণা প্রতিদিনের অভ্যস্ত সহজ-সুখের মধ্যে কাঁটার মত ফুটতে থাকে।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধ'রে এই একটি লোক, লোক-চক্ষুর অন্তরালে, সারা পৃথিবী জুড়ে শুধু শৃঙ্খল বহন করে চলেছে···দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে।

অসহায় পরাধীন দেশ। দরিদ্র জননীর মত পারে শুধু মুখ বুঁজে সইতে আর ঘরের কোণে বসে নীরবে কাঁদতে।

তার প্রতিবাদের একমাত্র অস্ত্র নিরুপদ্রব হরতাল।

তাই দশই মে সারা ভারতবর্ষ তাঁর কারামুক্তির জন্য হরতাল ঘোষণা করলো।

এগারোই মে থেকে আবার প্রতিদিনের জীবন স্বাভাবিক ভাবেই চলতে লাগলো।

বন্ধন থেকে যে-ব্যাধির উৎপত্তি, বন্ধনে সে কি সারে?

ক্রমশ দেহ একেবারে অপটু অকর্ম্মণ্য হয়ে আসে।

অবশেষে হরতালের প্রায় এক বৎসর পরে (১৯৩৭, ১৭ই মার্চ্চ) ভারতসরকার বন্দীকে মুক্তি দিলেন।

৭৮

ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁর চিকিৎসার ভার নিলেন। কোন রকম কাজ করা ডাক্তারের নিষেধ।

একমাস কলকাতায় তাঁর চিকিৎসাধীন থাকার পর, পাঞ্জাবে ডালহাউসী পার্ব্বত্য-অঞ্চলে যাত্রা করলেন···বন্ধু ডাক্তার ধরমবীরের অতিথি হয়ে।

সেখানে পাঁচ মাস কেটে গেল, জীর্ণ দেহকে সুস্থ করে তুলতে।

কর্ম্মহীন বাধ্যতামূলক বিশ্রাম।

মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, প্রান্তর থেকে আসে সংগ্রামের আহ্বান। চঞ্চল হয়ে ওঠে রণ-অশ্বের পেশী।

ডাক্তার ধরমবীর নিষেধ করেন। এখনও কয়েক সপ্তাহ বিশ্রামের প্রয়োজন।

কিন্তু তার চেয়েও এক তীব্রতর প্রয়োজন তাঁকে টেনে নিয়ে এলো কলকাতায়। সংগ্রামের মধ্যে।

সুরু হয় আর এক নতুন সংগ্রাম···এবার রণ-স্থল বাইরে কোথাও নয়···তাঁর নিজের অন্তর। দেহ ও মনের সংগ্রাম। শতছিদ্র দেহ আর গতি-চঞ্চল মন।

একজন টেনে নিয়ে এলো কলকাতায়, আর একজন সেখান থেকে টেনে নিয়ে গেল কার্সিয়াঙে।

কে হবে জয়ী, দেহ না মন?

শেষ-মীমাংসা করবার জন্যে তিনি আবার যাত্রা করলেন, য়ুরোপে। অষ্ট্রিয়ার ব্যাড্‌গাষ্টিন শহরে। অসুস্থ দেহ মহৎ অন্তরায়।

সেখানে ছ' সপ্তাহ ধরে আবার চল্লো চিকিৎসা।

এমন সময় ভারতবর্ষ থেকে এলো সংবাদ, পরাধীন দেশ তার প্রিয়জনকে সর্ব্বোচ্চ যে সম্মান দিতে পারে, ভারতবর্ষ সেই সম্মান দিয়েছে তার বিদ্রোহী সন্তানকে···স্বাধীনতা আন্দোলনের অধিনায়কত্ব, কংগ্রেসের সভাপতিত্ব।

৭৯

তাপ্তী নদীর ধারে বারদৌলী তালুকের হরিপুরা গ্রাম।

কোথায় ভারতবর্ষের মানচিত্রে লুকিয়ে ছিল এই সামান্য হরিপুর গ্রাম···

কাশ্মীর থেকে, আসাম থেকে, পেশাওর থেকে, কন্যাকুমারীকা থেকে দলে দলে লোক চলে হরিপুরা গ্রামে···

কংগ্রেস দিয়েছে গ্রামকে মর্য্যাদা।

তাপ্তী নদীর ধারে গড়ে ওঠে বিঠল-নগরী।

তার একপাশে সভাপতির শিবির।

দূর-দূরান্ত গ্রাম থেকে এসেছে চাষীরা।

কারুর কাপড়ের খোঁটে অতি-সযত্নে বাঁধা একটী টাকা…বহু-দিনের সঞ্চয়ের ধন…

কারুর কাঁধে একজোড়া নারকেল…

তারা এসেছে তাদের দেবতাকে ভেট দিতে…সভাপতির শিবিরকে ঘিরে তারা দাঁড়িয়ে আছে…

প্রহরী স্বেচ্ছাসেবকেরা কোনমতেই তাদের আটক করে রাখতে পারে না…

বিপদ হলো একজন বৃদ্ধাকে নিয়ে।

কোনমতেই কোন বাধা সে মানবে না।

ভিড় ঠেলে সে সোজা সুভাষচন্দ্রের সামনে এসে উপস্থিত হলো।

অসুস্থ দেহ নিয়ে সুভাষচন্দ্র তখন একটা ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় শুয়ে।

বৃদ্ধা সামনে এসে মাথানত করে অভিবাদন জানালো।

সুভাষচন্দ্র হাতজোড় করে নমস্কার করলেন।

বৃদ্ধা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সুভাষচন্দ্রের পায়ের কাছে একটা ডিম রেখে, সেটা ভেঙ্গে দিল।

তারপর অদৃশ্য দেবতাকে নমস্কার জানিয়ে বল্লো, আর তোমার কোন ভয় নেই…সব অমঙ্গল ভেঙ্গে দিলাম…

হোক কুসংস্কার…

সুভাষচন্দ্র নতমস্তকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

৮০

হরিপুরা কংগ্রেস।

কংগ্রেসের একান্ন বৎসর।

বিঠল-নগরীর প্রবেশ-মুখে গড়ে উঠলো একান্নটী তোরণ, তোরণ-শীর্ষে উড়লো একান্নটী জাতীয় পতাকা, একান্নটী বলদের রথে সভাপতি শোভাযাত্রা করে প্রবেশ করলেন সভা-মণ্ডপে।

এ-রকম বিপুল শোভাযাত্রা এর আগে কংগ্রেসের ইতিহাসে হয় নি।

"বঙ্গ-কেশরী কি জয়"-ধ্বনিতে কেঁপে উঠলো তাপ্তীর তীর।

সমগ্র দেশ উৎকর্ণ হয়ে আছে, তরুণতম সভাপতির অভিভাষণ শোনবার জন্যে।

সামনেই কংগ্রেসের জীবনে কঠিনতম সমস্যা···বৃটীশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কে নয়···কংগ্রেসের আভ্যন্তরিক অস্তিত্ব নিয়েই সে-সমস্যা।

কংগ্রেস মানে আজ মহাত্মা গান্ধী।

অথচ সেই কংগ্রেস পরিচালনা করবার ভার আজ যাঁর ওপর দেওয়া হলো, তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, মহাত্মা গান্ধীর সংগ্রাম-নীতিকে অস্বীকার করে যদি কোন নতুন নীতির প্রবর্ত্তন করতে হয়, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে তিনি তা করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

জওহরলালের মত তিনিও কি শেষকালে গান্ধীর সর্ব্বগ্রাসী ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে আত্মসমর্পণ করবেন? না, কোন আপোষ-মীমাংসার সূত্র আবিষ্কৃত হবে? অথবা এই আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বে এত-দিনের এত আত্মবিসর্জ্জনে গড়ে উঠেছে যে বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠান তা ভেঙ্গে যাবে? বিপ্লবীর অসংযত অগ্নিশিখায় কি পুড়ে যাবে গান্ধীজির সম্মানের আসন?

সকলের মনে এই চারটী প্রশ্ন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর অভিভাষণে এই চারটী প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিলেন···কোন দ্ব্যর্থ নেই···কোন সংগোপনতা নেই—···এড়িয়ে যাবার কোন ভাষাগত কৌশল নেই।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর, জাতির তরুণতম নেতার ব্যক্তিত্ব আজ পূর্ণ-বিকশিত এবং নিজের মধ্যে তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্যকে এমনভাবে খুঁজে পেয়েছেন যে, অন্য কোন ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁর ওপর পড়তে পারে না। মহাত্মা গান্ধীর মতনই তিনি স্বতন্ত্র। এবং তাঁরই মত তাঁর নিজের আদর্শের জন্যে তিনি জগতে কোন কিছুর সঙ্গেই আপোষ-মীমাংসা করতে স্বীকৃত নন্।

দ্বিতীয়-প্রশ্নের উত্তর, আদর্শের ক্ষেত্রে আপোষ মীমাংসার কোন স্থান নেই। কিন্তু কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, ভিন্নমতাবলম্বী হলেও, উদ্দেশ্য যেখানে এক, সেখানে সম্মিলিত আক্রমণের জন্যে একটা মিলন-সূত্র খুঁজে বার করতে তিনি উদগ্রীব হয়ে আছেন।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর, পঞ্চাশ বছরের রক্তদানে যে-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, আত্মদানেও সে-প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা বজায় রাখতে হবে। কংগ্রেসকে অস্বীকার করে নয়, কংগ্রেসকে স্বীকার করেই,

কংগ্রেসের ভেতর থেকেই কংগ্রেসকে নব-রূপ এবং নবশক্তি দিতে হবে। কংগ্রেস আমাদের ধাত্রী নয়, কংগ্রেস আমাদের জননী। যতদূরে যাই, যেখানে যাই, আমরা আছি তারি পরিবেশের মধ্যে। সেই কেন্দ্র। আমরা বিভিন্ন দল…সম-কেন্দ্রিক বহু বৃত্ত।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর, আমার এ বিপ্লবের মধ্যে নেই আত্মঘাতী অসংযম। গান্ধীজি, যদিও আজ নতুন নেতার জন্যে আমি আহ্বান জানাচ্ছি, তবুও আমি আমার মর্ম্মের মর্ম্মস্থলে জানি, অদূর-আগত নবীন ভারত তোমারই প্রাণদায়ী আলোক-রশ্মির দিকে চেয়ে আছে। ভারতের প্রাণ-শতদলের তুমিই প্রভাত-রবি।

তাই তাঁর সভাপতির অভিভাষণে, সব কথা বলার পর, শেষ কথা বল্লেন, "মহাত্মাজী, জাতির এই পরম-লগ্নে জাতির ভাগ্য-বিধাতার কাছে, তোমার শতায়ু প্রার্থনা করি। আজ বিশেষ করে তোমাকেই প্রয়োজন। তোমাকে প্রয়োজন,

এই শতধা-বিভক্ত জাতিকে এক করবার জন্যে, তোমাকে প্রয়োজন যাতে সংগ্রামের শেষ-ফল, য়ুরোপের সামরিক-বিজয়ের মতন, অভিশাপের বীজ বুকে করে না এগিয়ে আসতে পারে,

তোমাকে প্রয়োজন, যাতে এই সংগ্রামের মধ্যে জগৎ খুঁজে পায় তার সংগ্রাম-বিভ্রান্তির সংশোধন-মন্ত্র,

তোমাকে প্রয়োজন, যাতে সংগ্রাম থেকে দূর করতে পারি নৃশংসতা, তিক্ততা আর ঘৃণা,

তোমাকে প্রয়োজন, ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ ব্যাখ্যার জন্যে,

তোমাকে প্রয়োজন, মানবতার ক্ষেত্রে দূর করতে স্বাধীনতার

কারণ আমাদের এ সংগ্রাম শুধু বৃটীশ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়,

জগতের সাম্রাজ্য-লিপ্সার বিরুদ্ধে—

মুক্ত ভারত মানে মুক্ত মানবতা।"

বর্ত্তমান জগৎ একই রাষ্ট্রের মধ্যে বহু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখেছে,

সেই রক্তাক্ত কুৎসিৎ অমিত্রের লড়াই-এর ক্ষণস্থায়ী ইতিহাসে

সুভাষচন্দ্রের জীবনের এই অধ্যায় ভারতীয় চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুন্দরতম নিদর্শন।

মনে পড়ে যায়, বহু, বহুদিন আগে, এই ভারতবর্ষে, এক ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধে, এক পক্ষে নেতা, শিষ্য অর্জ্জুন......অপর পক্ষে নেতা, গুরু দ্রোণ। মৃত্যুর তাণ্ডব আরম্ভ হবার আগে, শিষ্য অর্জ্জুন গুরু দ্রোণকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লেন...লক্ষ্য, গুরু দ্রোণের চরণ। তীর এসে পড়লো পায়ের কাছে...যুদ্ধের পূর্ব্বে শিষ্যের প্রণাম।

হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণের শেষ কয়টী লাইন, বাণ-মুখে সেই প্রণাম।

৮১

ত্রিপুরীতে সুরু হলো সংগ্রাম।

কংগ্রেস তখন এগারোটী প্রদেশের মধ্যে সাতটীতে মন্ত্রীত্বের ভার পেয়েছে।

সামনে রয়েছে স্বাধীনতার প্রস্তাবের উত্তরে ফেডারেশনের ভিত্তিতে যুক্ত-রাষ্ট্র-গঠনের একটা ব্যবস্থা। বৃটিশের চরম দান।

কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ দেশের সামনে উপস্থিত করলেন,

১। প্রাদেশিক শাসন-ভার গ্রহণের বিরোধিতা তিনি করতে চান না। কিন্তু কংগ্রেসের মন্ত্রীদের কর্ত্তব্য হবে, শাসন-যন্ত্রের সহায়ে কংগ্রেসকে আরো শক্তিশালী করে তোলা। এবং পুরাতন শাসন-ধারাকে সমূলে উপড়ে ফেলে স্বাধীন রাষ্ট্রের মতনই নতুন শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা। অবিলম্বে।

২। শাসন-যন্ত্রের সহায়তায় দেশের শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং কৃষি-সংক্রান্ত ব্যাপারে গঠনমূলক কাজে হাত দেওয়া।

৩। কংগ্রেসের মন্ত্রীরা সম্মিলিত হয়ে আলাদা একটা মন্ত্রণা-সভা গড়ে তুলবেন, সেইটাই হবে স্বাধীন ভারতের মন্ত্রী-সভার অগ্রমূর্ত্তি অর্থাৎ সেইটাকেই ক্রমশ স্বাধীন-ভারতের মন্ত্রী-সভায় পরিণত করতে হবে...আয়ারল্যাণ্ডে ডি ভ্যালেরা, এবং মিশরে ওয়াফ্‌দ্ দল যা করেছিলেন।

৪। বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে-শিক্ষিত স্থায়ী জাতীয় সেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে তোলা।

৫। যুক্ত-রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরোধিতা করা। কারণ এই ব্যবস্থার বর্ত্তমান যা রূপ, তাকে স্বাধীনতা বলা চলে না।

৬। এবং সেইজন্যই, অবিলম্বে বৃটীশ সরকারকে "আল্‌টিমেটাম্‌" দেওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে জাতির প্রতিনিধিদের নিয়ে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লী গঠন করতে হবে। এই প্রতিনিধি-সভাই একমাত্র অধিকারী জাতির ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্র গঠন করবার এবং তাতে কোন বিদেশী শক্তির কোন প্রভাব থাকবে না।

৭। এবং কংগ্রেসের শক্তি যাতে দ্বিধাবিভক্ত না হয়, তার জন্যে, বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক দলকে এবং অন্যান্য কৃষক ও শ্রমিকদলকে কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেসের অংশ বলেই গ্রহণ করতে হবে।

সেদিন শেষোক্ত তিনটী বিষয় নিয়ে কংগ্রেসের নায়কদের মধ্যে অস্পষ্ট মানোমালিন্য স্পষ্ট বিরোধিতায় আত্মপ্রকাশ করলো।

একদিকে সুভাষচন্দ্র…অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী এবং অধিকাংশ কংগ্রেস-নেতা।

বৎসরান্তে যখন কংগ্রেসের সভাপতি-নির্ব্বাচনের সময় এলো, তখন সমগ্র দেশ দেখলো, কংগ্রেসের ভেতরে একটা তুমুল সংগ্রাম আসন্ন হয়ে এসেছে।

ইদানীং প্রায় দু' যুগ ধরে কংগ্রেসের সভাপতি-নির্ব্বাচন মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদন ক্রমে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংঘটিত হয়ে এসেছে।

ত্রিপুরীতে এসে সেই ধারা ব্যাহত হলো।

নির্ব্বাচনের সায়াহ্নে মহাত্মা গান্ধী সুভাষচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন, যেন তিনি দ্বিতীয়বার আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না দাঁড়ান।

অশান্ত বিদ্রোহী দেখলো, মহাত্মা গান্ধীর এই অনুরোধের পেছনে রয়েছে, বৃটীশের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির ব্যবস্থা, পূর্ণ-স্বাধীনতার বদলে যুক্ত-রাষ্ট্র-ব্যবস্থা।

স্বয়ং ভগবান এই অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হলেও, বিদ্রোহী তা স্বীকার করতে বাধ্য নয়।

যদি আমি ভুল করে থাকি, যদি দেশ আমাকে না চায়, নির্ব্বাচনের মধ্যে দিয়ে বলুক তা দেশ।

সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর সে-অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন।

বিদ্রোহীর মাথার ওপর সহযাত্রীদের ক্রুদ্ধ অন্তর বজ্রের মতন ভেঙ্গে পড়লো।

স্বর্গ-বিহীন শ্মশানে একা জাগে রুদ্র-দেবতা।

বাউল বাংলার অন্তরের ঠাকুর।

বিদ্রোহী আর বৈরাগী।

৮২

সেদিন যখন ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা ও কর্ম্মরথী এই তরুণ বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন তাঁকে আহ্বান করলো ভারতের কবি....বাংলার কবি, বন্ধন-মোচনের কবি।

বুঝি বড় প্রয়োজন ছিল এই আহ্বানের।

নীরব আত্মিক সম্মতি।

রবীন্দ্রনাথ সাদরে আহ্বান করলেন বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্রকে শান্তিনিকেতনে।

বল্লেন, "বাঙালী কবি আমি, বাংলা দেশের হয়ে তোমাকে দেশ-নায়কের পদে বরণ করি।"

এ যেন কবি-কণ্ঠে বাংলার অন্তর-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ···দুরন্ততম সন্তানের জন্যে জননীর নিবিড়তম স্নেহ।

জনতা থেকে দূরে * অন্তরের অন্তরতম স্থল থেকে বাংলার অস্ত-গগনের রবি সেদিন বাংলার ভাগ্যাকাশে নবোদিত এই জ্যোতিষ্ককে বরণ করে নিলেন।

"সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্ব্বলতা, তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে-আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। * *

---

* কবি তখন তাঁর এই সম্ভাষণ কাগজে প্রচারিত হতে দেন নি।

হিংস্র দুঃসময়ের পিঠের উপরে চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হতে হবে, এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পারবে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের যাত্রা-নেতার পদে আহ্বান করি।”

এর পর সমগ্র জগৎ অস্বীকার করলেও কিছু যায় আসে না।

স্নিগ্ধ শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে আসে চির-সংগ্রামীর ক্ষত-বিক্ষত মন।

বিদায়-মুখে কবি তুলে দেন, বাংলার সমগ্র বঞ্চিত যৌবনের দুরাকাঙ্ক্ষার ভার সেই উন্নতশির তরুণ-বিদ্রোহীর স্কন্ধে—

“বহুকাল পূর্ব্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে বাণীদূত পাঠিয়েছিলাম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে ও মনে তাঁর সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারবো আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্ত্তব্যরূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্ব্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার পুরস্কার বহন করে।”

কবির আশীর্ব্বাদ নিয়ে, দেশের সেই সার্থক মুক্তির দাবী বহন করে সুভাষচন্দ্র চল্লেন ত্রিপুরী কংগ্রেসে।

৮৩

উনিশ শো উনচল্লিশের উনত্রিশে জানুয়ারী সারা ভারতবর্ষ কথঞ্চিত বিস্মিত হয়েই শুনলো যে, নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুভাষচন্দ্রই জয়ী হয়েছেন।

তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডাঃ পট্টভী পেয়েছেন, প্রায় তেরো শো ভোট··· সুভাষচন্দ্র পেয়েছেন, পনেরো শোরও বেশী।

মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করলেন, এ পরাজয় আমারই পরাজয়। এতে প্রমাণিত হলো কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা আমার আদর্শে বিশ্বাস করেন না। আনন্দিত চিত্তেই এই পরাজয়কে আমি গ্রহণ করছি।

সুভাষচন্দ্র জয়ী হলেন। কিন্তু পরাজয়ের চেয়েও কঠিন হলো এই জয়।

কেউ না বুঝলেও, তিনি বুঝলেন, ভোটের জয়, জয় নয়।

আসল জয়, তিনি এখনো অর্জ্জন করতে পারেন নি।

অন্তর থেকে তিনি বলে উঠলেন, জগতের অন্য সব লোকের বিশ্বাস অর্জ্জন করে, যদি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের বিশ্বাস অর্জ্জন করতে না পারি, তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আমার কাছে কিছু আর হতে পারে না।

তাই ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনের আগেই তিনি সর্ব্ব-মন-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন, মহাত্মা গান্ধীর অন্তর জয় করতে। জীবনের সর্ব্ব-পরাজয়কে যিনি গ্রহণ করেছেন, অবিচল স্থৈর্য্যে, চরম জয়কেও গ্রহণ করলেন সেই উদার অবিচলতায়।

তাঁর এই জয়-পরাজয়-নিরপেক্ষতার মধ্যে বিদ্রোহী যৌবন পেল নতুন আদর্শের সন্ধান।

শ্রদ্ধা।

এই দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল যুগে, সর্ব্ব-আবিলতার ঊর্দ্ধে, জীবনকে গ্রহণ করবার সেই সনাতন ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী।

সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দলগত কুৎসিৎ আক্রমণ, জয়-পরাজয়, সকলের ঊর্দ্ধে আজ অম্লান হয়ে বিরাজ করছে, এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বে সুভাষচন্দ্রের মহিমান্বিত ভঙ্গী, ব্যবহারিক জগতে তাঁর ক্রটী-হীন অনাবিল রাজকীয় ঐশ্বর্য্য···

বাংলার যৌবনের সর্ব্বোত্তম বিকাশ।

৮৪

তাই বিজয়ী ছুটলো পরাজিতের কাছে।

ব্যক্তিগত জয়-পরাজয়ের চেয়ে ঢের বড়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।

এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুভাষচন্দ্র ভোলেন নি, সেখানে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন মহাত্মা গান্ধীর। ভোলেন নি, জীবনের একটীমাত্র লক্ষ্য চরম লক্ষ্য, ভারতের স্বাধীনতা।

অসুস্থ দেহকে অস্বীকার করে ছুটলেন সেবাগ্রামে।

ডাক্তারেরা নিষেধ করলেন।

কিন্তু সে-নিষেধ শোনবার সময় কোথায়?

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে বহু আলাপ-আলোচনা করে ওয়ার্দ্ধাতে ফিরলেন।

ওয়ার্দ্ধাতে এসে বুঝলেন, শরীরের ভেতর আবার কিছু বিশেষ গোলমাল হয়েছে।

টেম্পারেচার নিয়ে দেখলেন, ৯৯'৪°...

এমন কিছু নয়।

পরের দিন * সকালে ওয়ার্দ্ধা থেকে কলকাতায় ফেরবার কথা।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বুঝলেন, কাল রাতে যাকে অবজ্ঞা করেছিলেন, বোধহয় নিতান্ত অবজ্ঞার বস্তু সে নয়।

কিন্তু লোক-জন আসা-যাওয়া...যাত্রার আয়োজন...তার মধ্যে চাপা পড়ে গেল দেহের উত্তাপ এবং অশান্তি।

ট্রেণ যখন নাগপুর ষ্টেশন পেরিয়ে চলেছে, তখন একবার আবার টেম্পারেচার নিলেন, মাত্রা বাড়ছে ১০১°...

পরের ষ্টেশনে কামরায় একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক উঠলেন। ইচ্ছা না করলেও আলাপ করতে হয়।

হঠাৎ ভদ্রলোকটী বলে উঠলেন, আপনার হয়েছে কি? আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনার দেহে যেন কিচ্ছু নেই!

অস্বীকার করতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু দেখতে দেখতে শরীর ঝিমিয়ে আসতে থাকে। শিশিরের মত ঘামে সারা গা ভিজে যায়।

সহযাত্রী ভদ্রলোকটি সহানুভূতিতে কাতর হয়ে পড়েন।

সুভাষচন্দ্র বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়লেন।

সারাদিন সারারাত অর্দ্ধ-অচৈতন্যের মতন বার্থে শুয়ে রইলেন...

ষ্টেশনে নেমেই বাড়ী এলেন। এবং বিশ্রামের জন্যে শয্যা নিলেন।

তখন কল্পনাও করতে পারেন নি, কয়েক সপ্তাহ আর সেই শয্যা থেকে উঠতে পারবেন না।

শয্যায় শুয়ে অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় মনে পড়ে, ত্রিপুরী কংগ্রেস ...তার আগে ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন...পাটনা-হাজীপুর সভা...

* ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯।

চঞ্চল হয়ে ওঠে মন।

বাড়ে দেহের উত্তাপ।

৮৫

১৮ই ফেব্রুয়ারী হাজীপুর···

১৯শে ফেব্রুয়ারী মজফ্‌ফরপুর···

তারপর, ২২শে ফেব্রুয়ারী···ওয়ার্দ্ধা···কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন···সদস্য নির্ব্বাচন···

জ্বরের বিকারের মধ্যে তারিখের দিকে চেয়ে থাকেন।

টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসে।

হাজীপুর···মজফ্‌ফরপুর থেকে···তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে.... বিরাট অধিবেশন হবে...বিপুল আয়োজন হচ্ছে···

কোন উত্তর নেই।

শেষকালে টেলিফোন।

—কখন আসছেন?

ডাক্তার নীলরতন সরকার উতলা হয়ে ওঠেন।

এ সব সংবাদ থেকে রোগীকে দূরে রাখতে চান।

কিন্তু টেলিফোন কানের কাছে বেজে ওঠে।

রোগশয্যা থেকে টেলিফোনে জবাব দেন, হাঁ যাব···নিশ্চয়ই যাব ···তবে শোভাযাত্রা বা উৎসব-আয়োজন এসব যেন কিছু না হয়···

ডাক্তারেরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

সতেরো তারিখে সুভাষচন্দ্র ষ্টেশনে লোক পাঠালেন, টিকিট কিনে বার্থ রিসার্ভ করে রাখবার জন্যে।

যদি ১০৫° ডিগ্রীও হয়, তবু যাব।

৮৬

১৮ই ফেব্রুয়ারী।

ট্রেণের সময় হয়ে এসেছে।

ডাক্তার, বন্ধু-বান্ধব, ক্ষুব্ধ নীরব।

যাবার আয়োজন চলেছে।

যে যাবেই, কে তাকে ধরে রাখবে?

শয্যা থেকে ওঠবার জন্যে রোগী চেষ্টা করে।

অসহ্য যন্ত্রণায় মাথা ফেটে পড়ে।

হায় দেহ!

উত্থান-শক্তি-হীন শয্যায় লুটিয়ে পড়েন।

টেলিগ্রাম করতে আদেশ দেন, আজ কিছুতেই পারলাম না··· দুঃখিত···কাল যাবোই···

'কাল'ও চলে গেল অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থায়।

কিন্তু ২২শে···ওয়ার্দ্ধা···কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন···

অস্থির হয়ে ওঠে মন।

ডাক্তারেরা বলেন, সে-আশা মন থেকে পরিত্যাগ করুন। তা না হলে, ত্রিপুরীতেও যেতে পারবেন না। ওয়ার্কিং কমিটি সম্পর্কে কোন ভাবনা-চিন্তা মনে রাখতে পারবেন না।

কিন্তু বধির শ্রবণে কোন কথাই গিয়ে পৌঁছয় না···

একমাত্র চিন্তা···২২শে ফেব্রুয়ারী···ওয়ার্দ্ধা···কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন···মৃত বা জীবিত পৌঁছতেই হবে···

ডাক্তারেরা সকলে মিলে নিষেধ করেন।

কিন্তু তিনি যাত্রার আয়োজনের সব ব্যবস্থা করে চলেন···

ট্রেণ নয়···এরোপ্লেন···অল্প সময়ের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছবেন···

একটা আলাদা প্লেন ভাড়া করে রাখবার জন্যে আদেশ দেন···

এবং আদেশ মত একটা প্লেন রিজার্ভ করা হলো···

কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারী বুঝলেন, উত্থানের কোন সম্ভাবনাই নেই। অচৈতন্য দেহ নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির কোন লাভই হবে না।

অগত্যা মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটির বারো জন সদস্যকে টেলিগ্রাম করলেন···

সর্দ্দার প্যাটেল, ওয়ার্দ্ধা···

মহাত্মাজীর কাছে আমার টেলিগ্রাম অনুগ্রহ করে দেখবেন। কংগ্রেসের অধিবেশন পর্য্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন স্থগিত রাখতে বাধ্য হচ্ছি। নিরুপায়। অনুগ্রহ করে সহকর্ম্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে, মতামত তার-যোগে জানান।

সুভাষ

তার উত্তরে এলো, সেই বারোজন সহকর্ম্মীর পদ-ত্যাগ। তাঁরা একযোগে সকলে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যের পদত্যাগ

করেছেন, নতুন সভাপতি তাঁর ইচ্ছামত নতুন সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করুন।

রোগশয্যায় শুয়ে সুভাষচন্দ্র জীবনের এই ক্রূরতম আঘাত নীরবে সহ্য করেন।

কিন্তু এই আঘাতের চেয়েও তীব্রতর আঘাত এলো, যখন জানতে পারলেন, তাঁর অধিকাংশ সহকর্ম্মীই, কংগ্রেসের যাঁরা নেতা, তাঁরা সন্দেহ করেন, তাঁর এই ব্যাধি, ব্যাধি নয়, ছল…কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিবেশনকে পিছিয়ে দেবার একটা রাজনৈতিক কৌশল। অন্য কেউ নয়, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব্ব সদস্যদের মধ্যে থেকেই এলো এই সন্দেহ এবং ত্রিপুরী অধিবেশনের আগে এই কথা নিয়ে কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে রীতিমত প্রচার কার্য্য চলতে লাগলো।

এতদিন পরে সত্যিকারের ভেঙ্গে পড়লো বিপ্লবীর মন।

শত্রুর হাতে মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করা যায়, কিন্তু বন্ধুর কাছ থেকে পেছনে সামান্য আঘাতও মর্ম্মান্তিক হয়ে ওঠে।

সেই অবস্থায় রোগ-শয্যায়, এতদিন যে-মনকে সম্বল করে তিনি চেয়ে ছিলেন ত্রিপুরীর দিকে, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সে-মন।

আজীবনের কারা-যন্ত্রণায় আসে নি যে অবসাদ, আজ নিজের দেশের লোকের এই নিষ্ঠুর অবিশ্বাসে, ছেয়ে গেল সে অবসাদে মন।

৮৭

একশো চার থেকে নামে না টেম্পারেচার।

স্যার নীলরতন ডাক্তার হিসাবে তাঁর কর্ত্তব্য-স্বরূপ ঘোষণা করলেন, আমার চিকিৎসাধীন যদি থাকতে হয়, ত্রিপুরীতে আমি যেতে দিতে পারি না। অসম্ভব!

যখন সেই বুলেটিনের কথা তিনি জানতে পারলেন, কাতরভাবে স্যার নীলরতনকে জানালেন, ত্রিপুরীতে তাঁকে যেতেই হবে। তার জন্যে যদি জগৎ তাঁকে ত্যাগ করে, তিনি নিরুপায়। সে-মহা-ভবিতব্যতার কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন।

ম্লান-বিষণ্ণ অন্তরে ডাক্তারেরা চেষ্টা করেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যতদূর সম্ভব…

সেই সময়, প্রতিদিন, প্রতি ডাকে, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক জায়গা থেকে অপরিচিত সব লোক, জাতির সেই তরুণযাত্রা-নেতার কল্যাণ-কামনায়, যে-যা জানে, তাই লিখে পাঠায়। কবিরাজ কবিরাজী ওষুধের ব্যবস্থা-পত্র পাঠায়···কারুর কাছে আছে সন্ন্যাসী-দত্ত ওষুধ, যদি তিনি ব্যবহার করেন, তিনি পাঠাতে পারেন। কেউ কেউ পাঠিয়ে দেয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গাছ-গাছড়া, শিকড়, মাদুলী, রক্ষা-কবচ, শান্তি-জল, যজ্ঞ-ভস্ম···ভরে ওঠে ঘর। কোথা থেকে অজানা সন্ন্যাসী এসে অনুরোধ করেন, এই রক্ষা-কবচ ধারণ করুন, ব্যাধি সেরে যাবে।

তাঁর দৃষ্টির অগোচরে, হিতকামী পণ্ডিতেরা জ্যোতিষ-শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতে বসেন। একদিন সহসা তাঁদের বংশের কল্যাণ-কামী এক সর্ব্বজনমান্য পণ্ডিত এসে উপস্থিত হলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা মিলে জ্যোতিষের গণনার সাহায্যে জানতে পেরেছেন দেশের কোন স্থানে কোন ব্যক্তি তাঁর মৃত্যু কামনা করে মারণ-ক্রিয়া করছে···তারই ফলে এই ব্যাধি।

সর্ব্ব সংস্কার-মুক্ত অদ্বৈতবাদী যিনি, জীবনে বহু আয়াস সহকারে যাঁকে দর্শন ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে হয়েছে, তাঁর পক্ষে এই সব আধিভৌতিক ক্রিয়া-কার্য্যকে স্বীকার করা দুরূহ হয়ে ওঠে। সারা জীবনের জ্ঞান-সাধনা যে মাদুলিকে অস্বীকার করে এসেছে, আজ দেহের দুর্ব্বলতায় তাকে স্বীকার করবেন কি ভাবে? সুরু হয় নিজের মধ্যে আর এক কঠিন দ্বন্দ্ব।

কিন্তু ত্রিপুরী?

সেখানে উপস্থিত হবার জন্যে, যদি সমস্ত অর্জ্জিত সংস্কারকেও বিসর্জ্জন দিতে হয়···তিনি প্রস্তুত।

ত্রিপুরী যাবার আগে, তাই দুটী আংটী এবং চারটী কবচ ধারণ করলেন।

ত্রিপুরী পৌঁছতেই হবে।

৮৮

অভ্যর্থনা সমিতির লোকেরা বহু আয়াস স্বীকার করে সভাপতি সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেছিলেন।

কিন্তু সভাপতির বদলে সভাপতির চিত্রকে রেখে শোভাযাত্রার আয়োজন বজায় রইলো।

এ্যাম্বুলেন্স চেয়ারে সুভাষচন্দ্র অর্দ্ধ-অচৈতন্য দেহে সভাপতির শিবিরে উপস্থিত হলেন।

দূর থেকে যে-সন্দেহের বিষাক্ত বাণের আঘাত লেগেছিল, কাছে এসে প্রত্যক্ষভাবে দেখলেন, চারিদিকে উদ্যত ধনুক···ভরা বিষাক্ত বাণ···

শিবিরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে অভ্যর্থনা-সমিতির ডাক্তারেরা তাঁকে পরীক্ষা করতে এলেন।

পরীক্ষার সময় সুভাষচন্দ্র লক্ষ্য করলেন, ডাক্তারেরা নীরবে পরস্পর কি যেন ইঙ্গিত করছেন।

তাঁদের মুখের ভঙ্গী এবং নীরব ইঙ্গিত থেকে সুভাষচন্দ্র মর্ম্মাহত হয়ে বুঝলেন, তাঁরা এসেছিলেন, তাঁর "ছল" ভেঙ্গে দেবার জন্যে··· ত্রিপুরীতে তখন অধিকাংশ লোকই মেনে নিয়েছিল যে, এই ব্যাধি একটা মিথ্যা আবরণ মাত্র। তাই ডাক্তারেরাও যেন প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন, সেই সন্দেহকে সত্য বলে জাহির করবার জন্যে। কিন্তু তাঁরা যখন দেখলেন যে, লোকের সন্দেহই ভুল, তাঁরা নিজেরাও কম বিস্মিত হলেন না।

যে-ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন, তাঁকে ডেকে ওয়ার্কিং কমিটীর ভূতপূর্ব্ব একজন বিশিষ্ট সদস্য বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নিজের হাতে টেম্পারেচর নিয়েছিলেন? সত্যিই দেখেছিলেন ১০৩ টেম্পারেচর?

একদিকে এই মর্ম্মঘাতী কুৎসিৎ মনোবৃত্তি, অন্যদিকে কংগ্রেস-মহারথীদের সঙ্ঘবদ্ধ বিরূপতা....চিরসংগ্রামীর মন মহা-নৈরাশ্যে ভরে ওঠে। ভুলে-যাওয়া কৈশোরের বৈরাগ্যের সুর ত্রিপুরীর সব কোলাহলের উর্দ্ধে মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

৮৯

অধিবেশনের আগে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য আরো শোচনীয় হয়ে উঠলো।

ডাক্তারেরা উদ্বিগ্ন হয়ে পরামর্শ দিলেন, অবিলম্বে তাঁকে জব্বলপুরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু সেকথা শুনে সুভাষচন্দ্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

বল্লেন, হাসপাতালে যাবার জন্যে আমি এখানে আসি নি। কংগ্রেস অধিবেশন শেষ না হলে আমি এখান থেকে যাবো না… যেতে পারে আমার মৃত দেহ।

ত্রিপুরা-কংগ্রেস।

সভাপতির আসনে রোগ-শয্যায় শায়িত শীর্ণ-দেহ সুভাষচন্দ্র।

মহাত্মা গান্ধীকে কাতর অনুরোধ জানান সত্ত্বেও, তিনি রাজকোট ত্যাগ করে ত্রিপুরীতে এলেন না।

অন্য কংগ্রেস মহারথীরা আশা করেছিলেন, হয়ত দৈহিক কারণে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদ ত্যাগ করবেন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কাছে, তখন সভাপতির পদ ত্যাগ করা মানে, নিজের আদর্শ ত্যাগ করা। যে-সংগ্রাম অনিবার্য্য জেনে আজ মৃত্যুকে অস্বীকার করেও তিনি ত্রিপুরীতে এসেছেন, তিনি যদি পদ-ত্যাগ করেন, সে-সংগ্রাম বহু দূরে সরে যাবে। আপোষ-আলোচনার বাদানুবাদে জনতার সংগ্রাম-স্পৃহা ঘুমিয়ে পড়বে।

তাই সব অপমান, লাঞ্ছনা, সব বিরূপতা উপেক্ষা করে, মৃত্যু-আক্রান্ত দেহকে নিয়ে তিনি ত্রিপুরীতে এসেছেন। হাতে তাঁর রক্ষা-কবচ·· জনতার শুভ-ইচ্ছার প্রতীক।

সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ।

তাঁর হয়ে তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্র পড়ে দিলেন। হিন্দী অনুবাদ করলেন, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব।

মূলকথা, পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী আমরা বৃটীশ পার্লামেন্টের কাছে উপস্থিত করবো। ছ'মাসের মধ্যে যদি বৃটিশ পার্লামেন্ট তা দিতে না চায়, তখন সুরু করবো ভারতব্যাপী শেষ আইনঅমান্য আন্দোলন।

বৃটীশ-নির্দ্দিষ্ট যুক্ত-রাষ্ট্র-আদর্শ নিয়ে বিরুদ্ধ দল প্রস্তর-নীরবে সে-অভিভাষণ শুনলো।

৯০

সাব্‌জেক্‌ট-কমিটীর সভায় পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁদের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন।

তিনি একটা প্রস্তাব আনলেন, বর্ত্তমান কংগ্রেস এখনও পর্য্যন্ত

মহাত্মা গান্ধীর অধিনায়কত্ব স্বীকার করে এবং চিরাচরিত প্রথা-অনুযায়ী গান্ধীজির ইচ্ছা অনুসারেই যেন বর্ত্তমান সভাপতি কার্য্যকরী সভার সদস্য নির্ব্বাচন করেন।

শুনতে অতি নিরীহ প্রস্তাব।

মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা করলেও, মহাত্মা গান্ধীকে তিনি অন্য কারুর চেয়ে কম শ্রদ্ধা করেন না। এবং সেক্ষেত্রে সদস্য-নির্ব্বাচনে যদি মহাত্মা গান্ধী তাঁকে সাহায্য করেন, তিনি তা অগ্রাহ্য করবেন কেন।

কিন্তু যে-ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টতই ঘোষণা করেছেন নতুন অধিনায়কত্বের এবং যেখানে মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধ উপেক্ষা করেই তিনি সভাপতি নির্ব্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছার সঙ্গে তাঁকে বেঁধে রাখার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ থাকতেই পারে না। ইচ্ছা করলে সভাপতিরূপে তিনি পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে না দিতেও পারতেন।

কিন্তু বীর তিনি, বীরত্বের রীতি-অনুযায়ী প্রতিপক্ষের কোন অসুবিধার সুযোগ নিতে তিনি চাইলেন না।

গোবিন্দবল্লভের প্রস্তাব গৃহীত হলো।

নিজের হাতে নিজের বেড়ী পরলেন।

সদস্য-নির্ব্বাচনে মহাত্মা গান্ধীকে বহু মিনতি করেও রাজী করাতে পারলেন না।

গান্ধীজি তাঁর আদর্শের দিক থেকে বল্লেন, যখন তুমি সভাপতি হয়েছ, তখন আমার ইচ্ছাকে তোমার ওপর চাপাতে পারি না। তোমার ইচ্ছামত সদস্য-নির্ব্বাচনে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

কিন্তু সে-অধিকার গোবিন্দবল্লভ কৌশলে ইতিপূর্ব্বেই তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। মাঝখান থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর গঠন অনির্দ্দিষ্ট কালের মত বন্ধ হয়ে থাকে।

কংগ্রেসের মূল অস্তিত্বে আঘাত লাগে।

সেক্ষেত্রে কংগ্রেসই জয়ী হোক…যে-দেশে মানুষ একসঙ্গে পা ফেলে চলে না, সেদেশে গড়ে উঠেছে ভারতব্যাপী একটা অনুষ্ঠান, জয়ী হোক সে অনুষ্ঠান, লুপ্ত হোক্ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য।

দীর্ণ-হৃদয়ে সুভাষচন্দ্র ত্যাগ করলেন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব।

৩১

জীর্ণদেহ, ততোধিক জীর্ণ মন নিয়ে, জনতা থেকে দূরে, গ্নামাডোবায় এসে শয্যাগ্রহণ করলেন।

অন্তরের অন্তরতম স্থল থেকে জেগে ওঠে মহা-জিজ্ঞাসা, এই রাজনীতি? এরি পেছনে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি দিয়েছেন ভাসিয়ে?

কোথায় জীবনের চরম লক্ষ্য?

দূর থেকে ভেসে আসে, ফেলে-আসা জীবনের প্রথমদিনের আহ্বান···সর্ব্ব-কোলাহল থেকে দূরে আত্মার নিভৃত-লোকে জাগে হিমালয়ের ধ্যান-মৌন মাধুরী···আসে চির-বৈরাগ্যের আমন্ত্রণ। কেন সে-আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ঘুরে মরলাম এই ধূলি-আবর্ত্তে? এমনি সংশয়-আকুল বেদনায় কি একদিন অরবিন্দ সর্ব্ব-কোলাহল থেকে দূরে অমরজীবনের সন্ধানে ডুব দিয়েছিলেন বিশ্ববিহীন বিজনতায়? মায়ার ডোর ছিন্ন করে, এসেছে কি মহা-লগ্ন, অমৃত-উৎসের সন্ধানে বেরুবার?

সমগ্র ভারতবর্ষ যখন ঘোঁট পাকিয়ে আনন্দ উপভোগ করছে, কে হারলো, কে জিতলো, সুভাষ না গান্ধী? তখন একা রোগশয্যায় শুয়ে চির-অশান্ত বিপ্লবী জীবনের এই মহা-জিজ্ঞাসার উপর অনুসন্ধানে বিনিদ্র দিবস-রজনী যাপন করছেন, কে বলে দেবে পথ? কোথায় অন্তরের অমৃত উৎস? কিসে হবে এই জীবন-ব্রতের মহাউদ্‌যাপন?

ত্রিপুরীতে আসবার আগে, হাতে যে আংটী দুটী এবং কবচ ধারণ করেছিলেন, তা খুলে রেখে দিলেন।

কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়লো, তাদের কথা, যারা পাঠিয়েছিল এমনি সব আংটী আর মাদুলী। একজন, দুজন নয়, অসংখ্য লোক। তাঁদের দেখেন নি, হয়ত তাঁদের কাউকে জীবনেও দেখতে পাবেন না, জীবনের অতি সাধারণ সব লোক···কিন্তু কি-আকুতি, কি ব্যাকুলতা তাদের, তাঁর কল্যাণের জন্যে···তাঁর মঙ্গলের জন্যে। দেখতে দেখতে, মনের মধ্যে সহসা সেই নিবিড় পুঞ্জীভূত অন্ধকারে জ্বলে ওঠে প্রদীপ। ত্রিপুরীতে তাঁর অতি-কাছে যাঁদের দেখেছেন, যাঁদের হানতায় আজ মনে জেগেছে তিক্ততা, তাঁরাই তো এ-দেশের

সবটুকু নয়। এই যে যাদের কথা ভাবচেন, যাদের ভালবাসা সংস্কার কুসংস্কার ভাবে নি, দেশ জুড়ে তারাই তো আছে…তারাই তো দেশ …তারাই তো ভারতবর্ষ। তারাই তো ত্রিপুরীর অদৃশ্য অধিবাসী।

ধীরে কেটে আসে অবসাদ…তিক্ততার ভার। ভেতর থেকে উৎসরিয়া ওঠে গতির আনন্দ। চীৎকার করে ওঠে আহত-ইন্দ্রিয়, পেয়েছি, পেয়েছি উত্তর। জীবনের সব জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর…

"One thing I know. This is the India for which one toils and suffers. This is the India for which one can even lay down his life. This is the real India in which one can have undying faith, no matter what Tripuri says or does."

—এই ভারতবর্ষ…এরি জন্যে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েও আনন্দ… ত্রিপুরী যা খুশী বলুক, যা খুশী করুক।

পাষাণ-বন্ধন ভেঙ্গে এতদিন পরে মুক্তি পেলো বন্দী নির্ঝরিণী ‥ প্রান্তর বেয়ে ছুটলো সাগর-সঙ্গমে।

৯২

নদীর উৎস-মুখে দাঁড়িয়ে দেখছি…শৈবাল-আচ্ছন্ন পাহাড়ের ফাটল দিয়ে, শান্ত, অতি শান্ত, ঝির্ ঝির্ করে ক্ষীণ জলধারা বেরিয়ে আসছে…বেগহীন, তরঙ্গহীন, স্নিগ্ধ শান্ত ধারা…নদীর শৈশব…

তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলি…অন্ধকার অরণ্য-গৃহ ত্যাগ করে, পাহাড়ের গা বেয়ে শতধারায় নদী নেমে চলেছে প্রান্তরের দিকে…সেখানে দুই তীরে বাঁধা তার সমস্ত উচ্ছ্বাস…তার স্নেহের স্পর্শে সজীব শ্যামল হয়ে উঠেছে দুধারের শস্যক্ষেত্র…নিস্তরঙ্গ জলে প্রভাতে সন্ধ্যায় গ্রাম-তরুণেরা অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে করে জলকেলি…ধীরে মৃদু স্রোতে বয়ে যায় নৌকা…কখনো জোয়ারে ফুলে কেঁপে ওঠে তার শান্ত বক্ষ, ভেসে যায় দুই তীর‥ সাড়া দেয় সে দূর সমুদ্রের আহ্বানে…আবার দুই তটের মধ্যে শান্ত হয়ে আসে তার গতি…কলরোলে এগিয়ে চলে নদী…এগিয়ে চলে প্রান্তরবাহী নদীর যৌবন…

সহসা কাণে আসে মহাগর্জ্জন সমুদ্রের গর্জ্জন…মহা-ঈপ্সিতের

আহ্বান···যার জন্যে একদিন শৈলশিখরে শান্ত সীমাবদ্ধতায় সে দেখেছে স্বপ্ন···যার জন্যে দুই তটের বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়ে মহা-সংযমীর মত নিজের গতির মধ্যে নিজেকে রেখেছে শাসন-সংযত ক'রে···

আজ সহসা সামনের সেই বিপুল মহাগর্জ্জন তার শান্ত গতির বুকে জাগিয়ে তোলে প্রলয়-আলোড়ন···যে-দুর্নিবার, যে অশান্ত, যে-সুবিশাল, যে মহা-ভয়ঙ্কর অথচ যে ঈপ্সিত চিরসুন্দর ছিল দূরে, সে এসে গিয়েছে স্পর্শের সীমানার মধ্যে, মেঘচুম্বী তরঙ্গের মূর্ত্তিতে সে করে আহ্বান, সে-আহ্বান বাজে নদীর অন্তরে, তার শান্ত গতির ধারায় জেগে ওঠে মেঘচুম্বী তরঙ্গ, ভেসে ভেসে যায় দুই তটের বাঁধন, উদ্দাম উত্তালের স্পর্শে সে হয়ে ওঠে উদ্দাম, উত্তাল, ভয়ঙ্কর···নদী আজ নিয়ে যাবে সাগরে, নদী আজ হবে সাগর। ভয়ঙ্কর ডাক দেয় ভয়ঙ্করকে, মহাকাল রুদ্রসাজে আসে সে-মিলনের পৌরোহিত্য করতে···নদী পায় তার সম্পূর্ণতাকে··· সুবিশাল বিস্তারে মিশে যায় তটবদ্ধ নদী আর তটহীন সাগর··· নদী হয়ে যায় সাগর···

মহাসাগর, তোমাকে প্রণাম!

৯৩

ত্রিপুরী কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী আর তাঁর অনুচর কংগ্রেস-নেতাদের সম্মিলিত আক্রমণের কাছে ভগ্নস্বাস্থ্য, জ্বরগ্রস্ত সুভাষচন্দ্র জয়ী হয়েও পরাজয় স্বীকার করলেন। পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে নিজের অন্তরকে করলেন রক্ষা। রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে উঠলেন নতুন অভিব্যক্তির উন্নত স্তরে।

রাজনীতিকের মত জীবনকে তিনি শুধু ভোটের যুদ্ধ হিসেবে দেখেন নি; কবির মতন, দার্শনিকের মতন, যোগীর মতন তিনি জীবনকে দেখেছিলেন ভেতর থেকে অনাদি প্রাণ-শক্তির লীলা-ক্ষেত্র রূপে। রাজনীতিকের মতন তাঁর মন তাই ব্যক্তিগত জয়-পরাজয়ের দড়িতে বাঁধা পড়ে নি। নিঃশব্দ সংগোপন সাধনায় মনকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন জীবনমুখী করে। সেখানে ব্যক্তিগত জয়-পরাজয়, পদের মোহ, প্রতিপত্তির লালসার কোন স্থান ছিল না। সেখানে সে বন্ধনহীন চিরমুক্ত। অপরাজেয়। তার পথ চির-উন্মুক্ত। তাই

পথের বাধায় তার দুরন্ত গতি ব্যাহত হয় না। তাই অপরের চলার পথও সে রোধ করে থাকে না।

সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছায় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করলেন। কংগ্রেসকে তার নিজের পথে অবাধে চলতে দিলেন। তাঁর নিজের চলার পথে একা চল্লেন এগিয়ে।

কংগ্রেসকে শুধু জানিয়ে দিলেন, পথ একটা নয়। যে চলতে চায়, তার পা-ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই পথ তৈরী হয়। চলা যদি সত্য হয়, সব পথই মিলবে গিয়ে এক লক্ষ্যে। কিন্তু চলাই যদি থেমে যায়, তা'হলে পথ, যত বড়ই হোক্ না, কোথাও দেবে না পৌঁছে। পথ চলে না, পথিকই চলে।

সেদিন অন্তরের প্রাণধর্ম্মে সুভাষচন্দ্রই প্রথম বুঝেছিলেন, কংগ্রেসের চলার মধ্যে দেখা দিয়েছে গতির বিপরীত ধর্ম্ম। যা ছিল গতিময়, প্রাণময়, তা হয়ে আসছে স্থাণু, দলময়। তীর্থের পথে দেখা দিচ্ছে দলের আভিজাত্য।

তাই সেদিন কংগ্রেসী-দলের আভিজাত্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সুভাষচন্দ্র বাঁচিয়ে রাখলেন তাঁর অন্তর-ধর্ম্মকে, যৌবন-ধর্ম্মকে।

কংগ্রেস হারালো সুভাষচন্দ্রকে কিন্তু কিছুই হারালেন না সুভাষচন্দ্র। খুঁজে পেলেন আবার নিজেকেই। তাই হারাবার দুঃখে বা ক্ষোভে চীৎকার করলেন না, কাউকে গালাগাল দিলেন না, কাউকে ছোট করলেন না। নিজেকে পাওয়ার আনন্দে পথের প্রেমে আবার উঠলেন মেতে।

কিন্তু বড় সংগোপন। সমুদ্রের ভেতরকার স্তব্ধতা। বাইরে তখন কেউ জানলো না সেই নতুন পথের প্রেমের কথা।

৯৪

ডাক দিলেন দেশের যৌবনকে। দেশের ছাত্রদের। যৌবনই একমাত্র পারে পথের বাধাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলতে। সেদিন সুভাষচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন, কংগ্রেসের পুরানো নেতৃত্বের ভেতর ঢুকেছে আত্মক্ষয়ের বীজ···জীবন-বাদের বদলে এসেছে গুরু-বাদ···বিপ্লবের অগ্নিশিখা স্তিমিত হয়ে আসছে ক্লান্তি-আপোষের আত্মপ্রবঞ্চনায়···দেশের চেয়ে বড় উঠেছে দল···নতুন সঞ্চয়ের আগ্রহের বদলে দেখা দিয়েছে পুরানো সঞ্চয় নিয়ে বেচা-

কেনা। সুভাষচন্দ্র চাইলেন এর প্রতিকার, যৌবনকে চাইলেন আপোষহীন সংগ্রামের অনিবার্য্যতায় জাগিয়ে তুলতে, নতুন প্রাণ, নতুন জীবন, নতুন নেতৃত্বের ক্ষুধা জাগিয়ে তুলতে যৌবনের বুকে। তাই সেই নতুন আয়োজনের নাম দিলেন, ফরওয়ার্ড ব্লক···

নতুন নেতৃত্বের দাবী, দীপ্ত যৌবনের অগ্নিশিখা বহন করে চললেন, ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে···

শ্লথগতি কংগ্রেসের ক্লান্ত সুরকে ছাপিয়ে উঠলো সুভাষচন্দ্রের এই নতুন নেতৃত্বের দাবীর বাণী···প্রত্যেক প্রদেশে তরুণেরা এলো ছুটে পুরাতন নেতৃত্ব-বিদ্রোহী সেই বিপ্লবধর্মী একক তীর্থ-পথিকের কাছে···

প্রৌঢ় কংগ্রেস তার মধ্যে দেখলো, কংগ্রেসের লাঞ্ছনা, কংগ্রেসের অবমাননা। তার দলীয় অন্তরে লাগলো কঠিন আঘাত। যতটুকু শাস্তি দেবার ক্ষমতা তার হাতে ছিল, তা প্রয়োগ করবার জন্যে অধীর হয়ে উঠলো। কংগ্রেস সভা করে, প্রস্তাব করে, সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করে দিল ; কংগ্রেসের কোন সংস্থানে নয়, এমন কি প্রদেশেও নয়, কোথাও এই দুর্ব্বিনীত কংগ্রেসদ্রোহীর স্থান হবে না। কিন্তু কংগ্রেসদ্রোহী মানে দেশদ্রোহী নয়, অনুত্তেজিত শান্ত কণ্ঠেই জানিয়ে দিলেন সুভাষচন্দ্র। বাঁচিয়ে রাখলেন দেশের যৌবন-ধর্ম্মকে।

এই ভাবেই যৌবন নিজেকে রাখে বাঁচিয়ে···ক্লান্তির বিরুদ্ধে, আপোষের বিরুদ্ধে, জরার বিরুদ্ধে, অকাল-সমাপ্তির বিরুদ্ধে।

নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতিত্ব তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন ; বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে তিনি বিতাড়িত হলেন।

কংগ্রেস এই অসহিষ্ণু বিধানের দ্বারা সেদিন নিজেই স্পষ্ট প্রমাণিত করলো, যৌবন থেকে সে এখন প্রৌঢ়ত্বে এসেছে···সামনেই বার্দ্ধক্য···

যথারীতি একদিন কংগ্রেসের দণ্ডাদেশ এলো,

···কংগ্রেসের নিয়ম ভঙ্গ করিবার অপরাধে তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র বসু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সদস্য পদে নিযুক্ত হইবার অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইতেছে···

সুভাষচন্দ্র ক্ষীণ হেসে বললেন, এই কি সব ? না আরো আছে ?

হয়ত সেদিন তাঁর মনের ভেতর তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন এ-ই সব নয়, আরো আছে ··কংগ্রেস যদি আরো শক্তি পায়, তাঁকে আরো শাস্তি দেবে....

সুভাষচন্দ্রের মধ্যে জেগে উঠলো আবার স্তিমিত বাংলা, জেগে উঠলো বাংলার দুরন্ত প্রাণ-বহ্নি, দুর্ব্বিনীত বিপ্লবী তাঁর নিজের পথে আবার ফিরে এলেন।

২৫

উনিশ শ' পাঁচ বাংলার যৌবনকে যে ক্ষাত্রবীর্য্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল, কংগ্রেসের অহিংসাবাদে তা বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

সুভাষচন্দ্র জীবনের প্রথম চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সেই নব-সন্তান-ধর্ম্মে নিজেকে দীক্ষিত করেন···তাঁর দীক্ষাগুরু বিবেকানন্দ আর শ্রীঅরবিন্দ....তাঁর শিক্ষাগুরু দেশবন্ধু···তিনি ছিলেন তাঁদের মানস-সন্তান···উত্তরাধিকারী। এবং উপযুক্ত সন্তান ও শিষ্যের মতন তিনি একান্ত নিষ্ঠাসহকারে জীবনের পবিত্রতম ধর্ম্মের মতন গুরুদের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন···নীরবে সেই আদর্শের অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে ছিল একটা বিরাট নিঃশব্দ প্রস্তুতি।

বিবেকানন্দ তাঁকে দিয়েছিলেন, তাঁর জীবনের, তাঁর চরিত্রের ভিত্তি, ব্রহ্মচর্য্য···যে সুকঠিন ব্রহ্মচর্য্য এনে দেয় দুর্ব্বার প্রাণশক্তি, অগ্নিতেজ, অখণ্ড বীর্য্য; দিয়েছিলেন তাঁকে জীবন-বোধ, এ জীবন মায়ের চরণে বলি-প্রদত্ত। শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছিলেন তাঁকে স্বাধীনতার আদর্শ, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ, ভারতীয়ত্ব, অসংখ্য শক্তির মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করবার বলিষ্ঠ বুদ্ধি ও চরিত্র। দেশবন্ধু দিয়ে গিয়েছিলেন, বাঙালীর প্রাণের বৈশিষ্ট্য, অনির্ব্বাণ প্রাণ-বহ্নির আশীর্ব্বাদ।

বাংলার এই তিনজন মহাপুরুষের দান লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে উঠতে থাকে। বিলুপ্ত-স্রোত বাংলার জীবন-জাহ্নবী আবার নতুন করে যেন তাঁর অঙ্গ ভেদ করে প্রবাহিত হলো। সুভাষচন্দ্র হয়ে উঠলো বাংলা। বাংলা বেঁচে উঠলো সুভাষচন্দ্রে।

নতুন যাত্রাপথে প্রথম নজর পড়লো, কলকাতার প্রকাশ্য রাজ-

পথে বিজয়ী ইংরেজের দম্ভ-প্রতীক হল্‌ওয়েল্‌ মনুমেণ্টের ওপর। বাংলার পরাজয়ের স্মৃতিচিহ্ন। বিলুপ্ত করে দিতে হবে সাম্রাজ্যবাদী দম্ভের এই প্রস্তর-লাঞ্ছনা।

. বাংলার ছেলেমেয়েদের ডাক দিলেন, শহরের বুক থেকে এই লাঞ্ছনার স্মৃতিকে সরিয়ে ফেলতে। বিদেশী সরকার তা সহ্য করলো না। আবার সেই ভারত-রক্ষা আইন…আবার অনির্দ্দিষ্ট কারাবাস…

কংগ্রেস দিল, নির্ব্বাসন; ইংরেজ দিল, অনির্দ্দিষ্ট কারাবাস। এই নিয়ে এগারো বার।

কারাবাস…জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি গিয়েছে সেখানকার পাথরে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে। কেড়ে নিয়েছে অস্থিমজ্জা থেকে রস। দিয়েছে রক্তের মধ্যে ব্যাধির কণিকা। একমাত্র আত্মসাধনার যোগ-ধর্ম্মে, নিশ্ছিদ্র ব্রহ্মচর্য্যে, নিজেকে রাখতে হয়েছে অটুট, সঞ্চয় করতে হয়েছে বীর্য্য।

সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ হলেন বটে কিন্তু হলওয়েল মনুমেণ্টকে ভাঙবার আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো। অবশেষে সরকারের সুবুদ্ধি হলো, বুঝলো, এই ধরণের জেদে বিপক্ষের শক্তিই বৃদ্ধি হয়। তাই রাতারাতি একদিন সরকারই সে-মনুমেণ্টকে সরিয়ে দিল। যে-কথা বলার জন্যে সুভাষচন্দ্রকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হলো, সরকার নিজেই তা কাজে পরিণত করলো কিন্তু কয়েদী তাতে মুক্তি পেলো না।

বারবার কারাগারে যাওয়া-আসায় কারাগারের বিভীষিকা আর কিছু ছিল না। কিন্তু মনের ভেতর তখন জেগে উঠেছে বিশ্ব-প্লাবন এক দুরন্ত দুরাকাঙ্ক্ষা…অন্তরের অন্তরতম স্থলে তিনি শুনেছেন এক মহা-আহ্বান, পার্থ সারথীর আহ্বান। থাকুক কংগ্রেস তার অংহিসা আর আপোষ-নীতি নিয়ে, তিনি একা বেরিয়ে পড়বেন বাহির বিশ্বে, সেখান থেকে তিনি শক্তি আর শস্ত্র সংগ্রহ করে ভারত-আক্রমণ করবেন, বিজয়ী বীরের মতন ভারতের মাটীতে প্রোথিত করবেন স্বাধীনতার পতাকা। কি করে, কেমন ভাবে তা সম্ভব হবে, আজ তা নিয়ে বিচার করতে বসে কোন লাভ নেই, অন্তরে যখন জেগেছে সেই দুরন্ত দুরাকাঙ্ক্ষা তখন নিশ্চয়ই অরণ্যের ভেতর থেকে খুঁজে পাবেন পথ…তার জন্যে আগে চাই, এই কারাগার থেকে মুক্তি।

কারাগারের প্রতিটী মুহূর্ত্ত জলন্ত লোহার মতন তাঁকে বিঁধতে থাকে। কারাগারের প্রতিটী মুহূর্ত্ত হলো অপচয়, ক্ষতি। প্রতি দিন যেন মৃত্যুর প্রহরী, অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে অমূল্য সময়কে ...যেমন করে হোক্ এ অপচয় নিবারণ করতে হবে...কারাগার থেকে বেরোতেই হবে...অন্তরে জেগেছে যে দুর্ব্বার বাসনা, তাকে দিতে হবে সার্থক মুক্তি। দূর মহাসমুদ্রের আহ্বান বেজে উঠেছে রক্তের তরঙ্গে...কারাগারের প্রস্তর-প্রাচীরের আড়ালে কি করে স্থাণু হয়ে বসে থাকতে পারেন তিনি ?

কিন্তু নির্ম্মম কারাগারের লৌহ-দ্বার...নিষ্করুণ সদাশঙ্কিত শাসকের অন্তর। কিন্তু মৃতু-ভয়কে যে উত্তীর্ণ হয়েছে, কে পারে তাকে কারাগারে রুদ্ধ করে রাখতে ? জরাগ্রস্ত রোগীর মতন অসহায় অপেক্ষায় তিল তিল ক'রে মৃত্যুর কাছে নিজেকে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে, তিনি স্থির করলেন, বীরের মতন এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বরণ করেই আনবেন। গ্রহণ করলেন, সত্যাগ্রহী বীরের শেষ-অস্ত্র, মৃত্যু-সঙ্কল্প। যদি অবিচারক শাস্তিদাতা স্বেচ্ছায় নিজের অন্যায় স্বীকার করে তাঁকে মুক্তি না দেয়, তাহলে নিজের মুক্তি তিনি নিজেই অর্জ্জন করবেন, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। মরবার স্বাধীনতা কেউ নিতে পারে না কেড়ে।

এই সংকল্প স্থির করে তিনি শাস্তিদাতা শাসকদের পত্র লিখে জানালেন...ঐতিহাসিক পত্র...যে পত্রের কালি কখনো শুকিয়ে যাবে না...কারণ যে-কালি দিয়ে এই জাতীয় চিঠি লেখা হয়, সে-কালি তৈরী হয় বীরের কলজে চোঁয়া রক্তে...সে রক্তের দাগ থেকে যায় অবিস্মরণীয় চিহ্ন-রূপে...প্রত্যেক বীরের আত্মাহুতিতে তার শুকনো দাগ আবার ওঠে রক্ত-রাঙা তাজা হয়ে...

"...এভাবে শুধু বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অবিচার আর অন্যায়ের সঙ্গে বারবার আপোষ ক'রে, নিজের অস্তিত্ব অপমানের মূল্যে কিনে বেঁচে থাকা আমার আদর্শের বিপরীত ধর্ম্ম। তাই স্থির করেছি, এই অপমানের মূল্য দিয়ে নিজের বেঁচে থাকাকে আর কিনতে চাই না। তাই স্বেচ্ছায় এই জীবন বিসর্জ্জন দিতে সংকল্প গ্রহণ করেছি। সরকার আমাকে অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগ ক'রে কারাগারে বন্দী করে রাখতে চান, তার প্রতিবাদ

আমি জানাচ্ছি, হয় আমাকে মুক্তি দাও, নতুবা আমার মুক্তি আমি নিজেই অর্জ্জন করবো…আমি বেঁচে থাকবো কি, থাকবো না, তার দায়িত্ব একান্ত আমার নিজের…

"আমি জানি, এই পৃথিবীতে যা কিছুই বস্তু, তা সবারই আছে মৃত্যু। জানি, মৃত্যু নেই স্বপ্নের, মৃত্যু নেই আদর্শের, মৃত্যু নেই মানুষের মনের। আমি হয়ত আমার স্বপ্নের জন্যে মরে যেতে পারি কিন্তু জানি আমার মৃত্যুর পরেও আমার সেই স্বপ্ন বেঁচে থাকবে, একদিন না একদিন তা সত্য হয়ে উঠবে শত সহস্র মানুষের জীবনে। এই বিশ্বাসের চেয়ে আনন্দ আর কি আছে? এই আনন্দের চেয়ে মানুষের কাম্য আর কি আছে? আমার আত্মা একদিন অনুরূপ শত শত আত্মায় জীবন্ত হয়ে উঠবে, আমার অসমাপ্ত কর্ম্মকে সার্থক সম্পূর্ণ করে তুলবে, এর চেয়ে বড় অভিজ্ঞান আর কি নিয়ে যেতে পারি?

"* * * ঠিক এই জন্যেই বিশ্ব-বিধাতা এই নশ্বর মানবদেহে আত্মার সংস্থান করেছেন * * * আমার মৃত্যু দিয়ে আমার জাতি বেঁচে উঠবে, সেই জীবন্ত জাতির মধ্যে আমিই বেঁচে থাকবো…"

এই চিঠির শেষে সত্যাগ্রহী জানিয়ে দিলেন, ২০শে নভেম্বর ১৯৪০, তিনি মৃত্যু-ব্রত আরম্ভ করবেন। এবং করলেনও তাই।

৯৬

ইংরেজ শাসকেরা জানতেন, এ চিঠি কোন ভাবপ্রবণ অথবা চতুর রাজনৈতিকের আত্ম-সুখ কেনবার ছল নয়, তবুও অভ্যস্ত আমলাতন্ত্র নীতিতে তাঁরা হঠাৎ শাদাকে শাদা বলতে পারেন না তার জন্যে তাঁদের বহু ভাবতে হয়, বহু ফাইল তৈরী করতে হয়। তাই নির্দ্দিষ্ট দিনে সংকল্প অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র অনশনব্রত আরম্ভ করলেন। দীর্ঘদিন রোগভোগের ফলে শরীর ভেঙ্গেই ছিল, তাই দুই-একদিনের অনশনের পর থেকেই মৃত্যু-লক্ষণ দেখা দিল। হৃদ্-স্পন্দন প্রায় থেমে এলো। জেলের ডাক্তাররা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

অগত্যা ৫ই ডিসেম্বর সরকার সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিলেন। রোগজীর্ণ অসাড় দেহ নিয়ে সুভাষচন্দ্র বাড়ী ফিরে এলেন। নিজের শয়নকক্ষে। বাড়ীর সকলকে, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে জানিয়ে

দিলেন, কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করেন, তিনি কারুর সঙ্গেই দেখাসাক্ষাৎ করবেন না, এমন কি এই ঘরের বাইরেও পদার্পণ করবেন না। তিনি নির্জ্জনে একা থাকতে চান। সম্পূর্ণ একা। প্রতিদিন মাত্র দরজার ফাঁক দিয়ে একজন ভৃত্য খাবারের পাত্র রেখে যাবে, আগের দিনের শূন্য পাত্র নিয়ে যাবে। নিঃশব্দে কোন কথা না উচ্চারণ করে। এবং ফল ছাড়া, আর কোন খাদ্যই তিনি গ্রহণ করবেন না। যোগীর পক্ষে দেহ-ধারণ করবার জন্যে যতটুকু মাত্র খাদ্য প্রয়োজন। বিশেষতঃ তখন রুগ্ন শরীরে ফলের রস ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ-যোগ্য ছিল না। কিন্তু শরীর সুস্থ হলেও, তিনি অন্য কোন খাদ্য আর গ্রহণ করবেন না। গভীর ধ্যানের মধ্যে তিনি নিজের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করতে চান।

দেখতে দেখতে এই কথা-সারা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। দোতলায় তাঁর ঘর বাড়ীর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো, তাঁর বাসনা মত বাড়ীর বা বাইরের কেউই তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন না।

লোকের মনে পড়লো, বালক কাল থেকে সন্ন্যাসের প্রতি, ধর্ম্ম-জীবনের প্রতি তাঁর স্বভাব-আনুগত্যের কথা। মনে পড়লো, প্রথম যৌবনের কৃচ্ছ্র সাধনের কথা, তীর্থে তীর্থে গুরুর সন্ধানে পরিভ্রমণ, যোগাভ্যাসের চেষ্টা, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য-পালনের কথা···

যুবকরা অতর্কিতে ফেল্লো দীর্ঘশ্বাস···কংগ্রেসের প্রৌঢ়ত্বে যারা তাঁর দিকে চেয়েছিল যৌবনের নব-জাগরণের আশায়, তারা ব্যথিত হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো এলগিন রোডের বাড়ীর দিকে। অন্তরের মধ্যে জেগে ওঠে সন্দেহ···সঙ্গে সঙ্গে তারা বিচার করে ফেলে দ্রুত···বাংলা দেশের মাটীর দোষ, রাজনৈতিকেরা তাঁদের অসমাপ্ত দায়িত্বের ত্রুটীকে সন্ন্যাসের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চান। সাধারণ মন পাটিগণিতের রুল্ অফ্ থ্রী্র সূত্র ধরে কষে ফেলে অনায়াসে সুভাষচন্দ্রের ক্লান্ত রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিণাম··· এলগিন্ রোডের বাড়ীর নিরুত্তর প্রতিবাদহীনতা জনতার সন্দেহকে ক্রমশ গাঢ় করে তোলে। ক্রমশ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, একজন দুজন করে শুধু গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীরাই সেই নিষিদ্ধ বেড়া ডিঙ্গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবার সুযোগ পেয়েছেন···

নৈষ্ঠিক সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষা নেবার জন্যেই তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। জনতার অনুমানের কোন প্রতিবাদই আসে না, সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে। জনতা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে, রাজনৈতিক জীবনের রূঢ় আঘাত আজ সুভাষচন্দ্রকে করেছে কর্ম্ম-বিমুখ···সন্ন্যাসী।

এই অনুমানকে সত্য বলে লালন-পালন করতে গভর্ণমেণ্টেরও ভাল লাগে। কিন্তু অন্য কেউ না জানলেও, গভর্ণমেণ্ট জানে বাংলার বিপ্লবীদলের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের অন্তরের যোগের কথা। তাই সারা এলগিন রোড ব্যেপে ঘুরে বেড়ায় গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচরেরা, সুভাষচন্দ্রের বাড়ীর সামনে দোতলার ঘরের দিকে চেয়ে অষ্ট-প্রহর বসে থাকে পাহারায় গুপ্তচর। তা ছাড়া, আর এক ব্যাপারে বড় মুস্কিল হয় গভর্ণমেণ্টের। তখনও সুভাষচন্দ্রের নামে আদালতে ঝুলছে দুটী মামলা। ব্যবসায়ী ইংরেজ-জাত হিসেবের গরমিল সহ্য করতে পারে না। জেলে থাকতেই সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট দুটী মামলা রুজু করে, রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে এবং তাঁর সম্পাদিত কাগজে রাজদ্রোহকর এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে। রীতিমত আদালতে শুনানীর দিন পড়ে কিন্তু শারীরিক কারণে সুভাষচন্দ্র আদালতে অনুপস্থিত থাকেন। তারিখের পর তারিখ বদলায়। সন্ন্যাসী যদি হতেই হয়, ইংরেজের আদালতের হিসেব মিটিয়ে দিয়েই তা হতে হবে।

৯৭

এলগিন্ রোডের বাড়ীর সামনে সরকারের চরেরা দেখে, দু' একজন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে আসে, বাড়ীর ভেতরে যায়, দেখা সাক্ষাৎ করে আবার মোটরে চলে যায়। রাস্তা থেকে তারা দোতলার ঘরের দিকে চেয়ে দেখে, চেয়ে দেখে সুভাচন্দ্রের ছায়া অভ্যস্তভাবে দেয়ালে আসছে যাচ্ছে। কায়া থাকে না। অতএব সেই ভ্রাম্যমান্ ছায়া তাদের জানিয়ে দেয়, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী পিঞ্জরেই আছে।

কয়েকজন বন্ধু এলেন দেখা করতে। প্রহরী চরেরা লক্ষ্য করে দেখে।

বন্ধুরা অবাক হয়ে দেখেন, সুভাষচন্দ্রের সুঢৌল মসৃণ মুখে

বিকশিত হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ একখানি দাড়ি। দাড়ির সঙ্গে সন্ন্যাসীর অবিচ্ছেদ্য যোগ। দাড়ি, যোগ-জীবনের প্রবেশ-পত্র। বিদায়ের মুখে হঠাৎ সুভাষচন্দ্রের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে, হয়ত এই শেষ দেখা।

আসন্ন-বিচ্ছেদ ব্যথায় ভারাতুর হয়ে ওঠে বন্ধুদের মন। না জানি, হিমালয়ের কোন্ কন্দরে, কোন্ দূরদুর্গম শৈলগুহায় প্রিয়তম বন্ধুর সন্ন্যাস জীবনের অন্তিম প্রহর যাপিত হবে। প্রস্তুত তিনি চরম মুক্তির জন্য…সে মহাআহ্বান থেকে কেউ পারবে না তাঁকে নিবৃত্ত করতে।

তার দু'একদিন পরে আবার আসে সেই দুজন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী, একজনের একগাল দাড়ি আর একজনের দাড়িবিহীন মসৃণ মুখ। চরেরা দেখলেই চিনতে পারে। দেখা করে যথারীতি মোটরে আবার তাঁরা চলে যান। আবার দেয়ালে নড়ে সেই অভ্যস্ত ছায়া।

পরের দিন আবার রাত্রির অন্ধকারে আসে মোটর করে সেই দুজন সন্ন্যাসী। গাড়ী থেকে নেমে তাঁরা বাড়ীর ভেতর চলে যান। কিছুক্ষণ পরে দেখা সাক্ষাৎ করে আবার দুজনে এসে গাড়ীতে বসেন। গাড়ী ছেড়ে দেয়। প্রহরী চরেরা দেখে, দেয়ালে সেই অভ্যস্ত ছায়া নড়ছে।

কিন্তু আজকের এই ছায়া যে-কায়ার সে-কায়া সুভাষচন্দ্রের নয়। সুভাষচন্দ্র চলে গিয়েছেন জাগ্রত প্রহরীদের সামনে দিয়েই মোটরে, যে-দুজন সন্ন্যাসী মোটর থেকে নেমে আজ বাড়ীর ভেতর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যিনি দাড়িওয়ালা তিনি সুভাষচন্দ্রের প্রক্সী দেবার জন্যে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং যে দুজন সন্ন্যাসী আজ গুপ্তচরদের চোখের সামনে মোটরে উঠে চলে গেলেন, তাঁদের মধ্যে যিনি দাড়িওয়ালা, তিনিই সুভাষচন্দ্র। গেরুয়া আর দাড়ি আর অভ্যস্ত যাওয়া আসার সুযোগে সুভাষচন্দ্র এলগিন রোড থেকে বেরিয়ে তখন দ্রুত ছুটে চলেছেন, অনির্দ্দিষ্ট দুরাকাঙ্ক্ষার দিকে।

ইতিমধ্যে দুদিন ধরে তাঁর প্রক্সী দেয়ালে ছায়ার খেলা দেখিয়ে এবং সুভাষচন্দ্রের নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ আর শূন্য বাসন প্রত্যর্পণ করে, প্রয়োজনীয় সময়টুকু গুপ্তচরদের দৃষ্টি সেই পক্ষীহীন পিঞ্জরের

দিকে আবদ্ধ করে রাখলেন। তারপর একদিন গৃহকে একেবারে শূন্য করে তিনিও গোপনে অন্তর্হিত হলেন। দরজার গোড়ায় খাদ্য অস্পৃষ্ট অবস্থায় পড়ে থাকে, দেয়ালে আর ছায়া নড়ে না। তখন সমগ্র ভারতবর্ষ পুলকিত বিস্ময়ে শুনলো, ইংরেজের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে সুভাষচন্দ্র অন্তর্হিত হয়েছেন। যখন এই সংবাদ জানা গেল, তখন মৌলভী জিয়াউদ্দীন পেশওয়ারের পথ ছাড়িয়ে জামরুদ কেল্লার পাশ দিয়ে কাঁচা সড়ক ধরে ভারতবর্ষের বাইরে, ইংরেজ-শৃঙ্খলের বাইরে যাত্রা করছেন।

১৮

এলগিন রোড থেকে মোটরে চল্লিশ মাইল দূরে এক রেলওয়ে ষ্টেশন। সেখান থেকে মৌলভীর ছদ্মবেশে উত্তর ভারতগামী ট্রেনে।

ট্রেণ ষ্টেশনে এসে থামলেই মৌলভী-সাহেব মুখের কাছে খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়ায় মনঃ সংযোগ করেন। পথে একজন শিখ ভদ্রলোক সেই কামরায় উঠলেন। বাধ্য হয়েই আলাপ পরিচয় করতে হয়। শিখ ভদ্রলোক পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। মৌলভী সাহেব বলেন, নাম জিয়াউদ্দীন, বীমাকোম্পানীর এজেন্ট, যাচ্ছি রাওয়ালপিণ্ডি।

১৭ই জানুয়ারী রাত নটায় ট্রেণ পেশোয়ারে এসে পৌঁছল। কলকাতা থেকে পেশোয়ার···ঘড়ির কাঁটার মতন সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করা হয়েছে···কখন, কি ভাবে এবং কাদের দ্বারা, তা আজও বিন্দু-বিসর্গ জানা যায় নি। আমাদের এলোমেলো অথবা সেন্‌টিমেন্‌টাল চারিত্রিক অব্যবস্থা আর কোলাহলের মধ্যে এই নিঃশব্দ বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতি আর সমাধি-স্থির আত্মগোপনতা, জাতীয় চরিত্রের এক বহু আকাঙ্ক্ষিত অভিব্যক্তির ইঙ্গিত বহন করে আনে। এলগিন্ রোডের বাড়ী হতে অন্তর্ধান থেকে সুরু করে নেতাজী যেদিন একা বার্মার পথে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন, এই স্বল্প জীবনটুকুর মধ্যে তিনি বাংলার তথা ভারতের তরুণদের সামনে তাঁর প্রত্যেকটী কথায়, কাজে, ব্যবহারে এবং আদর্শে যে নতুন চরিত্রের, যে নতুন জীবন-ভঙ্গীর, যে নতুন আচরণের বাস্তব মূর্ত্তিকে সত্য করে রেখে দিয়ে গেলেন তার মধ্যেই আছে নবীন ভারতের তরুণ পথযাত্রীর পথের নির্দ্দেশ। নবীন ভারতের নব-স্রষ্টা যুবকদের চরিত্রে যে যে উপাদান

থাকা প্রয়োজনীয়, তার একটা পূর্ণ-অভিব্যক্তি আমরা দেখলাম নেতাজীর জীবনের শেষ অধ্যায়ে।

সুভাষচন্দ্রের সেই প্রবাস-জীবনের স্বল্প আয়তনের মধ্যে তাঁর চরিত্রের যে বিস্ময়কর অভিব্যক্তি আমরা দেখলাম, সে-শুধু জগতের একজন শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার আত্ম-বিকাশ নয়, তার মধ্যে রয়ে গিয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনের অধিকাংশ বৃহৎ ত্রুটীর বাস্তব সংশোধন, আমরা যা হতে পারি, আমাদের যা হতে হবে, তার চারিত্রিক নির্দ্দেশ। সেই যৌবন-ধর্ম্মী বিপ্লবীর জীবনের শেষ ক'টা দিন, যেন ঝলকে আমাদের জাতীয় সম্ভাবনার পূর্ণরূপের একটা ইঙ্গিত দিয়ে গেল। আমাদের চরিত্রের মধ্যে যা কিছু ছিল সুপ্ত, যা কিছু ছিল বাঞ্ছিত, যা কিছু ছিল অপূর্ণ, তা যেন পূর্ণরূপ নিয়ে নেতাজীর সেই জীবন-কাব্যের শেষতম অধ্যায়ে অকস্মাৎ জেগে উঠলো।

পরিপূর্ণতার একটা বীজ পূর্ণ বিকশিত হয়ে জাতির সম্ভাবনার পূর্ব্বাভাস দিয়ে গেল।

শুধু লিরিকের উচ্ছ্বাস আর ক্ষণ-সৌন্দর্য্য নয়, এপিকের সুবিশাল আর সুগভীর নিত্য প্রভাবের মত রয়ে গেল নেতাজীর জীবনের এই শেষ ক'টা দিনের বিস্ময়।

স্বপ্নের মতন অলীক, বিস্ময়ের মতন সীমাহীন, গৌরীশঙ্করের গিরি-চূড়ার মতন সুদূর অলভ্য, তরুণ ভারত-পথিকের সামনে জ্বলছে, এই অপরূপ একজন বাঙ্গালীর আবির্ভাব এবং ততোধিক অপরূপ তাঁর তিরোভাব।

তা'তে মহাকাব্যের মূল্য আর মাধুরী দেবার জন্যেই যেন ভারত-ভাগ্য-বিধাতা তাকে স্বপ্ন আর রহস্যের অসমাপ্ততা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন।

২৯

পেশোয়ারে নেমেই আয়োজন মত লোকজনের সন্ধান পেলেন। ঘড়ির কাঁটা ধরে তাঁরা তাঁর জন্যে অপেক্ষায় ছিলেন। ষ্টেশনের বাইরে মোটরও প্রস্তুত ছিল।

জিয়াউদ্দীন সাহেবকে দুদিন পেশোয়ারে অপেক্ষা করে থাকতে হলো। এই দুদিনে ভারতবর্ষের বাইরে কাবুলে তাঁকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হলো।

পেশোয়ার থেকে কাবুল…পায়ে হাঁটা এই দীর্ঘপথ ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে কঠিন, সব চেয়ে বিপদসঙ্কুল, সব চেয়ে অজানা অতএব ভয়ঙ্কর পথ। এই পথ হলো ভারতবর্ষের ইতিহাসের রক্তবাহী প্রধানতম ধমনী। তার জলহীন তৃণহীন পার্ব্বত্য বিস্তারকে ঘিরে অদৃশ্য গুহায়, ঢিবির আড়ালে, পাহাড়ের পথের সংগোপন ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে আছে চিরমুক্ত পাহাড়ী উপজাতির দল, বন্দুক হাতে। বন্দুক তাদের শৈশবের খেলনা, তাদের ঘরে যখন শিশু জন্মায়, তখন সেই শিশু সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর যে-আওয়াজ শোনে, সে হচ্ছে বন্দুকের আওয়াজ, তিনবার বন্দুকের আওয়াজ করে, শাঁখ বাজিয়ে নয়, এই পাহাড়ী শিশুদের জন্মক্ষণে অভিনন্দিত করা হয়… তাদের হাতের বন্দুকের গুলি ব্যর্থ হয় না, তাদের পার্ব্বত্য নির্জ্জনতাকে অপবিত্র করবার কোন চেষ্টাকে তারা সহ্য করে না— শত চেষ্টায় ইংরেজ তাদের শৃঙ্খলিত করতে পারে নি।

তাই এই পথকে ইংরেজরাও অষ্টপ্রহর জেগে পাহারা দেয়—এই পথের প্রত্যেক ইঞ্চি নির্জ্জনতায় অদৃশ্যভাবে মৃত্যু তার জাল বিছিয়ে রেখেছে—এই পথেরই প্রত্যেক ইঞ্চি পায়ে হেঁটে পার হতে হবে।

এবং সেদিন যাঁরা সুভাষচন্দ্রকে এই পথ উত্তীর্ণ করে দেবার ভার নিয়েছিলেন, কতখানি নিপুণ আয়োজন তাঁদের করতে হয়েছিল এবং হয়েছিল একান্ত সংগোপনে—তার জন্যে উপজাতিদেরও সাহায্য নিতে হয়েছিল এবং তারা সানন্দে সেই সাহায্য দিয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তিগত রোমান্টিক অভিযানে সেদিন যাঁরা সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন, যাঁদের মাথা থেকে এই প্ল্যান বেরিয়েছিল এবং যাঁরা নিখুঁতভাবে তাকে কার্য্যে পরিণত করতে পেরেছিলেন, তাঁদের নাম বা পরিচয় আমরা আজও জানি না। জানতে পারতেন যাঁরা তাঁরা জানবার জন্যে কোন চেষ্টাই করলেন না…অন্তত কোন চেষ্টা যে হয়েচে তা আমরা জানি না। একটি নাম শুধু আমরা জানি, মনে হয় সেটিও ছদ্মনাম, স্বাধীনতার ইতিহাসের প্রত্যেক পাতা ছদ্মনামে ভরা…সুভাষচন্দ্রের এই ঐতিহাসিক অভিযানের প্রথম যাত্রাসহচর, পাঠান রহমৎ খাঁ।

পেশোয়ারে যে দুদিন ছিলেন, রহমৎ খানের সুবন্দোবস্তের ফলে তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেউ. কিছুই জানতে পারলো না। এতক্ষণ

জিয়াউদ্দীনের পরণে ছিল যুক্ত-প্রদেশের মুসলমান ভদ্রলোকের পোষাক। এখন থেকে তার পরিবর্ত্তে জিয়াউদ্দীন সাজলেন পাকা একজন পাঠান।

সঙ্গে রহমৎ খাঁন আর একজন বন্ধু, পেশোয়ার থেকে মোটরে তাঁরা যাত্রা করলেন। জামরুদ কেল্লা ছাড়িয়ে কিছু দূরে সুরু হলো কাঁচা সড়ক, মোটর যাবার আর উপায় নেই।

অগত্যা মোটর ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে সে-রাত্রি তাঁরা গার্হী বলে একটা ছোট গ্রামে গিয়ে উঠলেন। সেখানে রাত কাটিয়ে ভোর বেলা আবার তাঁরা হাঁটতে সুরু করলেন। গার্হী থেকে দলে নতুন দুজন পাঠানবন্ধু সঙ্গী হলেন, বন্দুক হাতে। পেশোয়ারের বন্ধুটি মোটর নিয়ে ফিরে গেলেন।

সারাদিন সেই পথহীন বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ হেঁটে সন্ধ্যার মুখে তাঁরা ভারতের সীমান্ত রেখা পার হয়ে এলেন···সামনেই উপজাতিদের দেশ। রাত্রিতে পথের ধারে আড্ডা শরীফ নামে আর একটি ছোট গাঁয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখানকার দরগার পীর সাদরে তাঁকে গ্রহণ করলেন। অবসন্ন দেহ সেই দরগার মসজিদে অঘোর নিদ্রায় মধ্যে রাত কেটে গেল।

বন্ধুর পথকে বিপ্লবী, বন্ধুর মতন আপন করে নিয়ে এগিয়ে চলে। পথ সাহায্য করে বিপ্লবীকে। সময় খুবই কম। তাই প্রত্যেক মুহূর্ত্তটিকে প্রয়োজনের মালায় গেঁথে নিতে হয়। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কণ্টকক্ষেত্র থেকে তাঁকে যাত্রা করতে হয়েছে, তাঁর সামনে লক্ষ্য, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-হীন মুক্ত এক ভারতবর্ষ। প্রচার, আন্দোলন, প্রস্তাব, আপোষ কিছুতেই এই মিলন দানা বাঁধে নি। প্রয়োজন-মত অবস্থার চাপে দুই সম্প্রদায় হয়ত কখনো এক হয়েছে কিন্তু সবাই জানে সেই মিলনের মধ্যে জেগে উঠে নি হৃদয়ের স্পন্দন। মারাঠা-শিখ-মুসলমান-হিন্দু সকলকে নিয়ে যে-ভারতবর্ষ, কে করবে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা? কোথায় আছে সেই ফরমুলা যা দিয়ে ভারত-ইতিহাসের এই মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদের পাষাণকে গলিয়ে এক-প্রাণ এক-জাতির রসায়ন উঠবে গড়ে?

পথ চলতে চলতে বিপ্লবী নিজের জীবন দিয়ে, প্রাণের অনুভূতি দিয়ে, হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন দিয়ে সেই মহা-আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটিকে

অসম্ভবের আকাশ থেকে জীবনের বাস্তব সত্যে রূপ দিয়ে চলেন। যে প্রাণের উত্তাপের অভাবে এই সমস্যার পাথর পাথর হয়েই ছিল, সুভাষচন্দ্র নিজের প্রাণ থেকে সেই উত্তাপকে বিকীরণ করে চলেন··· যার ফলে একদিন ঐন্দ্রজালিকের মতন তাঁর স্পর্শে ভারত-ইতিহাসে এই মর্ম্মান্তিক দুষ্ট ক্ষত ভেতর থেকে বিদূরিত হয়ে যায়, মন্ত্রের মতন হিন্দু-মুসলমান-শিখ-পাঠান মহাগৌরবে পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করে ওঠে, জয় হিন্দ্!

তাই দেখি, এলগিন রোডের বাড়ী থেকে যেদিন সুভাষচন্দ্র বেরুলেন, এই অনির্দ্দিষ্ট মহা-অভিযানে, সেদিন জিয়াউদ্দীন নাম গ্রহণ করা থেকে আরম্ভ করে তাঁর শেষতম যাত্রাসহচর হবিবুর রহমান পর্য্যন্ত তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি অভিব্যক্তির সঙ্গে এমন সহজ প্রীতি দিয়ে তিনি এই বিরোধের বিষকে নীলকণ্ঠের মতন আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন যে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে সেদিন তাঁর আবির্ভাব হয়ে ওঠে এই মিলনের জীবন্ত প্রতীক। ক্ষণকালের জন্যেও সেদিন তাঁর জীবনে যে সত্য মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল, আমরা বিশ্বাস করি, ভারত-ইতিহাসের সেইটেই সত্যরূপ—সেই বীজ—প্রাণবীজ—আজ না হোক, কাল না হোক, আর একদিন ভারতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আবার তা সত্য হয়ে উঠবে—

আড্ডা শরীফের মসজিদের ভেতর নিরুদ্বেগে ঘুমায় পৌত্তলিক হিন্দু···

১০০

আড্ডা শরীফের দরগার মসজিদে রাত প্রভাত হলো···

জিয়াউদ্দীন আর পথ-সহচর রহমৎ খাঁ সাখি সাহেবের দরগার পথে যাত্রা সুরু করলেন আবার···

কয়েক মাইল হাঁটার পর সামনে দেখা দিল কাবুল নদ···ওপারে স্বাধীন আফগানিস্থানের মাটী।

কিন্তু নদীতে পারাপারের নেই কোন নৌকা। কতকগুলো চামড়ার থলে একসঙ্গে বেঁধে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, সেই থলের ওপর বসে নদী পার হতে হবে। নিরুপায়।

সেই ভাসমান চামড়ার থলের ওপর বসে তীর্থযাত্রীরা নদী পার হলেন। দুর্গম তীর্থের পথ। দুর্গমতম স্বাধীনতার তীর্থের পথ।

এতদিন ধরে বন্দুক হাতে যে সব পাঠানবন্ধুরা তাঁর দেহরক্ষী হিসেবে এসেছিলেন, একদলের পর আর এক দল, কাবুল নদের এপার থেকেই তাদের শেষদল গেল ফিরে। কাবুল নদের ওপারে আফগানিস্থানের মাটীতে বন্দুক হাতে চলা নিষিদ্ধ।

কিন্তু নদীর ওপারে সামনেই ডাকা-র ঘাঁটী। সশস্ত্র প্রহরী অষ্ট-প্রহর সেখানে দিচ্ছে পাহারা। উপযুক্ত ছাড়পত্র না পেলে তারা দেবে না ঢুকতে কাবুলের পথে।

ডাকাকে এড়িয়ে যাবার আর একটী মাত্র পথ আছে। অতি দুর্গম পথ। অতি দীর্ঘ। তিন দিন সময় লাগে। নিরুপায়। সেই দূর দুর্গম পথ ধরেই ডাকা এড়িয়ে কাবুল যাবার রাস্তায় এসে পৌঁছুতে হলো।

তখন অপরাহ্ন। কাবুল যাবার পথের ধারে গাছতলায় শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। সেই পথ দিয়েই বাস যাতায়াত করে। বাসের অপেক্ষায় গাছতলায় শুয়ে পড়লেন। শ্রান্ত দেহ তন্দ্রায় ডুবে গেল। জেগে রইলো রহমৎ খাঁ...

জেগে থাকে রহমৎ খাঁ। কিছুক্ষণ পরে একটা বাস আসে। রহমৎ খাঁ দাঁড় করায়। বাসে তিলধারণের স্থান নেই। দরিদ্র মুসাফিরের কাতর প্রার্থনা গ্রাহ্য না করে বাস চলে যায়।

চলে যায় একটার পর একটা বাস। নিদ্রিত নেতাকে অকারণে জাগায় না রহমৎ. তবু যতটুকু বিশ্রাম নিতে পারে সেই ক্লান্ত দেহ। পথের ধারে ক্রমশ রাত্রি গভীর হয়ে আসে।

গভীর হয়ে আসে সেই জনহীন কাবুল রোডের শীতরাত্রির অন্ধকার। অবশেষে বহু মিনতির ফলে একটী বাসকে দাঁড় করায় রহমৎ। ডেকে তোলে জিয়াউদ্দীনকে।

জিয়াউদ্দীন ঘুম ভেঙ্গে দেখেন, গভীর অন্ধকারে সামনে দাঁড়িয়ে একটা বাস।

বিরক্ত তিক্ত কণ্ঠে বাসের চালক বলে, যদি যেতে হয়, তাহলে ওপরে ঐ বাক্স-পুঁটলীর ওপরে উঠে বস... ভেতরে জায়গা নেই।

বাসের ছাদের ওপর রাশীকৃত বাক্স আর পুঁটলী। পা রাখবার

জায়গা নেই, ধরে থাকবার কোন অবলম্বন নেই। নিতান্ত জিম্‌নাষ্টিকের ওস্তাদ ছাড়া সেখানে ব'সে চলন্ত বাসে কেউ যেতে পারে না। হয়ত পারে, যোগী...পারে, যোগীর মতন যার কঠিন মন।

বাসের চালক ষ্টার্ট দেয়, হেঁকে বলে, আর এক সেকেণ্ড আমি দাঁড়াবো না, উঠতে হও ওঠো, নইলে চল্লাম।

অগত্যা উঠতে হয়। কোন রকমে সেই পুঁটলীর ওপর দুজনে গিয়ে বসেন। বাস আবার ছুটতে আরম্ভ করে। বাতাসের সঙ্গে গলে গলে পড়ছে তুষারের কণা। বাস যত দ্রুত চলে, তত তীব্র শাণিত হয়ে ওঠে তুষার বায়ু। গায়ে কোন গরম কাপড় নেই। সামান্য পাতলা আবরণ হিমে ভিজে ওঠে। চামড়া ভেদ ক'রে বাতাস হাড়ে গিয়ে লাগে। চোখ চেয়ে থাকা অসম্ভব। সূঁচের মতন এসে বেঁধে হাওয়া। চোখ বন্ধ করে থাকতে হয়। হঠাৎ পথের ধারের বৃহৎ কোন গাছের অবনত শাখা অন্ধকারে সজোরে এসে লাগে মাথায়। চোখ চাইতেই হয়। নইলে গাছের ডালের ধাক্কায় পড়ে যেতে হবে চলন্ত বাস থেকে। অন্ধকারে সামনে চেয়ে থাকতে হয়, কখন এসে পড়ে গাছ। মাথা নুইয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে হয়। অবশ হয়ে আসে দৃষ্টি। কত দূরে এই পথের শেষ? কত দূরে আর রাত-প্রভাত?

রাত প্রভাত হলো বাট্‌বাকে। কাবুলের দরজা। এখানেও সশস্ত্র প্রহরী। ছাড়পত্রের হাঙ্গামা। ছাড়পত্র অথবা ঘুষ।

রাত্রিতে নিঃশব্দে তীর্থযাত্রীরা করে রাখে তার একটা বন্দোবস্ত। বাস থেকে নেমে রহমৎ খাঁ দেখায় লালপুরার শেখের চিঠি। জিয়াউদ্দীনকে দেখিয়ে বলে, আমার বড় ভাই, বোবা, কালা।

কালার অভিনয় করা শক্ত নয়। কিন্তু বড় কঠিন বোবার অভিনয়। বিশেষত তার, কথা যার নিঃশ্বাস। কিন্তু শব্দের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে, সুভাষচন্দ্র করেছিলেন নিঃশব্দতারও সাধনা। কাজে লাগে আজ।

বাট্‌ঘাক্ ছেড়ে বাস আবার চলতে আরম্ভ করে। বিকেল বেলা বাস এসে পৌঁছলো কাবুলে। শেষ হলো পথের একটা বাঁক।

১০১

বাস থেকে যখন নামলেন, তখন ঘনায়মান অন্ধকারে পড়েছে তুষার। সারারাত্রি অনাবৃত আকাশের তলায় কেটে গিয়েছে এই তুষারের সঙ্গে সংগ্রামে। দেহে নেই বিন্দুমাত্র অনুভূতি, অসাড়। জেগে আছে শুধু মন। তারি আগুনে জেগে আছে দেহ।

বরফে পথের ধূলো হয়ে গিয়েছে কাদা। তুষারের কাদা। তারই ভেতর দিয়ে অবশ পা এগিয়ে চলে।

রহমৎ খাঁ একজন পথযাত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে বাজারের কাছে এক সরাইখানার সন্ধান বার করে। সেখানে গিয়ে দেখে একটা ছোট্ট ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ী…চারিদিকে জঞ্জাল, আর তীব্র দুর্গন্ধ। সামনে কতকগুলো উট আর ঘোড়া বাঁধা। গাড়োয়ানদের আস্তাবল বিশেষ। সেইটেই সরাইখানা।

অনেক খোসামোদের পর লেফ ছেড়ে চৌকিদার উঠে আসে। একটা অন্ধকার কুঠরী খুলে দেয়। সেই একটা কুঠরীই খালি আছে। বাইরে থেকে তার ভেতরে কিছুই দেখা যায় না। একটা অন্ধকার গর্ত্ত। তীব্র হিমেল বাষ্প ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে।

অন্ধকারে তীর্থযাত্রীরা সেই হিম-গর্ত্তের ভেতরই আশ্রয় নিলেন। মাটিতে পা দিতেই অনুভবে বুঝলেন, সমস্ত মেঝে হিমে ভিজে রয়েছে। চৌকিদারকে দিয়ে দুটো খড়ের বিছানা জোগাড় হলো। কিন্তু সেই হিমে রাত কাটানো অসম্ভব। শিরায় রক্ত বুঝি জ'মে আসছে।

বহুকষ্টে কিছু কাঠ জোগাড় হলো। কিন্তু ভিজে কাঠ। আগুনের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গর্ত্ত ধোঁয়ায় ভরে দিল। জানালা নেই। ধোঁয়া বেরুবার একমাত্র পথ দরজা। কিন্তু দরজা খুললে বাইরে থেকে ছুটে আসে তুষার-ভরা পাগলা বাতাস। দরজা বন্ধ করলে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে ধোঁয়ায়।

রহমৎ খাঁ এবার নিজে বেরিয়ে কিছু শুকনো কাঠ নিয়ে এলো। সঙ্গে নিয়ে এলো একটা মোমবাতি…আলো; শুকনো কাবুলী রুটি আর শুকনো মাংস…খাদ্য।

রুটি খেতে গিয়ে জিয়াউদ্দীন দেখলেন, দাঁত অপারগ, সে রুটিকে আয়ত্ত করবার ক্ষমতা তাঁর দাঁতে নেই…কাবাবের মাংস কোন্ জন্তুর

তা বোঝবারও কোন উপায় নেই…কোন রকমে চায়ে ভিজিয়ে খানিকটা রুটি গলাধঃকরণ করলেন মাত্র। তারপর সেই খড়ের বিছানায় অঙ্গ এলিয়ে দিলেন। মাতৃ-স্নেহের মতন সুনিবিড় নিদ্রা নিমেষে কেড়ে নিলো সব ক্লান্তি…নিদ্রার ঘন বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে গেল স্থানকালপাত্রের সব রূঢ় বাস্তবতা…

১০২

দু'দিন সেই আস্তাবলের সরাইখানায় জিয়াউদ্দীন বন্দীর মত গর্ত্তের ভিতর বসে থাকেন…বোবা, কালা…

সেই গর্ত্ত থেকে এক পাও বাইরে বেরুতে পারেন না…

বিপ্লবের সাধনা যোগের সাধনা। হিন্দুরা সন্ধান পেয়েছিল মানুষের মনের সেই অসাধারণ ক্ষমতার যার বলে, সব রকম বাস্তবতার উর্দ্ধে মানুষ নিজেকে তুলতে পারে। তার সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম হলো, সেই মনের অনুশীলন। যোগ তারই নাম। পাশ্চাত্য সাইকলজী যার বর্ণ-পরিচয় মাত্র। সে-বিজ্ঞানের সন্ধান আজও পায় নি য়ুরোপ আর আমেরিকা। নীরবে বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র করেছিলেন সেই অনুশীলন। আদর্শ বিপ্লবীর নতুনতর সাধনা! সে-বিপ্লবীকে য়ুরোপ এখনো দেখেনি। আমরা দেখেছি। দেখেছি বিপ্লবী অরবিন্দকে। দেখলাম নেতাজীকে। বিপ্লবের ইতিহাসে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান।

বাইরে ঘুরে বেড়ায় রহমৎ খাঁ সুযোগের সন্ধানে। কাবুলে আসা পর্য্যন্ত ছিল একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা। তারপরই অনির্দিষ্ট অন্ধকার…নিবিড় অরণ্যের ভেতর থেকে পথ খুঁজে বার করা।

নতুন লোক…বাজারে ঘোরাফেরা করতেই নজরে পড়ে সি. আই. ডি.র।

একদিন সরাইখানার গর্ত্তে তাঁরা বিশ্রাম করছেন, এমন সময় সি. আই. ডি. এসে উপস্থিত।

রীতিমত চড়ামেজাজে পুস্তুতে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কে? কি মতলবে এখানে এসেছ?

রহমৎ খাঁ পুস্তু জানতো। উত্তর দেয়, মুসাফির…তীর্থযাত্রী…

সি. আই. ডি.র দৃষ্টি পড়ে মৌনী দ্বিতীয় ব্যক্তিটির ওপর।

আগে থাকতেই রহমৎ খাঁ জানিয়ে দেয়, আমার বড় ভাই।

আহা, বেচারা বোবা, কালা···ওর জন্যেই সাখি সাহেবের দরগায় যাচ্ছি···শুনলুম বরফে দরগা-যাবার পথ বন্ধ···তাই বাসের অপেক্ষায় বসে আছি।

মহাপ্রভু গর্জ্জে ওঠেন, ওসব ধাপ্পা রেখে দাও। ভালমানুষের মত উঠে এসো দেখি কোতয়ালিতে।

রহমৎ খাঁ করুণকণ্ঠে অনুনয় জানায়, কেন গরীব মুসাফিরদের হায়রাণ করতে চাইছো ভাই। তাছাড়া আমার দাদা শীতে একেবারে জখম হয়ে গিয়েছে···হাঁটতেই পারছে না···একটু দয়ামায়া নেই তোমার ?

দয়ামায়ায় গলবে এমন ধাতু নয়, সি. আই. ডি। তাদের গলাবার এসিড আলাদা। নাছোড়বান্দা, যেতেই হবে কোতোয়ালি!

অগত্যা রহমৎ খাঁ তেড়ে ওঠে, বেশ, চলো কোতোয়ালিতে···আমি একাই যাচ্ছি···উনি অসুস্থ, উনি তো আর এখন যেতে পারছেন না!

গরম সুরে খানিকটা কাজ হলো। মহাপ্রভু কিঞ্চিৎ দয়া দেখিয়ে বল্লেন, আচ্ছা, আজ ছেড়ে দিলাম তোমাদের। তবে, শিগ্‌গির শিগ্‌গির সরে পড় এখান থেকে, বুঝলে ? আজ বড় ঠাণ্ডা পড়েছে, দাও তো কিছু, চা খাবো।

ওষুধ ধরেছে দেখে, রহমৎ খাঁ তাড়াতাড়ি একখানা দশটাকার নোট মহাপ্রভুর হাতে গুঁজে দেয়। সেদিনকার মত তিনি বিদায় নিলেন।

কিন্তু তিনদিন বাদে আবার ফিরে এলেন। তখন জিয়াউদ্দীন সাহেব একাই বসে আছেন। রহমৎ খাঁ তখনও ফেরেনি।

জিয়াউদ্দীন সাহেব ইঙ্গিতে হাত নেড়ে জানালেন, রহমৎ খাঁ বাইরে গিয়েছে।

মহাপ্রভু নানারকমভাবে কালা-বোবাকে পরখ করে দেখতে চেষ্টা করে।

এমন সময় রহমৎ খাঁ এসে হাজির হয়। তাকে দেখেই মহাপ্রভু ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলেন, কি হে, সাখি সাহেবের দরগার পথ এখনো কি বন্ধ ?

রহমৎ খাঁ বলে, আরে ভাই, বাস পেলে কি আর এখানে বসে থাকি।

রহমৎ খাঁ ভাবতে পারে নি যে সি. আই. ডি. প্রভু আজ বাসের খবর নিয়েই এখানে এসেছে। মহাপ্রভু হেসে বলে উঠলেন, আমি এই মাত্র বাস ষ্টাণ্ড থেকে খবর নিয়ে আসছি। ও সব বুজরুকী ছেড়ে দাও!

রহমৎ খাঁ আর কোন কথা না বলে আর একখানি নোট মহাপ্রভুর হাতে গুঁজে দেয়। মুখে মাংস পড়লে কুকুর আর ডাকে না। মহাপ্রভু ফিরে যান।

জিয়াউদ্দীন বলেন, আর নয়, এ কুকুরটা লোভ পেয়ে গিয়েছে, এর হাত এড়াতেই হবে। তুমি উত্তমচাঁদের কথা আমাকে বলেছিলে···যেমন করে পার, সেই উত্তমচাঁদেরই খোঁজ নাও, তারপর যা হয় দেখা যাবে···নইলে এখানে আর কিছুদিন থাকলেই গ্রেফতার হয়ে যেতে হবে···

১০৩

তখন ফেব্রুয়ারী মাস। কাবুলে নিদারুণ শীত। ভোরবেলা থেকেই প্যাঁজা তুলোর মতন বরফ পড়েছে। পথঘাট, বাড়ীর ছাদ সব বরফে শাদা হয়ে গিয়েছে।

পথের ধারে এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর দোকান। দোকানের মালিক উত্তমচাঁদ, পেশায়োয়ের অধিবাসী কিন্তু কাবুলে এসে বসবাস স্থাপন করেছেন।

সকাল বেলা দোকান-ঘরে বসে উত্তমচাঁদ খবরের কাগজ পড়ছেন। ভারতবর্ষের খবরের কাগজ। প্রত্যেক কাগজে তখন বড় বড় হরফে একটি মাত্র সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে, বৃটীশের সমস্ত সতর্ক পাহারা এড়িয়ে সুভাষচন্দ্র অন্তর্দ্ধান করেছেন···

যৌবনের প্রথম জাগরণে উত্তমচাঁদও একদিন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন···যদিও আজ রাজনীতি থেকে দূরে, ব্যবসার হিসেবের খাতায় মনঃসংযোগ করেছেন, তবুও মনের ভেতর যৌবনের সেই দেশ-প্রেমের শিখা নিভে যায় নি একেবারে···সুভাষচন্দ্রের সেই অন্তর্দ্ধান-কাহিনী পড়তে পড়তে আনন্দে আর গর্ব্বে ফুলে ওঠে বুক···

একান্ত নিষ্ঠাসহকারে তন্ন তন্ন করে পড়েন প্রত্যেকটী খবর ·· কোথায় সুভাষচন্দ্র? চারদিকে বৃটিশের গুপ্তচরেরা সজাগভাবে

খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁকে···কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁর গতিবিধির কোন সংবাদই পায় নি পুলিস···

দোকানের বাইরে আজ পথ একেবারে নির্জ্জন···নীরবে পড়ছে ঘন তুষার···লোকজনের চলাচল নেই বল্লেই হয়···

এমন সময় এক পাঠান তরুণ দোকানে প্রবেশ করে অভিবাদন জ্ঞাপন করে উঠলো, আ সালাম আলাইকুম্·····

খবরের কাগজ সরিয়ে রেখে উত্তমচাঁদ প্রত্যভিবাদন জানিয়ে বল্লেন, বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি ?

আগন্তুক কাছে এসে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করে, আপনিই কি উত্তমচাঁদ ?

—হাঁ। বলুন, কি দরকার আপনার ? দোকানের বালক ভৃত্য অমরনাথকে ইঙ্গিত করতে, সে আগন্তুকের জন্যে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। আগন্তুক তাতে বসলো কিন্তু উত্তমচাঁদের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে নীরব হয়েই রইলো।

কয়েক মিনিট এমনি নীরবেই কেটে যায়। কৌতূহলী হয়ে উত্তমচাঁদ আবার বলেন, বলুন, আপনার কি দরকার ?

আগন্তুক চোখের ইঙ্গিতে অমরনাথকে দেখায়। উত্তমচাঁদ বুঝতে পারেন। অমরনাথকে চা আনতে বাইরে পাঠিয়ে দেন।

—এবার বলুন, আপনার কি দরকার ?

আগন্তুক বলে, আমি ভারতবাসী···এটা আমার ছদ্মবেশ···বড় মুসকিলে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

উত্তমচাঁদের কৌতূহল বেড়ে ওঠে, কে আপনি ? আমার নামই বা জানলেন কি করে ?

ছদ্মবেশী তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, আমার নাম ভগৎরাম···আপনি যে নওজোয়ান সভার সেক্রেটারী ছিলেন, আমি ছিলাম তার সদস্য···পাঞ্জাবের গভর্ণরকে গুলি করবার কথা নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যান নি। আমার ভাই-ই···

উত্তমচাঁদ উঠে ছদ্মবেশী আগন্তুককে আলিঙ্গন করেন। ফিরে আসে যৌবনদিনের সব স্মৃতি··মুক্তি-পথের যাত্রীর অবিস্মরণীয় স্মৃতি···

বলেন, কিন্তু আজ, এখানে কি দরকার···?

আগন্তুক কোন ভূমিকা না করে সোজা বলে ওঠে, আমি সুভাষ বোসকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এখানকার সীমান্ত পেরিয়ে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় যাবেন…

—সুভাষ বোস? এখানে?

উত্তমচাঁদের সারা অঙ্গ মুহূর্ত্তের মধ্যে কেঁপে ওঠে। এমন অসম্ভব রূপকথা কি জীবনে সত্য হয়?

অমরনাথ চা নিয়ে প্রবেশ করে।

নীরবে দুজনে চায়ের পাত্র মুখে তুলে নেয়। উত্তমচাঁদ একটা কাজের ভার দিয়ে অমরনাথকে আবার বাইরে পাঠিয়ে দেন।

আগন্তুক ধীরে ধীরে সমস্ত কাহিনী উত্তমচাঁদকে জানায়। সরাইখানায় থেকে সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে রাশিয়ার এ্যাম্বাসীর লোকদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করবার· কিন্তু কোন সুবিধাই জোটে নি। ইতিমধ্যে পুলিসের উৎপাত…সরাইখানার অসম্ভব কষ্ট… যেমন করে হোক্ বোস্ বাবুকে এক্ষুনি সরাইখানা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে…বোসবাবু তাই আপনার কাছে পাঠিয়েছেন…আপনি তাঁকে আশ্রয় দিতে পারেন কি না?

জীবনে কোনদিন যে এমন কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, উত্তমচাঁদের সুদূরতম কল্পনায় তা ছিল না। সুভাষ বোসকে আশ্রয় দেওয়া মানে…সমগ্র বৃটীশ আক্রোশের সামনে মুখোমুখী দাঁড়ানো…একেবারে অন্ধকার গহ্বর থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সর্ব্বোচ্চ শিখরে…একটা যুগের দায়িত্ব মাথায় তুলে নেওয়া…একটা অমূল্য জীবন, নিদারুণ একটা ভবিতব্যতা, বিশ্বদাহী একটা অগ্নি-কুণ্ড, বিনা প্রস্তুতিতে নিজের করতলে তুলে নেওয়া…এবং তার মূল্য, হয়ত মৃত্যু…ফাঁসীর মঞ্চ…

আগন্তুক বলে, দেরী করবার আর সময় নেই…

উত্তমচাঁদ বলেন, একটা দিন সময় দিন!

আগন্তুক সেদিন ফিরে যায়। যাবার সময় জানিয়ে গেল, আমি রহমৎ খাঁন, বোস্ বাবু আমার বড় ভাই, জিয়াউদ্দীন…

উত্তমচাঁদ বাড়ী ফিরে আসেন। বাড়ীর ঘর-দোর ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেন। বিহ্বল দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখেন।

চেয়ে দেখেন, অদূর ভবিষ্যতের দিকে, মৃত্যুর আতঙ্কে ঝাপসা...

দরজায় কে যেন কড়া নাড়ে, দরজা খোলো, দরজা খোলো, বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তোমার দেশ, তোমার জাতি...তোমার ইতিহাস...এমন লগ্নকে ব্যর্থ হতে দিয়ো না...

১০৪

উত্তমচাঁদ দরজা খুলে দিলেন।

একদিন পরে বিকেলবেলা রহমৎ খাঁর সঙ্গে জিয়াউদ্দীন এসে উঠলেন উত্তমচাঁদের বাড়ী...কাকপক্ষী জানতে পারলো না।

হঠাৎ বাড়ীর ভেতরে সম্পূর্ণ অজানা তুজন মুসলমানকে দেখে উত্তমচাঁদের স্ত্রী আতঙ্কিত বিহ্বল হয়ে উঠলেন। হিন্দু মধ্যবিত্ত ঘরের অতি সাধারণ অন্তঃপুরচারিকা। তাঁর পক্ষে এ ব্যাপার সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠলো।

স্বামীকে নিভৃতে পেয়েই রুক্ষকণ্ঠে তিনি প্রতিবাদ করে উঠলেন, এ কি ব্যাপার?

উত্তমচাঁদ বলেন, লাগমান থেকে এসেছেন...আমার বিশেষ জানা লোক...তু'চার দিন অতিথি হয়ে থাকবেন...

—তু'চার দিন থাকবেন...এই বাড়ীতে? আর আমি একলা তুজন অপরিচিত মুসলমানের সঙ্গে এই বাড়ীতে বাস করবো?

উত্তমচাঁদ আশ্বাস দিয়ে বলেন, তুমি বিশ্বাস কর, ওঁরা মুসলমান নন্!

ভদ্রমহিলার মনে সমস্ত ব্যাপারটা যেন আরো গুলিয়ে ওঠে।

গম্ভীরভাবে বলেন, তোমার যা প্রাণ যায় তাই তুমি কর কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি আসল ব্যাপার আমার কাছে লুকোতে চাইছো!

তুদিন কোন রকমে কেটে গেল। তৃতীয় দিন উত্তমচাঁদের স্ত্রী রীতিমত বিদ্রোহিনী হয়ে উঠলেন। চীৎকার করে জানিয়ে দিলেন,

—এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না...

উত্তমচাঁদ লজ্জিত হয়ে বলেন, আহা চেঁচিয়ো না!

—চেঁচাবো না কেন? নিশ্চয়ই চেঁচাবো। বাড়ীর ভেতর এ কি অসম্ভব কাণ্ড! কে ঐ লোক তুটো? রাতদিন ঘরের ভেতর বসে থাকে? এ আর আমি সহ্য করবো না!

—তা হলে শোন বলি।

উত্তমচাঁদ স্ত্রীকে সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত জানালেন। ভয়ে ভদ্র-মহিলার মুখ পাংশু হয়ে গেল।—কি সর্ব্বনাশ! যদি পুলিসের লোকে জানতে পারে?

উত্তমচাঁদ বলেন, যাতে কাক-পক্ষীও না জানতে পারে, আমাদের সেই চেষ্টা করতে হবে···যখন তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি···তখন প্রাণ দিয়েও আমাদের দেখতে হবে, যাতে তাঁর বিপদ না হয়!

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে, স্বামীর কথা শুনে, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে-নারীর কণ্ঠস্বর বদলে যায়···মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই ভীত সন্ত্রস্ত সংস্কার-অন্ধ অনভিজ্ঞ নারীর মধ্যে জেগে ওঠে, বিনা-চেষ্টায়, তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ভারত-নারীর ঐতিহাসিক সত্তা···শতাব্দীর পর শতাব্দী যার মূক জীবনের নিঃশব্দ বীরত্ব পুত্রের প্রয়োজনে, স্বামীর প্রয়োজনে, ভ্রাতার প্রয়োজনে, বিনা আড়ম্বরে বিনা প্রশ্নে ইন্দ্রাণীর দুর্লভ মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনের জীবনে যে অতি-সাধারণী, নগণ্যা, নিমেষের আহ্বানে সে হয়ে ওঠে অনন্যা, অসাধারণ শক্তির আধার। জগতে অলিখিত রয়ে গিয়েছে অতি-সাধারণ অশিক্ষিতা ভারত-নারীর প্রতিদিনের জীবনের নিঃশব্দ বীরত্বের কাহিনী।

স্বামীর কথায় নতশিরে নারী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে প্রণাম জানান। স্বামীকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, সত্যি, ভগবানের অসীম দয়া যে তাঁর মতন লোক আজ আমাদের অতিথি হয়েছেন! তুমি ভেবো না, তাঁর জন্য যদি প্রাণ দিতে হয়, তাও দিতে আমি কুণ্ঠিত হবো না!

পথশ্রান্ত বিপ্লবীকে আচ্ছাদন করে রইলো, পক্ষী-মাতার মত সদা-আতঙ্কিত স্নেহে মমতাময়ী নারী···জননী···

যে-মূর্ত্তিতে বিপ্লবী দেখেছিল নিখিল নারীকে···

১০৫

আয়োজন হয়েছিল কলকাতা থেকে কাবুলের মাটীতে পৌঁছান পর্য্যন্ত। সে-আয়োজনের মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। কিন্তু তারপর থেকে সব ছিল হাওয়ায়, অগঠিত, অনিশ্চিত···

সুভাষচন্দ্র বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন সংকল্প করে, কাবুলে

সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ক'রে রাশিয়ায় যাবেন…

কিন্তু কাবুলে এসে বুঝলেন, রুশ এ্যাম্বাসীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করা দুরূহ ব্যাপার। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে যা সম্ভব আর সহজ, জিয়াউদ্দীনের পক্ষে তা সম্ভব নয়। একে ছদ্মবেশ…তার ওপর প্রতিমুহূর্তে ধরা পড়বার আশঙ্কা…ইতিমধ্যেই পিছু নিয়েছে গুপ্ত-চর…একটা মুহূর্তের ভুলে নষ্ট হয়ে যাবে সমস্ত জীবনের পরিকল্পনা…

অঙ্ক-কষা নিখুঁত পরিকল্পনার মধ্যেও থেকে যায় সংগোপন ফাঁক …অনির্দিষ্টের হয় না কোন মানচিত্র…

রুষ-এ্যাম্বাসীর সঙ্গে যোগস্থাপন করতে হলে রুষ-ভাষা-জানা একজন লোকের দরকার…লোক বলতে একমাত্র রহমৎ খাঁ…

একটা ভুল ধারণার জন্যে এই বিপত্তি ঘটলো। এ্যাম্বাসী সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের ধারণা ছিল, সেখানে অবাধে যে কোন লোক গিয়ে দেখা করতে পারে, য়ুরোপে তাই দেখে এসেছিলেন। কিন্তু কাবুলে এসে দেখলেন, প্রত্যেক বিদেশী রাষ্ট্রের এ্যামবেসীর দরজা আগলে সশস্ত্র আফগান-প্রহরী…কে, কেন ও কি, প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দিয়ে প্রহরীকে সন্তুষ্ট করে তবে ভেতরে ঢোকবার অনুমতি পাওয়া যাবে। সে ঝুঁকি নেওয়া জিয়াউদ্দীনের পক্ষে অসম্ভব। অতএব সে-পথ রুদ্ধ।

একমাত্র পথ, যখন এ্যাম্বাসীর ভেতর থেকে গাড়ীতে রাষ্ট্রদূত বাইরে বেরুবেন, তখন পথে তাঁকে ধরা…

দিনের পর দিন রাস্তার ধারে সেই গাড়ীর অপেক্ষায় দুজনে ঘুরে বেড়ান…বাইরে বেশীক্ষণ এইভাবে ঘোরাফেরা করাও বিপজ্জনক…

অবশেষে একদিন রহমৎ খাঁ, কাস্তে আর হাতুড়ি-মার্কা লাল পতাকাওয়ালা একটা গাড়ীকে আটকালো…ভাঙ্গা ভাঙ্গা পার্সীতে রহমৎ খাঁ গাড়ীর আরোহীকে জানালো, সুভাষ বোস তাঁর সাহায্য চান, মস্কো যাবার জন্যে!

গাড়ীর আরোহী বল্লেন, সুভাষ বোস? কোথায় তিনি?

রহমৎ খাঁ আঙুল দিয়ে দেখায়, রাস্তার ওপারে দূরে একজন নিরীহ পাঠান ঘুরে বেড়াচ্ছে....

—উনিই সুভাষ বোস।

আরোহী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তার প্রমাণ কি?

এ প্রশ্নের জন্যে রহমৎ খাঁ প্রস্তুত ছিল না। উত্তরের উপযুক্ত পার্সী ভাষাও খুঁজে পেলো না। গাড়ী চলে গেল।

ইতিহাসের একটা দামী লগ্ন পিছলে পড়ে গেল...

সুভাষচন্দ্র বুঝলেন, আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়। মস্কোতে সোজা যদি যেতে না পারেন, রোম বা বার্লিন হয়ে যাবেন।

রহমৎ খাঁকে ইতালীয়ান্ এ্যামবাসীতে পাঠালেন।

কপাল ঠুকে রহমৎ খাঁ ঘাড় সোজা করে ইতালীয়ান্ এ্যাম্‌বাসীর ভেতর ঢুকে পড়ে। দরজায় আফগান প্রহরী হেঁকে দাঁড় করায়।

কে তুমি?

রহমৎ গম্ভীরভাবে জানায়, জাপানী দূতাবাসের চৌকীদার, নতুন নিযুক্ত হয়েছি,...চিঠি নিয়ে এসেছি....

প্রহরী সন্দেহ করে না। ছেড়ে দেয়।

রহমৎ খাঁ ভেতরে গিয়ে দূতাবাসের কর্ত্তা সিনোর করোনির সঙ্গে দেখা করে। সব কথা খুলে বলে। করোনি আশ্বাস দেয়, আমি আজই বার্লিন আর রোমে খবর পাঠাচ্ছি...সেখানকার অনুমোদনের জন্যে...

ব্যবস্থা ঠিক হলো, কাবুলে হের টমাসের দোকান আছে। দোকানটা বাইরের চেহারা, ভেতরে চলে কূটনৈতিক কারবার। সেইখানেই খবরাখবর পাওয়া যাবে, হের টমাসের কাছে...

রহমৎ খাঁ সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসে...জিয়াউদ্দীনের বিমর্ষ অন্তর উল্লসিত হয়ে ওঠে...

কিন্তু...রোম আর বার্লিন নিরুত্তর...দিনের পর দিন চলে যায় ...সিনোর করোনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন...আশ্বাস দেন, গোলযোগ এবার মিটে গিয়েছে...রোম থেকে ছাড়পত্র আর বিমান আসছে...

ইতিমধ্যে অজ্ঞাত-বাস অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকে...বাড়ীর নীচের

তলার বাসিন্দারা রীতিমত ভূত দেখতে আরম্ভ করে···রাতারাতি জিয়াউদ্দীনকে আবার সরাইখানায় সরিয়ে ফেলতে হয়···

কিন্তু সরাইখানায় সেই কাব্‌লী রুটি···রবারের মতন মাংস··· বাঙ্গালীর পাকযন্ত্রের সহ্যের সীমা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়···দেখা দেয় নিদারুণ পেটের অসুখ···অসহায় আর্ত্ত অবস্থা।

বাধ্য হয়ে রবারের বলের মতন জিয়াউদ্দীনকে আবার ফিরে আসতে হয় উত্তমচাঁদের আশ্রয়ে···

প্রতিবেশীদের সহসা আবির্ভাবের আশঙ্কা থেকে রক্ষা-ব্যবস্থা-স্বরূপ উত্তমচাঁদ দোকানে বেরুবার সময় জিয়াউদ্দীনকে ঘরে তালা-চাবি বন্ধ করে রেখে যান···মহার্ঘ্য মণি-রত্নের মতন···

কিন্তু বিপদ হয় যখন তালাবন্ধ শূন্য ঘরের ভেতর থেকে ওঠে কাশির শব্দ···কথা বন্ধ করে থাকা যায় কিন্তু কাশি বন্ধ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার···চেষ্টাতে আরো বেড়ে ওঠে শব্দ···

গৃহকর্ত্রীর চক্ষু ও কর্ণ সারাদিন সেই বন্ধঘরের দরজার দিকে পড়ে থাকে···কাশির শব্দ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতের খুনতি সজোরে নড়তে আরম্ভ করে···রান্নাঘরের জিনিষ পত্র অকারণে সশব্দে স্থানচ্যুত হতে থাকে···সেই শব্দের আড়ালে চাপা পড়ে যায় ভূতের কাশির আওয়াজ···

অবশেষে একদিন···বারবার আশা-নিরাশার দোলায় উঠতে নামতে···সিনোর করোনির কাছ থেকে এলো চিঠি···সব প্রস্তুত··· ছাড়পত্র এসে গিয়েছে···যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ···১৮ই মার্চ্চ··· সেইদিন সকাল বেলা সিনোর করোনির বাড়ীতে এসে উঠতে হবে··· সেখান থেকে সোজা বিমান ক্ষেত্রে···

বিদায়ের দিন উত্তমচাঁদ বিপ্লবীর পায়ের তলায় লুটিয়ে প্রণাম করেন, বলেন, যদি অনিচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি করে থাকি···আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করবেন···

বিপ্লবীর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে · ম্লান হেসে নিজেকে সম্বরণ করে নেন···কে দেখেছে পাষাণের অন্তরে কি আছে?

হেসে বলেন, কিন্তু একজনের অপরাধ তো কিছুতেই ক্ষমা করবো না···আপনার ঐ ছোট মেয়ে···প্রতিদিন খাবার সময় সে জোর

করে আমাকে দুখানার জায়গায় চারখানা রুটী খাইয়েছে…ক্ষমা করবো না তাকে…

বিদায়ের লগ্ন এগিয়ে আসে। বিপ্লবী বলেন, খুব সাবধানে থাকবেন…বার্লিনে পৌঁছেই আপনাকে খবর দেবো…

রহমৎ খাঁর সঙ্গে জিয়াউদ্দীন চলে গেলেন সিনোর করোনির বাড়ী…

পরের দিন সকাল বেলা উত্তমচাঁদ দোকানে বসে আছেন। কাবুলের পথে তেমনি তুষার পড়েছে। রহমৎ খাঁ এসে জানালো, চলে গিয়েছেন....জিয়াউদ্দীন এখন তারাতাইন্…

তিনমাস পরে জার্মানি থেকে প্রত্যাগত একজন লোকের মারফত, উত্তমচাঁদের কাছে এল একটা ছোট চিঠি, বিপ্লবীর অসীম কৃতজ্ঞতার নিবেদন...মাত্র দুটি শব্দে...

—নমস্তে উত্তমচাঁদ !

সেই সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গালীর পক্ষ থেকে বাংলার এই নগণ্য লেখক, তুমি যেখানে থাক ভাই রহমৎ খাঁ, আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা তোমাকে নিবেদন করছি, নমস্তে রহমৎ খাঁ।

১০৬

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২....

এশিয়ায় বৃটীশ-সাম্রাজ্যবাদের অজেয়ত্বের যে পৌরাণিক মহিমাকে দিনের পর দিনের সযত্ন চেষ্টায় গেঁথে তোলা হয়েছিলো, বলদর্পী জাপানের একটি ফুৎকারে তা নিমেষে তৈলহীন প্রদীপের মতন নিভে গেল।

সিঙ্গাপুরের পতন হলো....

ইংরেজ আমাদের বুঝিয়েছিল, ইংরেজের নৌশক্তির প্রতীকের মতন, সিঙ্গাপুরের দুর্ভেদ্য বন্দর হলো অজেয় .

তিন কোটী স্বর্ণ পাউণ্ড ভারতবর্ষকে জোগাতে হয়েছিল, তার এই রক্ষা-দুর্গ তৈরী করাবার জন্যে....

কার্য্যকালে দেখা গেল, সে-টা দুর্গ নয়....তাসের ঘর...তিন কোটী স্বর্ণ পাউণ্ডের তৈরী তাসের ঘর....

জাপানের সামান্য আঘাতে তা ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো·· এবং

সেই সঙ্গে এশিয়ায় সত্যিকারের ছড়িয়ে পড়লো স্থবির বৃটিশ সিংহের সযত্ন লুক্কায়িত নখদন্তহীনতা....

এবং সেই সঙ্গে স্বচ্ছ দিবালোকে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো ইংরেজ সামরিক অফিসরদের জঘন্য কাপুরুষতা আর নির্লজ্জ স্বার্থপরতা ..

তাঁরা জানতেন, সিঙ্গাপুর তাঁরা রক্ষা করতে পারবেন না, তাই জাপানী আক্রমণের আগেই তাড়াতাড়ি সংগোপনে সমস্ত ইংরেজ সৈন্যদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ভারতীয় সৈন্য আর সেখানকার অস্ত্রহীন সহায়হীন অসংখ্য নাগরিকদের সম্পূর্ণ অনিশ্চিত আর অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে বিনা বাক্যব্যয়ে যঃ পলায়তি স জীবতি, এই মহাজন বাক্য অনুসরণ করে ইংরেজ সেনাবাহিনী সিঙ্গাপুর পতনের আগেই সিঙ্গাপুর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

পরের দিন. ১৬ই ফেব্রুয়ারী ...

সিঙ্গাপুরের ফেরার পার্কে বিজয়ী জাপ-সেনাবাহিনীর সামনে বৃটীশের পক্ষ থেকে কর্ণেল হাণ্ট জাপ-সেনাপতি মেজর ফুজিয়ারার হাতে ভারতীয় সৈন্যদের সঁপে দিয়ে গেলেন…

বল্লেন, অতঃপর তোমরা তোমাদের নতুন মনিব জাপ-সেনাপতির নির্দ্দেশ মত চলবে, ঠিক যেমন আগে বৃটিশ মনিবদের নির্দ্দেশ মেনে চলতে...

ভারতীয় সৈন্যরা বিহ্বল-নেত্রে ভূতপূর্ব্ব মনিবের সেই অভিনব রূপের দিকে চেয়ে রইলো....

পুরাণো জমিদার গরু-বাছুর জমি-জমা নতুন জমিদারকে বুঝিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হলো।

বত্রিশ হাজার ভারতীয় সৈন্যের সমস্ত দায়িত্ব এই রকম নির্লজ্জের মতন বিসর্জ্জন দিয়ে বৃটিশ সগৌরবে পালিয়ে এলো....

১০৭

মেজর ফুজিয়ারা সেই বত্রিশ হাজার ভারতীয় সৈন্যের দানকে জাপানের কাজে লাগাবার সংকল্প করলেন।

তাদের আহ্বান করে বল্লেন, জাপান তোমাদের বন্দী হিসেবে পুষে রাখতে চায় না। আমরা এশিয়াবাসী। আমাদের উভয়ের শত্রু হলো ইংরেজ। অতএব আমাদের এক সঙ্গে কাজ করবার কোন বাধা নেই। জাপানের ভাণ্ডারে আজ খাদ্যের টান পড়েছে

তাই জাপান কাউকে বসিয়ে রেখে খেতে দিতে পারে না। তোমা-দের খাদ্য তোমাদের খেটে অর্জ্জন করতে হবে..

মেজর ফুজিয়ারার বক্তৃতার পর ভারত-সৈন্যদের পক্ষ থেকে ক্যাপটেন মোহন সিং বক্তৃতা করতে উঠলেন, জাপ-সরকার তোমাদের ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন....আমার ইচ্ছা, আমরা এইখানেই এক নতুন সেনাবাহিনী গঠন করবো....তার লক্ষ্য হবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন।

বত্রিশ হাজার সৈনিক উল্লাসে চীৎকার করে উঠলো....পাগড়ী উড়িয়ে, টুপি উড়িয়ে বালকের মতন অধীর চঞ্চল হলো...

তাদের শান্ত হবার জন্যে ইঙ্গিত ক'রে মোহন সিং বলে উঠলেন, অধীর হবার সময় এ নয়...আজ এই মুহূর্ত্তে কত বড় ব্রতের ভার আমরা নিচ্ছি, তা যেন আমরা জেনে শুনেই গ্রহণ করি ....ইংরেজরা আমাদের নামে বদনাম দিয়েছে, আমরা নাকি মালয়ে ভাল করে যুদ্ধ করি নি...ভাল করে কি করে যুদ্ধ করতে হয়, ইংরেজদের তা আমরা দেখিয়ে দেবো।

সেই সভায় গঠিত হলো আজাদ হিন্দ্ বাহিনী...ক্যাপটেন মোহন সিং হলেন সেই বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক।

১০৮

এই লগ্নের জন্যে দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করে ছিলেন একজন প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী...রাসবিহারী বসু...

চেতনার প্রথম দিন থেকে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-ধারণা ছিল, ভারতের স্বাধীনতা। অস্ত্রহীন ভয়ভীত ভারতে তিনি আর তাঁর কয়েকজন দুরন্ত সঙ্গী মৃত্যু তুচ্ছ করে বিপ্লবের অগ্নি-শিখাকে জ্বালিয়ে তোলেন ....বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত গড়ে তোলেন অভিনব তরুণ ভারতকে....তাঁদের জীবনে আবার নতুন করে জেগে ওঠে ভারতের সুপ্ত ক্ষাত্রবীর্য্য। ইংরেজ তার সমস্ত হিংস্র শক্তি প্রয়োগ করলে এই বিপ্লবীদের উচ্ছেদ করবার জন্যে। মুষ্টিমেয় ছিল এই তরুণ বিপ্লবীদের সংখ্যা...অতি সামান্য ছিল তাদের উপকরণ...তবু তারা বীরের মতন সেদিন গ্রহণ করেছিল ইংরেজের সেই চ্যালেঞ্জকে... এবং সেদিন এই মুষ্টিমেয় ভারতীয় বিপ্লবীরা ভারতবর্ষের সমসাময়িক ইতিহাসে তাদের ইচ্ছার সুগভীরতা দিয়ে যে প্রাণশক্তিকে

মুক্ত করে দিয়েছিল, তারই প্রত্যক্ষফল আমরা আজ আমাদের স্বাধীনতায় ভোগ করছি। কিন্তু সে আর এক সুবিপুল কাহিনী।

রাসবিহারীর মস্তকের জন্যে ইংরেজ সরকার পুরস্কার ঘোষণা করে....জীবিত বা মৃত রাসবিহারীর দেহের জন্যে চার দিকে রক্ত-গন্ধ-অনুসরণকারী শার্দ্দুল-শিকারী সারমেয়ের দল ঘুরে বেড়ায় ....কিন্তু সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে রাসবিহারী ইংরেজের নখদন্তের বাইরে জাপানে চলে আসেন এবং সেখানে থেকে অবিচ্ছেদ তিন যুগ ধরে জীবনের সেই এক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেন।

জাপানকে তিনি তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমিরূপে গ্রহণ করেন। নব-শক্তিতে শক্তিমান জাপানকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহায়রূপে পাবার জন্যে তিনি জাপানের প্রীতির অন্তরলোকে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেন। জাপানী ভাষা শিক্ষা করে জাপানের সাংবাদিক মহলে নিজের স্থান করে নেন। দিনের পর দিন জাপানী ভাষায় ভারতের স্বাধীনতার কথা প্রচার করে চলেন। জাপানের অভিজাত বংশের এক কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে জাপানের অভিজাত-মহলে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে ক্রমশ জাপানের শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতায় ভারতবর্ষের প্রতি জাপানের সহানুভূতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জাপানী-পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের নাম রাখেন, ভারত....

এইভাবে দীর্ঘ তিন যুগ কাল ধরে এই প্রবাসী বিপ্লবী বিদেশে থেকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শিখাকে অনির্ব্বাণ জ্বালিয়ে রেখে চলেছিলেন...জাপান থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ-মহাসমুদ্রের প্রত্যেক দ্বীপে, যেখানে প্রবাসীরূপে ভারতীয়রা বসবাস করেন, সেখানে তাঁর ভারত স্বাধীনতা-সঙ্ঘের শাখা গড়ে তোলেন, অবিচ্ছেদ চেষ্টায় ভারতবর্ষের বাইরে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা বিরাট ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখেন···

বিপ্লবী আজ বৃদ্ধ···ব্যাধিতে জরা জীর্ণ দেহ···তবুও যৌবন-দিনের সমস্ত আগ্রহ আর আকুলতা নিয়ে বেঁচে আছে বিপ্লবীর মন··· সারা জীবনের অতন্দ্র ব্রত উদযাপন করবার লগ্ন এনে দিয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ···এমন সুযোগ বৃদ্ধের জীবনে আর আসবে না··· সারা জীবনের প্রস্তুতিকে আজ করে তুলতে হবে সার্থক···সিঙ্গা-

পুরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারী ব্যাঙ্ককে প্রবাসী ভারতীয়দের এক মহাসম্মিলন আহ্বান করলেন…সেই সম্মিলন প্রবাসী ভারতীয়-দের সমস্ত বিচ্ছিন্ন চেষ্টাকে এক করে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘকে সামরিক ভিত্তিতে গড়ে তুল্লো। রাসবিহারী হলেন সেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। এই প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশ অনুসারে মোহন সিং-এর ওপর ভার দেওয়া হলো, আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে নব-শক্তিতে অবিলম্বে পুনর্গঠিত করা। এই কাজে ক্যাপটেন মোহন সিংকে পরামর্শ দেবার আর সাহায্য করবার জন্মে একটা সামরিক কর্ম্মী সংসদও গঠিত হলো।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কলেবর বৃদ্ধি আর সামরিক শিক্ষার জন্যে মোহন সিং অবিলম্বে এক বিরাট আয়োজনের ব্যবস্থা করলেন …একটা কঠিন সামরিক বাধ্যতায় মোহন সিং আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে গড়ে তুলতে লাগলেন। যে-সমর্থন আশা করেছিলেন, সে-অনুযায়ী সমর্থন না এলেও মোহন সিং-এর অধিনায়কত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ একটা শক্তিশালী সামরিক ইউনিটে পরিণত হতে চল্লো।

কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতেই এই আন্দোলনের মধ্যে ধরলো ভাঙ্গন। জাপানীরা চেয়েছিল, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ জাপানী সরকারের অধীনে থেকে জাপানা সেনাপতিদের নির্দ্দেশ মত কাজ করবে…যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে তার নিজস্ব কোন স্বাধীন সত্তা থাকবে না…সেখানে মোহন-সিং-এর সঙ্গে জাপানী সেনাপতি-দের সুরু হয়ে গেল মতদ্বৈধতা…

ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রচারকার্য্যের স্বাতন্ত্র্যে জাপানীরা ক্ষুব্ধ ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো....রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে জাপানীরা ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আর একটি দল গঠন করালো, হিকৃকারি কিকান্…এই সভ্যরা ক্যাপটেন মোহন সিং-এর বিরুদ্ধে একটা সূক্ষ্ম প্রচারকার্য্য চালাতে সুরু করে দিলো…তার ফলে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের ভেতরেও দলাদলি মাথা তুলে উঠতে লাগলো…তাঁর জীবনের সর্ব্বশেষ চেষ্টাকে গঠনের মুলে সহসা এইভাবে ব্যাহত হতে দেখে বৃদ্ধ রোগগ্রস্ত রাসবিহারী ব্যথিত, চিন্তিত হয়ে উঠলেন…তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, ইয়াকুরো কিকান সূক্ষ্ম

রাজনৈতিক কৌশলে তাঁর আর মোহন সিং-এর মধ্যে একটা বিরোধিতার ক্ষেত্র গড়ে তুলছে···

মোহন সিং-এর দলের লোকদের মনে ধীরে ধীরে একটা সন্দেহ জেগে উঠতে লাগলো, রাসবিহারী জাপানীদের অনুগৃহীত লোক···জাপানীর স্বার্থের কাছে হয়ত তিনি ভারতীয় স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদাকে বলি দেবেন···

রোগ-শয্যায় শুয়ে রাসবিহারী সেই মিথ্যা সন্দেহের মারাত্মক ছায়াকে দেখলেন ক্রমশ যেন ঘনীভূত হয়ে উঠছে···আজ তিনি বৃদ্ধ, কঠিন রোগে অসহায়. এই মহাযুদ্ধের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে কি করে তিনি প্রবাসী ভারতীয়দের মনস্তত্ত্বের এই ভাঙ্গন রোধ করবেন? কি করে এই সমর-বিভ্রান্ত লোকদের বোঝাবেন, তিনি নন্, কোন নেতৃত্বের মোহ নয়, কোন রাষ্ট্রের আনুগত্য নয়, তাঁর অন্তরের একমাত্র কাম্য বস্তু হলো, ভারতবর্ষ··· ভারতবর্ষের স্বাধীনতা?

এই সময় জাপানের সামরিক কর্ত্তারা এক ভয়াবহ ভুল করে বসলেন। মোহন সিং বা ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সামরিক কর্মী পরিষদের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই তাঁরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের একটা বাহিনীকে চট্টগ্রাম আক্রমণের জন্যে নির্দ্দিষ্ট করলেন। এর আগেও অনুরূপ চেষ্টায় মোহন সিং বাধা দিয়েছিলেন। মোহন সিং যখন এই সংবাদ জানতে পারলেন, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অধিনায়ক রূপে তিনি সেই বাহিনীকে আদেশ দিলেন, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তারা যেন এক-পাও না অগ্রসর হয়।

জাপানী সামরিক কর্ত্তারা ভারতীয় ক্যাপ্টেনের এই বেয়াদফী ক্ষমা করলেন না। তৎক্ষণাৎ তাঁরা সৈন্য পাঠিয়ে মোহন সিংকে গ্রেফ্তার করলেন।

মোহন সিং জানতেন, জাপানীরা হয়ত এবার তাঁকে আর ক্ষমা করবে না। তাই তাঁর ডায়েরীতে তাঁর শেষ আদেশ স্বরূপ লিখে রেখেছিলেন, যদি জাপানীরা আমাকে গ্রেপ্তার করে, তা হলে আমার আদেশ রইলো—সমস্ত ফৌজ যেন ভেঙ্গে দেওয়া হয়··

মোহন সিং-এর গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে নব-গঠিত আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ পারার মতন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল···

তখন রাসবিহারী টোকিও শহরে···মারাত্মক ডায়াবেটিস রোগের সঙ্গে শেষ সংগ্রামে ব্যস্ত। অর্দ্ধ-শতাব্দী-ব্যাপী সমস্ত জীবনের সাধনা সার্থকতার মুখে এসে ভেঙ্গে শত টুকরো হয়ে গেল···তাঁর আর শক্তি নেই, সেই ছত্রভঙ্গ শক্তিকে আবার সংহত করে একমুখী করে তোলেন···নতুন কোন নেতার প্রয়োজন···নতুন কোন শক্তির ···মহাশক্তির···যে তার দিব্য স্পর্শে এই প্রাণহীন লক্ষ্যহীন উত্তাপ-হীন ছত্রভঙ্গতার দেহে আবার সঙ্ঘশক্তির সূর্য্যকে জাগিয়ে তুলবে ·· কোথায় সে মহাশক্তির আধার?

রাসবিহারীর চেতনায় স্পষ্ট জেগে উঠলো সেই মহাশক্তির মূর্ত্তি···যার হাতে তিনি নিশ্চিন্ত মনে সঁপে দিয়ে যেতে পারেন তাঁর জীবনের অসমাপ্ত নৈবেদ্যের ভার···তিনি পেয়েছেন, তাঁর দর্শন।

সংগোপনে তিনি তুলে নেন টেলিফোনের রিসিভার···সমুদ্রের ওপারে, বহু প্রান্তর পেরিয়ে···বিজ্ঞানের দান বহন করে নিয়ে চলে তাঁর প্রাণের আকুতিকে...বার্লিনে···সুভাষচন্দ্রের কাছে!

বিদায়-পথ-যাত্রী আহ্বান করে প্রভাত-সূর্য্যকে, তুমি এসো, সমগ্র এশিয়া রয়েছে তোমার অপেক্ষায়···সারা রাত্রি জেগে আমি প্রস্তুত করে রেখেছি তোমার রথ···এসো সারথি, গরুড়ধ্বজ রয়েছে তোমার অপেক্ষায়···অশক্ত কর্ম্মক্লান্ত বৃদ্ধকে দাও ছুটী!

এই পারিপার্শ্বিকতায় রাসবিহারী আহ্বান করেছিলেন সুভাষ-চন্দ্রকে···

সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুভাষচন্দ্র এলেন সেই ছত্রভঙ্গতার মধ্যে, অনির্দ্দিষ্টতার মধ্যে,—সন্দেহ, ষড়যন্ত্র, আর সামরিক ঔদ্ধত্যের মধ্যে।

জাপানের সামরিক দম্ভের শিখা তখন আকাশের মেঘকে স্পর্শ করতে ছুটে চলেছে···তার সামনে সামরিক জয়ের পাত্র আত্ম-গরিমার গর্ব্বে ফেনিল হয়ে উঠেছে···

তার মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন সুভাষচন্দ্র···দলহীন, একক, পরাধীন দেশের একজন পলাতক বিপ্লবী মাত্র।

১০৯

২রা জুলাই, ১৯৪৩···

আজ সিঙ্গাপুর লোকে লোকারণ্য···মালয়, জাভা, সুমাত্রা,

হংকং, দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় যেখানে আছে ভারতবাসী, তাদের সকলের প্রতিনিধি আজ সমবেত হয়েছে সিঙ্গাপুরে…সিঙ্গাপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা পুরুষ-নারী সকলে আজ ছুটেছে ময়দানের দিকে… ছত্রভঙ্গ আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক সৈনিক, সেনা-নায়ক আজ আকুল উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করে আছে সেই সুবিপুল জনতার সঙ্গে…

জাপানী সামরিক কর্ত্তারা সেই উন্মাদ জনতার দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে ভাবেন, কোথা থেকে অকস্মাৎ এলো এই জোয়ার?

তারা শুনেছে, আজ এই সভায় আবির্ভূত হবেন, সুভাষচন্দ্র। শুধু একজন মানুষের জন্যে, যাকে তারা দেখে নি, ভাল করে চেনে না পর্য্যন্ত, তার জন্যে এই উন্মাদ আকুল প্রতীক্ষা? কি সে দেবে? কি সে দিতে পারে? কি মহা ঐশ্বর্য্যের আশাই বা সে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে? তার কোন সংবাদই তো কেউ জানে না।

অথচ সংসার ছেড়ে, ঘরকন্না ছেড়ে ছুটে এসেছে মেয়েরা; আফিস ছেড়ে, দোকান ছেড়ে, জমি ছেড়ে ছুটে এসেছে পুরুষেরা; স্কুল ছেড়ে, খেলা ছেড়ে ছুটে এসেছে বালকেরা, রাস্তার ধারে প্রতিদিনের ভিক্ষার অভ্যাস ছেড়ে ছুটে এসেছে ছিন্নবাস ভিখারীরা পর্য্যন্ত।

এ কিসের আকর্ষণ? কিসের প্রভাব? শত সহস্র বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একটী নিমেষের এই অকস্মাৎ নিবিড় সংযোগ কি করে এমন অনিবার্য্যভাবে সম্ভব হলো? মানব-ইতিহাসের কোন্ বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যায় এর উত্তর পাওয়া যাবে? শত সহস্র প্রভাতকে কে করে দিলো এমন স্বতন্ত্র?

অপেক্ষমান্ অপরিচিত সেই জনতার সামনে রাসবিহারী উপস্থিত করলেন, সুভাষচন্দ্রকে।

জনতার সম্মুখে সুভাষচন্দ্রকে আহ্বান করে বল্লেন, আজ তোমার হাতে সমর্পণ করলাম আমাদের অসম্পূর্ণ দায়িত্বের ভার, অসমাপ্ত সংগ্রামের দায়িত্ব…আমি জানি যে কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হয় নি, সে-কাজ সম্পূর্ণ করবার শক্তি নিয়েই তুমি এসেছ…আজ আমি বৃদ্ধ…আজকের সংগ্রাম চায় নবীন সেনাপতি…তাই আনন্দে আজ আমি নিজেকেও তোমার কাছে সমর্পণ করছি…তুমি আজ আমাদের নেতা…আমাদের সকলের নেতাজী।

লক্ষ কণ্ঠ থেকে এক সঙ্গে জেগে উঠলো সমর্থন-বাণী, নেতাজী! নেতাজী!

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে দক্ষিণ-সমুদ্রের তীরে সেই দিব্য মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করলো, মায়াময় সেই অপূর্ব্ব তিনটী অক্ষর, নে—তা—জী! ইতিহাসের অভ্যন্তর থেকে সেই মুহূর্ত্তে একটী মানুষের ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করে রূপ ধরে জেগে উঠলো সেই রহস্যময় প্রাণশক্তি, যা মানুষের সমস্ত যুক্তির, অঙ্কশাস্ত্র সম্মত সমস্ত হিসেবের বাইরে একটী নিমেষের মধ্যে সম্পূর্ণ কোরে তোলে একটা শতাব্দীর সম্ভাবনাকে, যা ছিল অসম্ভব তাকে করে তোলে অনায়াস সম্ভব।

আকাশে উদিত হলো নতুন সূর্য্য···তার তীব্র জ্যোতির আলোয় নিজেকে অন্ধকারে লুকিয়ে ফেল্লো প্রদীপ, সারা রাত্রি জেগে যে নিজের শিখায় সেই সূর্য্যের আগমন-বার্ত্তাকে রেখেছিল বাঁচিয়ে।

সুভাষচন্দ্রের হাতে সম্পূর্ণ নেতৃত্বের ভার সমর্পণ করে, আনন্দে সরে দাঁড়ালেন রাসবিহারী। নেতৃত্বের সমস্ত মোহ থেকে নিজেকে বিযুক্ত ক'রে সেদিন এই একনিষ্ঠ সাধক বিপ্লবী যে ভাবে স্বেচ্ছায় নিজের জ্যেষ্ঠত্বের আসন পরবর্ত্তীর হাতে দিলেন, তার মহিমা অবশ্য সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাবের বিস্ময়ের মধ্যে ঢাকা পড়ে গেল কিন্তু কর্ত্তৃত্ব-বিলাসী আজকের রাজনৈতিক যুগে রাসবিহারীর বিপ্লবী জীবনের এই শেষ কীর্ত্তি সমসাময়িক রাজনৈতিক জীবনের কর্দ্দম পঙ্কের মধ্যে অমলিন পঙ্কজের মত রয়ে গেল।

নবীন সেনাপতির হাতে সংগ্রামের পতাকা তুলে দিয়ে সংগ্রাম-ক্লান্ত বৃদ্ধ সেনাপতি অন্তরের শেষ-কামনা তাঁর কাছে নিবেদন করলেন, জীবনের একটি মাত্র আশা···স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে দেহ রেখে যেন মরতে পাই···

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু রাসবিহারীর শেষ আশা মেটে নি। স্বাধীন ভারতবর্ষ কি তার বীর সন্তানের পুণ্য দেহাবশেষকে তার জন্মভূমির মাটিতে নিয়ে এসে বিপ্লবীর অন্তিম আশাকে সার্থক করবে না?

১১০

সেদিন সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায়

প্রবাসী ভারতবাসীদের অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যহীন জীবনে যাদুকরের মন্ত্রের মতন এক নিমেষে এনে দিল বিস্ময়কর এক সংহতি। এতদিন শত চেষ্টাতেও যা দানা বাঁধে নি, শত সদিচ্ছা সত্ত্বেও যেখানে কোন একমুখী গতির উদ্ভব হয় নি, একটি মানুষের স্পর্শে সেখানে বিনা প্রচারে, বিনা আন্দোলনে প্রত্যেকের ভেতর থেকে জেগে উঠলো এক বিস্ময়কর শক্তি, যার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তারা কোন দিন সন্দেহ করে নি এবং যে-শক্তি নিমেষের মধ্যে সমস্ত বিচ্ছিন্নতা, সমস্ত বিরোধ, সমস্ত সন্দেহ আর শ্লথতা দূর করে সাধারণ মানুষকে করে তুল্লো অ-সাধারণ। মানব-চরিত্রের আত্মিক প্রভাবের ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা সেদিন আবার মানুষের চোখের সামনে মানুষের ইতিহাসে সংঘটিত হয়ে গেল। বস্তু-পুঞ্জের সমস্ত প্রভাব, বাইরের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের সমস্ত বাধা, অঙ্কশাস্ত্র সম্মত হিসেবের সমস্ত সম্ভাবনাকে উল্লঙ্ঘন করে যে মহাপ্রাণশক্তি মানুষের ইতিহাসে তার দিব্যলীলা করে চলেছে, সেদিন সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে সেই দিব্যপ্রাণশক্তি এক নিমেষে অনায়াসে সম্পূর্ণ করে তুল্লো, একটা শতাব্দীর চেষ্টায় যা গড়ে ওঠে নি।

সেদিন দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবাসী ভারতবাসীদের জীবনে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবীয় পরীক্ষা সম্পন্ন হয়ে গেল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সম্ভাবনার একটা স্পষ্ট পূর্ব্বাভাস ক্ষুদ্র আকারে সেদিন সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ভারতবর্ষ যা হতে চাইছে, অথচ হতে পারছে না, তার একটা সার্থক প্রকাশ, সেদিন দক্ষিণ এশিয়ায় সুভাষচন্দ্রের সাধনায় অগ্র-মূর্ত্তি ধরে জেগে উঠেছিল। ভারতের মাটীতে স্বাধীনতা জন্মাবার আগে, সেদিন ভারতের বাইরে সুভাষচন্দ্রের জীবনে প্রথম জন্মলাভ করে সেই স্বাধীন ভারত।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাবের আগের দিন পর্য্যন্ত, সেখানকার অবস্থা ছিল ভারতবর্ষের মতনই, অথবা তার চেয়ে বেশী অনিশ্চিত আর অসহায়। তেমনি ছিল সেখানে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, ভারতীয় নেতারা পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল; তেমনি ছিল ভারতীয় নেতাদের মাথার ওপরে উদ্যত-বেত্র-দণ্ড হাতে জয়োন্মাদ প্রবলশক্তি জাপান আর তার সামরিক

কর্ত্তারা ; জাপানী সৈন্যদের তুলনায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্যরা ছিল মুষ্টিমেয়, নগণ্য, তাদের নিজের অবস্থা সম্বন্ধে তাদের ছিল না কোন প্রত্যয়, তারা অসহায় বন্দী, পরাজিত, পরিত্যক্ত, অস্ত্র-হীন, খাদ্যহীন, নেতাহীন, লক্ষ্যহীন ; তাদের ঘিরে ছিল লক্ষ লক্ষ অস্ত্রহীন প্রবাসী ভারতীয় নাগরিক, যে-যার নিজের সংসার আর নিজের অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় ব্যাকুল, সেই ভয়ংকর বিপর্য্যয়ের মধ্যে কোথায় যাবে, কোথায় দাঁড়াবে তারই ছিল না কোন স্থিরতা ; তার মধ্যে ছিল সেই ভারতবর্ষের মতনই জাতি-ভেদ…হিন্দু-মুসল-মান-শিখের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা আর বিরোধিতা…সর্ব্বোপরি ছিল, জয়ের নেশায় উন্মত্ত মহাশক্তিধর জাপানের সর্ব্বময় প্রভুত্ব...যাকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকা যে সম্ভব, তা কারুর ধারণাতেই ছিল না তখন।

এই অসম্ভব অবস্থার মধ্যে সুভাষচন্দ্র তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম দিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের, সৃষ্টি করলেন পূর্ণাবয়ব স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের, সেই লক্ষ্যহীন অসহায় শতধা বিচ্ছিন্ন প্রবাসী ভারতবাসীদের করে তুল্লেন একমুখী এক-প্রাণ এক জাতি, এক পতাকার তলায় নিয়ে এলেন সর্ব্বভেদমুক্ত মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিকদের, আগামী স্বাধীন ভারতের সৈনিকদের, রাঙিয়ে তুল্লেন তাদের প্রত্যেকের মনকে সেই আদর্শের বহ্নিতে যে-আদর্শের বহ্নিতে অতীতের সমস্ত আবর্জ্জনাকে পুড়িয়ে জেগে উঠবে পরিশুদ্ধ নবীন ভারত…ধাত্রী-দেবতার মত সেই নবীন ভারতের ইতিহাস-পুরুষের আশীর্ব্বাদ-মন্ত্র, জয় হিন্দ্…

একটী মানুষ সম্পূর্ণ করে গেল দিব্য অনায়াসে কয়েক মাসের মধ্যে একটা শতাব্দীর সাধনাকে…

তখন আমরা ভারতবর্ষে কেউ তা বিশ্বাস করি নি…বাস্তবতার কোন পরিমাপ দিয়ে এ কীর্ত্তিকে মাপা যায় না…তাই অসম্ভব বলে চিন্তার পরিধি থেকে বাইরে রেখে দিই এবং ইংরেজরা আমাদের যা বোঝালো, বুঝতে সেটা সহজ বলে সেইটেই সত্য বলে বুঝে নিলাম,—বুঝে নিলাম, I. N. A. হলো Imperial Nippon Army-র অপভ্রংশ, সুভাষচন্দ্র হলেন জাপানী সামরিক কর্ত্তাদের ক্রীতদাস এবং বারবার ভারত-ইতিহাসে যে মহাভুল সংঘটিত হ'য়ে

এসেছে, সুভাষচন্দ্রও জাপানী শক্তিকে ভারতবর্ষে টেনে এনে সেই ভুলই করতে চলেছেন…

প্রবাসী ভারতীয়েরাও সেই ভুলপথে ভাবতে সুরু করেছিল…

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভুল তাঁদের ভেঙ্গে গেল…

সুভাষচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে সেই ভুলকেই করলেন আক্রমণ…এবং তাকে নিহত করে টুকরো টুকরো করে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে নষ্ট করে দিলেন…

প্রবাসী ভারতবাসীরা বিস্ময়ে সম্মোহিত হয়ে গেল…তারা যা কল্পনাও করতে পারেনি, চোখের সামনে দেখলো তার বাস্তব প্রকাশ…পৃথিবীতে এমন শক্তি আছে, যা জাপানের এই প্রতিষ্ঠিত সামরিক শক্তির উর্দ্ধেও উঠতে পারে…এবং সে-শক্তির আধার হলো একজন পলাতক বিপ্লবী…বিস্ময়ের প্রবল বন্যায় ভেঙ্গে ভেসে গেল তাদের মনের সমস্ত বাঁধ…একটি মানুষ তাদের কাছে জীবন্ত মূর্ত্তিতে নিয়ে এলো বহু সহস্র বর্ষের জীবিত জাতির পুঞ্জীভূত শক্তি আর ঐশ্বর্য্যকে…ব্যক্তি হয়ে উঠলো প্রতীক…দেবতা… বিশ্বাসের বিগ্রহ। লক্ষ্যহীন জীবনে তাই নিমেষে জেগে ওঠে মহা-বিশ্বাস। ব্যক্তির কাছে যা অসাধ্য, দেবতার কাছে তা অনায়াস-সাধ্য। দেবতা যখন চাইছে, তখন অদেয় কি আছে জীবনে? তাই কাল যে ছিল কৃপণ, আজ প্রভাতে সে নিজেই দুহাতে বিকিয়ে দিতে ছুটলো তার যথাসর্ব্বস্ব।

তাই সেদিন সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় সেই কয়েক লক্ষ মানুষের জীবনে যে আকস্মিক রোমান্টিক আলোড়ন দেখা দিয়েছিল, মনে হয় তার অনুরূপ প্রাণ-প্রকাশের দীপ্তি শেষ দেখা গিয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের দিনে প্যারি শহরে।

১১

রাসবিহারী যখন বার্লিনে সুভাষচন্দ্রকে আহ্বান করেন, তখন তিনি জাপ-অধিনায়ক তোজোর অনুমোদন নিয়েই তা করেছিলেন এবং টোকিও থেকে সুভাষচন্দ্র যখন সিঙ্গাপুরে আসেন, তখন তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁর পূর্ণ সম্মতি নিয়েই তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীকে পুনর্গঠিত করতে আসেন।

তোজো তখন সুভাষচন্দ্রকে পুরোপুরি জানতেন না। ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী তিনি ধরে নিয়েছিলেন, সুভাষচন্দ্র একজন ভাগ্যান্বেষী পলাতক বিপ্লবী—সাধারণত যে-ধরণের পলাতক বিপ্লবী আধুনিক কালের য়ুরোপীয় রাজনীতিতে পররাষ্ট্রের সাহায্যে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করবার জন্যে ঘুরে বেড়ায়। সুভাষচন্দ্র সেই রকম একজন কংগ্রেস-বিদ্বেষী পলাতক বিপ্লবী···জাপানের সাহায্যে ইংরেজদের তাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস দলকে ঘায়েল করে নিজে প্রধানমন্ত্রী হতে চান। জাপানও সেই সুযোগে প্রধানমন্ত্রী সুভাষচন্দ্রের মারফতে বৃটিশ-বিতাড়িত ভারতবর্ষের বাজারে নিজের কায়েমী স্থান দখল করে নেবে।

কিন্তু মাত্র কয়েকদিন যেতে না যেতেই জাপানের প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল তোজো বুঝতে পারলেন, এই পলাতক বিপ্লবীর বিচারে তিনি সম্পূর্ণ ভুল করেছেন। নিরীহ লালমাছ মনে করে যাকে পুষ্করণীতে স্থান দিয়েছেন, সেটি মাছ জাতীয় কোন ভক্ষ্য পদার্থই নয়, তাঁর পক্ষে সেটি একটি আসল জ্যান্ত কুমীর, যার কাছে এগুবার সামর্থ্য নেই তাঁর। সেই পলাতক ভারতীয় বিপ্লবীর মধ্যে মানব ইতিহাসের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যে অভিব্যক্ত হয়ে আছে, সে-ব্যাপার তোজো সেদিন ধারণা করতে পারেন নি। তাই অচিরকালের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠতার সমস্ত দাবী সত্বেও তোজোকে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র তোজোকে তোয়াজ করেন নি, তোজোই সুভাষচন্দ্রকে তোয়াজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

টোকিও শহরে এসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব সমস্ত রাষ্ট্রের বিরাট সম্মেলন বসেছে। জাপান তখন এশিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তোজো সেই সম্মেলনের সভাপতি। সুভাষচন্দ্রও সেই সভায় আহূত হয়ে এসেছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তোজো সুভাষচন্দ্রকে প্রশংসা করে বলে উঠলেন, আমি জানি, স্বাধীন ভারতে সুভাষচন্দ্রই হবেন সর্ব্বেসর্ব্বা···

বিদ্যুৎ-আহতের মতন সুভাষচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সভায় উঠে দাঁড়ালেন, তোজোকে প্রতিবাদ করে স্পষ্ট নির্ভীক কণ্ঠে বলে উঠলেন, এ-রকম একটা অন্যায় উক্তি করবার কোন অধিকার জাপ-প্রধানমন্ত্রীর নেই।

স্বাধীন ভারতে কে কি হবে, তা নির্দ্ধারণ করবে একমাত্র স্বাধীন ভারতের প্রজা সাধারণ।

জাপ-প্রধানমন্ত্রী নীরবে বুঝলেন, প্রশংসায় গলানো যাবে, এ মানুষ সে ধাতুতে গড়া নয়।

১১২

রাসবিহারীর হাত থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিয়ে সুভাষচন্দ্র অভিজ্ঞ রাজনৈতিকের মতন সর্ব্ব প্রথম স্থির করলেন, যুদ্ধের এই অস্থির অনির্দ্দিষ্টতার মধ্যে জাপানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে স্পষ্ট ভাষায় স্পষ্টভাবে স্থির করে নিতে হবে। চারিদিকে এই অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যহীনতার মধ্যে, এই এলোমেলো রোমান্টিক উন্মাদনার মধ্যে একটা স্পষ্ট, একমুখী, সংহত, লৌহ-নিয়মে-বাঁধা সঙ্ঘবদ্ধতা আনতে হবে। এই শতমুখী উন্মাদ জল-প্রপাতকে করতে হবে এক-স্রোত-বদ্ধ। তাণ্ডবের নৃত্যে আনতে হবে ছন্দের শাসন। রুদ্রকেই হতে হবে বিষ্ণু। একদেহে।

মহাশক্তির সেই বিস্ময়কর অভিব্যক্তি সেদিন আমরা দেখলাম সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। বিপ্লবীর রোমান্টিসিজিম্, রাজনৈতিকের বাস্তব-বুদ্ধি, সেনা-নায়কের ক্ষমাহীন লৌহ-শাসন আর রাষ্ট্র-পরিচালকের নিশ্ছিদ্র সংগঠন-শক্তি, সর্ব্বোপরি মানবীয়তায় সমুজ্জ্বল অচঞ্চল ব্যক্তিত্ব...এমন ভাবে এক সঙ্গে এ-যুগের আর কোন ভারতীয় নেতার মধ্যে দেখি নি আমরা।

সিঙ্গাপুরে যেদিন জনতার সামনে প্রথম আবির্ভূত হলেন, তার এক সপ্তাহের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র সমস্ত প্রেস-রিপোর্টারদের আমন্ত্রণ জানালেন। জাপান আর তাঁর মাঝখানে যেন কোন অস্পষ্টতা না থাকে। আশ্রয়দাতা জাপানকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যেখানে তাঁর আদর্শ নিয়ে কথা, সেখানে জগতের কোন শক্তির কাছে তিনি বিন্দুমাত্র আপোষ করতে সম্মত নন্; কোন সুবিধা নেবার আগে, তিনি জানিয়ে দিতে চান, কি সর্ত্তে তিনি সেই সুবিধা নিতে চান...এর মধ্যে কোন রাজনৈতিক চাল নেই, কোন কূটনৈতিক কৌশল বা ফন্দী নেই...আদর্শবাদী ভারতীয় বিপ্লবীর অন্তর-ধর্ম্মের নির্দ্দেশ, ভারতের স্বাধীনতা তার কাছে এত বড় একটা সুপবিত্র

জিনিস যে, কোন ফাঁকির মূল্যে সে তাকে পেতে চায় না। এ শুধু তার রাজনৈতিক মুক্তি নয়, তার জীবন-ধর্মের বিকাশ।

সিঙ্গাপুরের ক্রিকেট ক্লাবের সুসজ্জিত বিরাট হলঘর…জাপানীরা এসে এই ক্রিকেট ক্লাবের নাম বদলে দিয়েছে নতুন নাম, কোনান্ ক্লাব, সিঙ্গাপুরের নাম ও বদলে হয়েছে সিওনান্…

জাপানী সামরিক কর্ত্তারা কোনান্ ক্লাবের বিরাট হলঘর ছেড়ে দিয়েছেন এই প্রেস-কন্ফারেন্সের জন্যে…তাঁরা সবাই উদগ্রীব আগ্রহে আছেন, আজাদ হিন্দ আন্দোলনের এই নতুন নেতা কি লক্ষ্য নিয়ে এই দায়িত্বের ভার গ্রহণ করেছেন…এখনো পর্য্যন্ত তাঁরা কেউই এই গম্ভীর লোকটির মনের কথার কোন খবরই পায় নি…

বিশেষ করে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, হিকৃকারি কিকান…জাপান-সরকারের সৃষ্ট এই সঙ্ঘই প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্ত আন্দোলন ভেতর থেকে পরিচালন করে…এই কিকানের পরামর্শ না নিয়ে কোন ভারতীয় নেতার কোন অধিকার ছিল না স্বতন্ত্র কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে।…এই কিকানের কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়েই মোহন সিংকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছে। কোন ভারতীয় নেতাকে যদি প্রকাশ্য সভায় কোন বক্তৃতা দিতে হতো, তাহলে বক্তব্য বিষয় আগে এই কিকান্‌কে জানিয়ে অনুমোদন নিতে হতো…এই সঙ্ঘের মারফতে জাপান-সরকার প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণ করতেন…প্রবাসী ভারতীয়দের কোন সংবাদ জানতে হলে প্রেসের রিপোর্টারদের এই কিকানের শরণাপন্ন হতে হতো…

সে হেন হিকৃকারি কিকান এই প্রথম অবাক হয়ে দেখলো, একজন ভারতীয় নেতা এত বড় একটা প্রেস-কনফারেন্স আহ্বান করেছেন অথচ তারা কিছুই জানে না সেই কনফারেন্সে সেই ভারতীয় নেতা কি বলবেন। এত বড় ঔদ্ধত্য যে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবারও কোন কথা এলো না সেই নেতার দিক থেকে তারা অবশেষে নিজেরাই এগিয়ে গিয়ে নিজেদের কর্ত্তৃত্বের দাবীতে জানতে চেয়েছিল, প্রেস্-কন্‌ফারেন্সে সুভাষচন্দ্র কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে তারা একটি মাত্র উত্তর পেয়ে-

ছিল, প্রেস্-কন্ফারেন্সের পর প্রেসেরই মারফৎ তাঁরা তা জানতে পারবেন, যথারীতি'।

জাপান-সরকার এই প্রেস্-কন্ফারেন্সের জন্যে বেছে বেছে জাপানের ষাটজন বিশেষ ওস্তাদ রিপোর্টারকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা অভ্যস্ত প্রথা অনুযায়ী সভার পূর্ব্বাহ্নে যখন হিক্কারি কিকানের কাছে এলেন সংবাদের মালমশলা সংগ্রহের জন্যে, তাঁরাও অবাক হয়ে শুনলেন, এই প্রথম হিক্কারি কিকান জানে না এই সভায় কি বিষয় আলোচিত হবে।

রিপোর্টাররা পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাযি় করে। অভিজ্ঞ সাংবাদিকের স্বভাব-সিদ্ধ অনুপ্রেরণায় বুঝতে পারেন, যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে তাঁরা চলেছেন, সে-ব্যক্তি প্রতিদিনের পরিচিত সাধারণ গোষ্ঠীর কেউ নন, ইতিহাসের রুদ্ধ রহস্য-কক্ষের দাবী যে গুটিকতক অসাধারণ লোকদের হাতে থাকে, এ-ব্যক্তি তাঁদেরই একজন, মানব-ইতিহাসের নব-পরিচ্ছেদ রচয়িতাদের একজন···

১১৩

কোনান ক্লাবের বিরাট হলঘরে তিল ধারণের স্থান নেই। জাপানী প্রেসের ষাটজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি, দক্ষিণ এশিয়াস্থ বিশিষ্ট নাগরিক আর রাষ্ট্রদূতেরা উদগ্রীব আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন···কখন সুভাষচন্দ্র আসেন। "দাই নিপ্পন গুণ হো থো সো তাই"* সংঘের কর্ম্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে পর্য্যবেক্ষণ করছে, যাতে আয়োজনের কোন ত্রুটী না থাকে।

ঠিক ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজছে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রচার-সেক্রেটারী আয়ারকে সঙ্গে নিয়ে সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। চারিদিক থেকে ক্যামেরার মুখ তাঁর দিকে সশব্দে তাড়া করে এলো। কয়েক সেকেণ্ড সুভাষচন্দ্র দাঁড়িয়ে রইলেন, ক্যামেরাওয়ালাদের সুবিধার জন্যে। তারপর ধীরে তাঁর আসনের দিকে অগ্রসর হলেন। গান্ধী-টুপি-পরিহিত সেই সৌম গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে চেয়ে জাপানী প্রেস প্রতিনিধিরা আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জাপানী প্রথা অনুসারে অভিবাদন জানালেন। সুভাষচন্দ্র হাতজোড় করে ভারতীয় প্রথায় তাঁদের প্রত্যভিবাদন জানালেন।

---

* বৃহৎ নিপ্পণ সামরিক সংবাদ পরিবেশন সংঘ।

সভার কাজ সুরু হয়ে গেল।

সুভাষচন্দ্র বল্লেন, জীবনে একদিন তিনিও সাংবাদিকের কাজ করেছেন, যদিও সাংবাদিক হিসাবে তিনি তাঁর সম্মুখস্থ কৃতী-সাংবাদিকদের মতন গৌরব অর্জ্জন করতে পারেন নি কিন্তু তাঁর সেই স্বল্প অভিজ্ঞতায় তিনি শিখেছিলেন কিভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। তাই তিনি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন যে তাঁদের সঙ্গে তিনি মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রেখেই চলতে পারবেন। তাই কাজের সুবিধার জন্য তিনি পূর্ব্বাহ্নে জানিয়ে দিতে চান, তিনি কিভাবে এই সব প্রেস-সম্মেলন পরিচালনা করেন। তাঁর মূল বক্তব্য তিনি প্রথমে তাঁদের জানিয়ে দেবেন। তারপর তাঁরা তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে প্রশ্ন করতে পারেন, তিনি তাঁদের সামনেই সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন। এই রীতি তিনি সর্ব্বত্র অনুসরণ করে এসেছেন, এখানেও তাই করবেন।

জাপানী সাংবাদিকেরা মৌন আগ্রহে পরস্পরের মুখচাওয়াচায়ি করেন।

সহসা সুভাষচন্দ্রের শান্ত কোমল কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। কণ্ঠের সুরে বেজে ওঠে ইস্পাতের অনুরণন। তিনি বলতে সুরু করেন, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কথা…সংক্ষেপে। তার পরিশেষে বলেন, আমি সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের একজন সৈনিক এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যই আজ গ্রহণ করেছি আজাদ-হিন্দ সংঘের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনের জন্যে আমি স্থির করেছি......

জাপানী প্রেস-প্রতিনিধিরা উচ্চকিত হয়ে ওঠেন। সকলকে স্তম্ভিত করে সুভাষচন্দ্র সেই সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করলেন,

…আমি এই মুহূর্ত্তে এখানে গঠন করবো, অস্থায়ী স্বাধীন ভারত-গভর্ণমেণ্ট, নতুন করে গঠন করবো ভারত-নারীদের নিয়ে একটী সম্পূর্ণ নারীবাহিনী....স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের নির্দ্দেশে এই আজাদবাহিনী যুদ্ধযাত্রায় বেরুবে...দিল্লীর লালকেল্লায় স্বাধীন ভারতের পতাকাকে উড্ডীন করে তবে ক্ষান্ত হবে এই আজাদ-হিন্দ বাহিনী।

জাপানী প্রেস-প্রতিনিধিরা সুদূরতম কল্পনায় ভাবতে পারেন নি,

এই পলাতক বিপ্লবী তাঁর মনের মধ্যে এই দুরন্ত দুঃসাহসকে পরিপোষণ করে রেখেছিলেন। সেই ছত্রভঙ্গ, এলোমেলো, অগঠিত আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর অসহায় নিঃসম্বলতার মাঝখানে, এ কোন্ উন্মাদ পরিকল্পনা করেছে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের? ভারত-নারীর সামরিক বাহিনী? এমন অসম্ভব অবাস্তবতাকে এমন নিরুদ্বেগ নিশ্চয়তায় কি করে উত্থাপন করতে পারে এই নিঃস্ব ব্যক্তি?

জাপানী প্রেস-প্রতিনিধিরা শুনেছিলেন যে সুভাষচন্দ্র একজন দুরন্ত বিপ্লবী নেতা কিন্তু এমন অবিশ্বাস্য অসম্ভব দুঃসাহসিক পরিকল্পনা কি করে তিনি করতে পারেন?

বক্তৃতা শেষ করার পর সুভাষচন্দ্র প্রেস-প্রতিনিধিদের আহ্বান করলেন প্রশ্নের জন্য।

সমস্ত হল নিস্তব্ধ। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। এমন অসম্ভব পরিকল্পনায় তাঁরা কি বলবেন?

জাপানী প্রেস-প্রতিনিধিদের অধিনায়করূপে সুভাষচন্দ্রের সামনেই বসেছিলেন, জাপানের সাংবাদিক মহলের সর্ব্ববাদিসম্মত নেতা, আসাহি সিন্‌বুমের প্রবীণ সাংবাদিক। দুমিনিট চলে গেল, তাঁরও মুখে কোন কথা নেই।

সুভাষচন্দ্র বাধ্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের কি কোন প্রশ্নই নেই?

প্রবীণ সাংবাদিক উঠে দাঁড়িয়ে জড়িত কণ্ঠে দ্বিধাগ্রস্ত ভাষায় জিজ্ঞাসা করেন, আপনি যে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনের কথা বলছেন, তা কি ডেমোক্রাটিক হবে?

সুভাষচন্দ্র হেসে জবাব দিলেন, জাপানের প্রবীণতম সাংবাদিককে আমি জিজ্ঞাসা করছি, তিনি কি আমাকে জানাতে পারেন, আজকের জগতে কোথায় কোন দেশে সত্যিকারের ডেমোক্রাটিক গভর্ণমেণ্ট আছে?

উত্তর শুনে প্রবীণ সাংবাদিক বিস্ময়চকিত মুখে নীরবে সহযাত্রীদের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। প্যাণ্টের পকেটে হাত রেখে কয়েক সেকেণ্ড নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর সমস্ত কথা যেন গিলে নিয়ে নীরবে বসে পড়েন।

আবার নিস্তব্ধ হল ঘর।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আর একজন জাপানী সাংবাদিক উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সুভাষচন্দ্র কি সত্যিসত্যি মনে করেন যে ভারতীয় নারীদের সামরিক বাহিনীরূপে গড়ে তোলা সম্ভব? তাদের দিয়ে তিনি যুদ্ধের কোন্ কাজ করাতে চান?

সুভাষচন্দ্র উঠে দাঁড়ান। কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপতে থাকে।

—আপনারা দেখেন নি, এই কোমলা ভারত-নারী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে কি অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিয়েছেন। আমি দেখেছি, উন্মত্ত সৈন্যদের বেয়নেটের সামনে তাঁদের কুসুম-সুকুমার মুখে ফুটে উঠেছে রুদ্রানীর দীপ্তি...দেখেছি পুরুষের সঙ্গে সমানে বহন করতে আঘাত, অপমান, অনশন, লাঞ্ছনা। দেখেছি, মৃত্যুর মুখোমুখি তাঁদের মুখের অবিকার অচঞ্চল ভাব। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পর্ব্বে পর্ব্বে আছে এই ভারত-নারীর দান। যেদিন এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম সূত্রপাত হয়, ভারতের সেই প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামে আপনারা কি শোনেন নি, ঝাঁসীর রাণী, অন্তঃপুরচারিকা একজন ভারত-রমণী মুক্ত-তরবারি হাতে সমরক্ষেত্রে সেনাপতি হয়ে বারবার ইংরেজের সঙ্গে করেছেন যুদ্ধ? আপনাদের আমি জানাচ্ছি, সেই বীর নারীর নাম নিয়েই আমি গঠন করবো ঝাঁসীর রাণী রেজিমেণ্ট। সামরিক বাহিনী বলতে যা কিছু বোঝায়, সম্পূর্ণভাবে সেই নারী-বাহিনী হবে সামরিক। পুরুষ সৈনিকের পাশাপাশি সঙ্গীণ হাতে মার্চ্চ করে যাবে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে, একসঙ্গে বণ্টন করে নেবে হয় স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু!

জাপানী প্রেস-প্রতিনিধিরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে বুঝলেন, আজ যে ব্যক্তি তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, একক হলেও, সে ব্যক্তি ভারত-ইতিহাসেরই মনোনীত প্রতিনিধি...তাঁর ভাষায়, তাঁর মুখে, তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটা বিরাট জাতির সদ্য জাগ্রত আত্মা...তাকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা নেই কারুর। ললাটে তাঁর মহাকালের জয়-তিলক।

১১৪

পরের দিন সমগ্র জাপানী সংবাদ-পত্র-মহলে দ্বিধাহীন ভাষায় বিঘোষিত হলো, সুভাষচন্দ্রের বিজয়-নেতৃত্ব। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে

তাঁর ব্যক্তিত্ব এসিয়ার দক্ষিণ আর পূর্ব্ব-খণ্ডে সূর্য্যের মতন হয়ে উঠলো ভাস্বর। মনে পড়ে, ঠিক এমনি ভাবে আর একদিন, আর একজন দুঃসাহসিক ভারতীয় একদিনের মধ্যে জয় করে নিয়েছিল আমেরিকার জন-চিত্তকে, চিকাগো বক্তৃতার পর বিবেকানন্দ। সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত প্রধান সংবাদ-পত্র সগৌরবে বহন করেছিল, সেই গৈরিক বসনধারী ভারত সন্ন্যাসীর ঝঞ্ঝা-আবির্ভাবের সংবাদকে। কোনান ক্লাবের সভার পর সমস্ত জাপানী সংবাদ-পত্র একসঙ্গে একবাক্যে অভিনন্দিত করলো সেই দুরন্ত দুঃসাহসিক ভারত বিপ্লবীকে। জাপানের রাষ্ট্র-নেতারা সজাগ হবার আগেই সুভাষ-চন্দ্র জাপানী সংবাদ-পত্রের মারফৎ জয় করে নেন জাপানের জন-সাধারণের চিত্তকে। যে দুর্জ্জয় ব্যক্তিত্ব জাপানের সামরিক দম্ভ আর অগ্রনায়কত্বের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ক্ষুণ্ণ হতে দেয় নি ভারতবর্ষের মর্য্যাদাকে, দুর্লভ অনায়াসে সেদিন তা অর্জ্জন করলো তার রহস্যময় আত্মপ্রতিষ্ঠা। সমস্ত জাপানী সংবাদ পত্রে সুভাষ চন্দ্রের ঘোষণাকেই প্রথম স্থান দেওয়া হলো এবং প্রত্যেক কাগজের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠলো,

আজ পর্য্যন্ত এমন বৈদ্যুতিক ব্যক্তিত্বময় আর কোন লোককে তারা দেখে নি,—

নেপোলিয়ানের মতন এই লোকটির অভিধানে অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই—

এই লোকটি যে কথা মুখে বলে, সমস্ত জগৎ বিরোধিতা করলেও তাকে কার্য্যত সত্য করে তুলতে পারে,—

সুতরাং এই লোকটির সঙ্গে ব্যবহারে জাপানী সরকারকে একান্ত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা বজায় রেখে চলতে হবে।

সেদিন দক্ষিণ সমুদ্রের কূলে সুভাষচন্দ্র যে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলেন, তার সূচনা দেখতে পাওয়া যায় জাপানী সাংবাদিক-দের এই অভিনন্দনে।

১১৫

কোনান ক্লাবের ঘোষণা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র যথারীতি অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট গঠন করলেন। দলাদলিতে বিভক্ত ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ আর ছত্রভঙ্গ আজাদ হিন্দ-ফৌজের নায়ক-

দের একত্রিত করে সুভাষচন্দ্র রীতিমত পূর্ণাঙ্গ এক স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট গঠন করলেন। আজ এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের ব্যাপার আমরা সহজ ভাবেই স্বীকার করে নিয়েছি, কিন্তু সেদিন সেই এলোমেলো অবস্থার মধ্যে, সেই রাজনৈতিক অনির্দ্দিষ্টতার ঘূর্ণাবর্ত্তে, জাপানী সামরিক শক্তির সর্ব্বময়ত্বের আওতায়, একান্ত নিঃস্ব অবস্থায় একটা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট গঠন করার পরিকল্পনা যে কতখানি রাজনীতিজ্ঞান আর গঠনশক্তির পরিচায়ক তা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, কি অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সুভাষচন্দ্র। যে দুঃসাহসিক রাজনৈতিক প্রতিভার অভাব আজ আমরা স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের প্রতিটি ক্রম-বর্দ্ধমান সমস্যার মধ্যে অনুভব করছি, আমার বিশ্বাস, সেই মহাশক্তির দিব্য প্রকাশ সেদিন আমরা দেখেছিলাম সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। জাতীয় জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন সর্ব্বগুণধর অনিন্দনীয়চরিত্র শক্তিশালী লোকদেরও ছাড়িয়ে এমন একটা বিশেষ বিশেষ লোকের প্রয়োজন হয়, যাঁর মধ্যে সমস্ত হিসাব-করা গুণের অতীত অবর্ণনীয় এমন একটা মায়া-শক্তি বা মায়া-প্রতিভা থাকে, শুধু তার স্পর্শেই অসম্ভব সম্ভব হয়ে ওঠে, শতাব্দীর অসমাপ্ত কাজ এক যুগেই নিষ্পন্ন হয়ে যায়।

ইংরেজের সঙ্গে শেষ-সংগ্রামে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সেই মায়াশক্তিধর, তাঁর চরিত্রের মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল; যা তাঁর অনিন্দনীয়কীর্ত্তি আর কোন অনুচরের মধ্যেই নেই। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর যে সব নতুনতর বিপুলতর সমস্যা আজ পর্ব্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে তারাও আজ অসহায়ভাবে খুঁজছে তেমনি একজন মায়া-শক্তিধরকে। আজ ভারতবর্ষ যে শক্তিকে কাতরভাবে প্রার্থনা করছে অথচ পাচ্ছে না, সেই শক্তির প্রকাশ সেদিন আমরা দেখেছি সুভাষচন্দ্রের মধ্যে।

আমরা হিন্দুরা, মানুষের মধ্যে সেই বিশেষ মায়াশক্তিকে বলি ভগবৎ শক্তির প্রকাশ। অঙ্কশাস্ত্রের বাইরে, ন্যায়শাস্ত্রের ঊর্দ্ধে, মনস্তাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ ছাড়িয়ে সেই অবর্ণনীয় শক্তি হলো চিহ্ন, যার দ্বারা আমরা চিনতে পারি চিরন্তন ভারত-পথিকদের, যাঁদের ভেতর দিয়ে ভারতের ইতিহাস-পুরুষ তাঁর লীলা অভিব্যক্ত করেন।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন ভারত-ইতিহাসের সেই চিহ্নিত চির-পথিক। সেই নিঃসীম নিঃস্বতার ভেতর থেকে একটা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট গড়ে তোলার পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য করে তোলা, চরম বাস্তবতাবাদীর কাজ নয়, চরম স্বপ্নচারীর কাজ। তাই সুভাষচন্দ্র সেদিন আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের সৈনিকদের ডেকে বলেছিলেন, ওরা বলে আমি স্বপ্নচারী···আমি স্বীকার করছি, আমি স্বপ্নচারী। সারাজীবন ধরে আমি স্বপ্ন দেখেই আসছি·· পথে, প্রান্তরে, কারাগারে আমি দেখেছি ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন...আজ আমার সেই স্বপ্নকেই আমি রূপ দিতে চলেছি...এই আজাদ-হিন্দ ফৌজ হলো আমার সেই স্বপ্নেরই বাস্তব রূপ....এবং মুক্তকণ্ঠে আজ আমি ঘোষণা করছি, স্বপ্নচারীদের স্বপ্নই এই পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে···আমরা স্বপ্ন দেখেছি বলে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে···

যে-জিনিষটির অভাবের ফলে রাসবিহারীর মতন নেতার সারা-জীবনের সাধনা, মোহন সিং-এর মতন সৈনিকের সমস্ত সংগঠন শক্তি, শাহনাওয়াজ-সায়গল-ধীলনের মতন দেশ-প্রেমিক সেনা-নায়কদের সামরিক চেষ্টা, লক্ষ লক্ষ প্রবাসী ভারতবাসীর অন্তরের সত্যিকারের আকুতি বারবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল, অপরূপ রাজ-নৈতিক প্রতিভায় সুভাষচন্দ্র সেই জিনিষটিকে সৃষ্টি করলেন, একটা প্রতীক, একটা মূর্ত্তি, একটা বেদী, যেখানে সকলে এসে এক হতে পারে, যার জন্যে সকলে মিলে প্রাণ দিতে পারে, অন্তরের প্রকাশ আকুল আদর্শের একটা প্রত্যক্ষ বাস্তব রূপ, একটা স্বাধীন রাষ্ট্র। সেই বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শতকামনাকে তিনি একমুখী করে তুল্লেন। তাদের সামনে তুলে ধরলেন, তাদের রাষ্ট্র, তাদের পতাকা, তাদের জাতীয় সঙ্গীত, তাদের অভিবাদন, তাদের যাত্রা-মন্ত্র। শত শত বিভিন্ন স্রোতে যে-শক্তি ছিল বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ, এক মহাসাগরে তাদের সম্মিলিত করে, করে তুল্লেন গর্জ্জমান ভীম ভয়ঙ্কর। দক্ষিণ-মহাসাগরের তীরে জেগে উঠলো নবীন ভারত-জাতি।

আর এক দিক দিয়ে এই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট গঠন করে সুভাষচন্দ্র বিশ্বরাজনীতির সেই বন্যাস্রোতের মধ্যে নিজের একটা আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিলেন। সাতটি বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে যথাযথভাবে স্বীকার করে নিলো এবং এই

স্বীকৃতির জোরে তিনি স্বাধীন রাষ্ট্রের পূর্ণ মর্য্যাদায় নিজের ঈপ্সিত পথে অগ্রসর হলেন। কাল যিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একক, অসহায়, অগণিত জনতার মধ্যে একজন, আজ তিনি হলেন পূর্ণগঠিত এক রাষ্ট্রের অধিনায়ক···স্বাধীন ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান প্রতিনিধি। এবং সেই স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের পূর্ণ মর্য্যাদাকে বহন করে তিনি অগ্রসর হলেন বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে···এবং সেখানে তিনি যেভাবে স্বাধীন ভারতের সেই মর্য্যাদাকে বিশ্ব-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন, স্বয়ং মহাকাল তাকে স্বীকার করে নিলেন। মানুষের জীবন যদি কাব্য হয়, তাহলে আজাদ হিন্দ রাষ্ট্র গঠন করা থেকে আরম্ভ করে যেদিন তিনি বর্ম্মার রণক্ষেত্র থেকে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন, এই অল্প কয়েকটি দিনের মধ্যে তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনা দিয়ে তিনি যে অপরূপ মহাকাব্য রচনা করে গেলেন, মহা-কাব্যেরই মতন তার অমর সুরভি অনন্তকাল ধরে ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রত্যেক সভায় তাঁর বক্তৃতা, যুদ্ধগামী সৈন্যদের কাছে তাঁর অনুপ্রেরণার বাণী, প্রতিদিনের যুদ্ধে তাঁর আদেশ-পত্র, ভাষা আর ভাবের দিক থেকে মহাকবির মর্ম্মবাণীর মতন ঝংকার দিয়ে উঠলো। জগতের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসে বড় বড় সেনাপতিদের "অর্ডার অফ্ দি ডে" অর্থাৎ প্রত্যেক দিনের সেনাপতির আদেশ, পাঠ্য হিসাবে সামরিক কলেজে যুদ্ধশিক্ষার্থীদের পড়তে হয়। সেই সামরিক সাহিত্যের ইতিহাসে সিপাহ সালার সুভাষচন্দ্রের বহু অর্ডার অফ দি ডে অমর সাহিত্য হয়ে থাকবে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ষ্টালিনের অর্ডার অফ্ দি ডে একত্রে সংকলিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়েছে, সোভিয়েট স্কুলের প্রত্যেক ছাত্র তার সঙ্গে পরিচিত; সিপাহ সালার সুভাষচন্দ্রের অর্ডার অফ্ দি ডে তাঁর স্বদেশবাসীর উদাসীনতায় হয়ত অচিরকালের মধ্যে অতীতের অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বীরের নামে একটা রাস্তার নামকরণ করতে পারলেই আমাদের বীর-পূজা শেষ হয়ে যায়।

"ভগবানের নামে শপথ গ্রহণ করিতেছি, যতদিন এই দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন আমি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিব"—

২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩, এই শপথ গ্রহণ করে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করলেন।

সমবেতকণ্ঠে জয়ধ্বনি জেগে উঠলো, আর্জি হুকুমৎ আজাদ হিন্দ্ কি জয়!

তারপর রাষ্ট্রাধিনায়করূপে তিনি একে একে তাঁর মন্ত্রীসভার প্রত্যেকের নাম ঘোষণা করলেন।

যথারীতি প্রত্যেক মন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করে নিজের নিজের দায়িত্বের ভার নিলেন।

১১৬

আমরা যখন ভারতবর্ষে শুনছি, সুভাষচন্দ্র জাপানী সামরিক নেতাদের মাইনে-করা দালাল হিসাবে জাপানী সেনা-নায়কদের পরিচালনায় একদল সৈন্য নিয়ে ভারতে জাপ-আক্রমণের পথ তৈরী করছেন, তখন স্বাধীন আজাদ হিন্দ্ রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিনায়করূপে সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ শূন্য অবস্থা থেকে একটা সকলদিক দিয়ে সম্পূর্ণ ও সুগঠিত পূর্ণাবয়ব স্বাধীন রাষ্ট্র-যন্ত্র গড়ে তুলছিলেন। আজ আজাদ হিন্দ সরকারের কাগজ-পত্র দেখে বিস্ময়ে আমরা ভাবি, সেই অল্প সময়ের মধ্যে সেই নিঃস্ব অবস্থায় কি করে এক-জন লোক এই রকম একটা বিরাট শাসন-যন্ত্র আর সেই সঙ্গে নিশ্ছিদ্র একটা সামরিক আয়োজন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এমন নিখুঁত আর এমন সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে পারলেন। আজাদ-হিন্দ সরকার অস্থায়ী ভাবে গঠিত হয় এবং বড় বড় রাষ্ট্রের মতন তার লোকবল অথবা অর্থবল কিছুই ছিল না, কিন্তু তার গঠন এবং পরিচালন ব্যাপারে কোন বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে তার এতটুকু তফাৎ ছিল না। প্রত্যেক বড় রাষ্ট্রের যে সব প্রয়োজনীয় বিভাগ বা দফতর থাকে, প্রত্যেক বড় রাষ্ট্রে সেই সব বিভিন্ন দফতর যে-সব নিয়মকানুনের দ্বারা পরিচালিত হয়, আজাদ হিন্দ সরকারের প্রত্যেকটি দফতর তেমনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। তার অসংখ্য নিয়ম-কানুন, তার প্রত্যেকটির পরিকল্পনা, ছাপা, প্রয়োগ-বিধি ও ব্যবস্থা, আরব্য-উপন্যাসের আলাদীনের প্রদীপের মায়া-প্রভাবে যেন সম্ভব হয়ে উঠলো।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্নচারী

সুভাষচন্দ্র সংকল্প করেছিলেন, এই নবগঠিত রাষ্ট্রকে রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে···স্বাধীন ভারতেরই প্রতীক এই গভর্ণমেণ্ট···স্বাধীন ভারতের মর্য্যাদাকে জগতের কোন শক্তিরই কাছে অবনমিত করা চলবে না···এবং তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি হলো, সেই ভয়াবহ বিরূপ অবস্থার ভেতর থেকে তিনি সামান্যতম কাজেও স্বাধীন ভারতের সেই মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। এবং সেইজন্যেই আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের পরিচালনার ব্যাপারে তিনি জাপ-সরকারের কাছে কোন জাগতিক প্রয়োজনেই ভিক্ষুকের মতন হাত বাড়ান নি। নিঃসম্বলের নিদারুণ আভিজাত্যে তিনি তাঁর শিশু-রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি বিভাগ নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের সামর্থ্যে গড়ে তুলেছিলেন। তার স্বতন্ত্র বেতার, স্বতন্ত্র প্রেস, তার সৈনিকদের স্বতন্ত্র শিক্ষা-শিবির, তার স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক, স্বতন্ত্র মুদ্রা, স্বতন্ত্র ক্যারেন্সী, স্বতন্ত্র ভাষা, স্বতন্ত্র চিহ্ন, স্বতন্ত্র কোড্। স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবেই আজাদ হিন্দ্ রাষ্ট্রের অধিনায়ক অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিনায়কের সঙ্গে করলেন প্রীতি-বিনিময়। স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবেই আজাদ হিন্দ্-রাষ্ট্র যথারীতি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে করলো যুদ্ধ ঘোষণা। এই গঠন শক্তি, এই আত্মমর্য্যাদাবোধ, এই শৃঙ্খলাজ্ঞান, এই কর্ম্মস্পৃহা, এই পুরুষকারের আভিজাত্যই নেতাজী দিয়ে গিয়েছেন তাঁর চরম উত্তরাধিকারস্বরূপ ভারতের তরুণদের।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই অনিশ্চয় অসহায়তার মধ্যে নেতাজীর এই স্বাধীন আজাদ্-হিন্দ্ রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা হলো, বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। আজাদ হিন্দ সরকার বেশীদিন স্থায়ী হয় নি, তার সেন্যরা যে সব যুদ্ধ করেছে, তার ফলাফলের দিক থেকে সে সব যুদ্ধের বর্ণনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিরাট ঘটনার পটভূমিকায় হয়ত হারিয়ে যাবে, কিন্তু আইডিয়ার দিক থেকে, কর্ম্মের অনুপ্রেরণার দিক থেকে, ভবিষ্যতের পথনির্দ্দেশের দিক থেকে, আদর্শের দিক থেকে তাঁর এই স্বাধীন আজাদ হিন্দ রাষ্ট্র গঠনের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা রাজনৈতিক প্রতিভার অনুপম কীর্ত্তি স্বরূপ ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ ভারতে যে স্বাধীনতার অঙ্কুর মাথা তুলে জেগে উঠেছে, তার বীজ নিঃসন্দেহে ছিল সেই আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের গঠনে। রাজনীতিক্ষেত্রে,

সামরিক ক্ষেত্রে, ভারতবর্ষ কি পারে, তার একটা বাস্তব প্রকাশ সেদিন এমন ভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল যে তার দেহগত অপমৃত্যুর পরও তার আত্মা বৃটীশ-দম্ভকে টলিয়ে দিয়েছিল। নেতাজীর সেই দুঃসাহসিক পরিকল্পনার মধ্যে ভারত-ইতিহাসের সত্য-মূর্ত্তিই বিকশিত হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের সংহতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন ছিল, যার অভাবে গত পঞ্চাশ বছরের সমস্ত রাজনৈতিক চেষ্টা দানা বাঁধতে পারে নি, নেতাজী তাঁর এই স্বল্পকাল-স্থায়ী সৃজনের মধ্যে তার প্রত্যেকটি উপাদানকে জীবন্তভাবে রূপ দিয়ে গেলেন। এই বহু-ভাষা-বিচ্ছিন্ন মহাদেশের প্রদেশে প্রদেশে ছিল যে মিলন-বিন্দুর অভাব, "জয় হিন্দ" বাণী সৃষ্টি করে নেতাজী ভারতের রাজনৈতিক জীবনের সেই মিলন-কেন্দ্রটীকে সত্য করে তুল্লেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসের দুটী চরম সন্ধিক্ষণে এইরূপ দুটী মন্ত্রবাণী সমস্ত স্বাধীনতা-আন্দোলনকে ক'রে রেখেছে প্রাণবন্ত; প্রথম সন্ধিক্ষণে এলো দিব্য মন্ত্রের মতন "বন্দে-মাতরম্"...বাঙ্গালী ঋষির ধ্যান থেকে জন্মগ্রহণ করলো নবীন ভারতবর্ষের আত্মা স্বরূপ এই মন্ত্রবাণী; দ্বিতীয় সন্ধিক্ষণে, বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের পরম সৌভাগ্য, আর একজন বাঙালী সাধকের সাধনার মর্ম্মমূল থেকে এলো নবীন ভারতের সংহতি-বিন্দু স্বরূপ দ্বিতীয় মন্ত্রবাণী "জয় হিন্দ্"...মন্ত্রপূত কবচের মতন এই দুই মন্ত্রবাণী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গে অক্ষয় কবচের মতন বিরাজ করছে। এই চারটী অতি সাধারণ শব্দ তাদের অন্তরে বহন করে নিয়ে এসেছে ভারতের পুঞ্জীভূত তপঃশক্তির ঐশ্বর্য্য। নেতাজী যেদিন তাঁর নব গঠিত আজাদ-হিন্দ্-বাহিনীর হিন্দু-শিখ-মুসলমান, মাদ্রাজী-মারাঠী-পাঞ্জাবী-বাঙালী সৈনিকের মুখে অর্পণ করলেন এই জয় হিন্দ মন্ত্র, সেদিন পাঁচ হাজার বছরের বিচ্ছিন্নতার ইতিহাসে জন্ম গ্রহণ করলো এক-জাতির প্রাণবীজ...সত্য হয়ে উঠলো পাঁচ হাজার বছরের স্বপ্ন।

সেই নব গঠিত রাষ্ট্রের সামনে তিনি তুলে ধরলেন, চরকা-চিহ্নিত কংগ্রেসের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকেই...সেই দূরদেশে, নিজের ভক্তমণ্ডলীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সেদিন সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলাদলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার বহু উর্দ্ধে উঠে, সর্ব্বপ্রথম স্মরণ

করলেন, মহাত্মা গান্ধীকেই ; জগৎশুদ্ধ লোক যেখানে জানতো মহাত্মা-জীর বিরোধিতাতেই তিনি কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, সেখানে তিনি সর্ব্বপ্রথম আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করলেন সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকেই, সমবেত আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর সামনে তিনি বেতারে ভারতবর্ষে পাঠালেন গান্ধীজীর কাছে তাঁর অকুণ্ঠ প্রণাম, হে নবীন ভারতের জনক, তোমার শিষ্যের এই অভিযানে সে প্রার্থনা করছে তোমার আশীর্ব্বাদ। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলাদলির আত্মসর্ব্ব-স্বতার পঙ্কিল পঙ্কে জন্মগ্রহণ করলো, চিরবিশুদ্ধ দেশকর্ম্মী, দেশ নেতা…দল নয়, নিজের ক্ষমতা নয়, যার কাছে সব চেয়ে বড় হলো তার দেশ, তার জাতি। সেদিন নেতাজীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করলো নতুন এক ভারতবাসী, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের আদর্শ নাগরিক…যে নাগরিকের অভাবে সে আজ করধৃত ফল উপভোগ পর্য্যন্ত করতে পারছে না। তাঁর সেই নবগঠিত রাষ্ট্রের প্রতীক স্বরূপ গড়ে তুল্লেন টিপু সুলতানের স্মৃতি-বিজড়িত ব্যাঘ্র-মূর্ত্তি, দুই শতাব্দীর সমস্ত স্বাধীনতা-প্রচেষ্টাকে করলেন ধারাবদ্ধ। মৃত্যু-পথযাত্রী আজাদী সৈনিকদের মুখে দিলেন অমর জয়-ধ্বনি, দিল্লী চলো। যে-দিল্লীর পথে-প্রান্তরে বারেবারে ভেঙ্গেছে ভারতবর্ষের এক-রাষ্ট্র-হওয়ার স্বপ্ন। প্রত্যেক আজাদী-সৈনিকের গায়ের কোটের সঙ্গে গেঁথে দিলেন ব্যাজ…ব্যাজে চিত্রিত ভারতবর্ষের মানচিত্র…আর তলায় লেখা তিনটি শব্দ…ইত্তিফাক্, ইত্‌মাদ্ আর কুরবানি…একতা, বিশ্বাস আর আত্মোৎসর্গ…

গায়ের চামড়া ভেদ করে প্রত্যেক সৈনিকের মনের ভেতর গিয়ে লাগলো সেই তিনটি শব্দের অরুণাভা…

এবং সেই মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিকদের সামনে তাদের সর্ব্বময় নেতা রূপে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, যে-প্রতিশ্রুতি তিনি জানেন তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করতে পারবেন, যে-প্রতিশ্রুতি অন্তর্নিহিত ছিল ভারতবর্ষের বাস্তবতার মধ্যে, যার মধ্যে ছিল না এক তিল অতিরঞ্জনের মোহ, নির্ভীক সেনাপতির মতন তিনি দিলেন সেই সত্য প্রতিশ্রুতি, আমি চাই তোমার সর্ব্বস্ব…প্রতিদানে আমি দেবো ক্ষুধা, অনশন…মৃত্যু…

বিবেকানন্দ যেদিন নিবেদিতাকে আহ্বান করেছিলেন ভারতবর্ষে

আসতে, সেদিন সেই বীর সন্ন্যাসী এই একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁকে।

যে চরম নির্লোভ, যে চরম দুঃসাহসিক, সেই পারে এই প্রতিশ্রুতি দিতে।

১১৭

১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাই,

সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে প্রবাসী ভারতীয়দের সামনে ঘোষণা করেন তাঁর সংকল্পের কথা, আজাদ হিন্দ বাহিনীকে পুনর্গঠিত করে তিনি ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে সমরাভিযানে বেরুবেন—

১৯৪৫ সালের ২৪শে এপ্রিল,

সুভাষচন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বর্ম্মা থেকে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন,—

মাঝখানে শুধু এক বছর ন'মাস সময় মাত্র একুশ মাস।

এই একুশটী মাসকে সুভাষচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর আদর্শ-বাদ, তাঁর কর্ম্ম-প্রতিভা, তাঁর সামরিক-কুশলতা আর ভারত-প্রেম দিয়ে এমনভাবে বিমণ্ডিত করে গেলেন যে, এই একুশটি মাসের ক্ষণ-আয়ুর মধ্যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষের মর্য্যাদার প্রাণ-বীজ নিহিত হয়ে রইলো। এই একুশটী মাসের মধ্যে তাঁর প্রতিদিনের কাজে, কথায়, ব্যবহারে, তাঁর জীবন-নাট্যের চরম অভিব্যক্তিরূপে ভারত-চরিত্রের যে অপরূপ শতদল বিকশিত হয়ে উঠলো, তার অবিনাশী সৌরভ তাঁকে ছাড়িয়ে তাঁর জাতির ইতিহাসে শাশ্বতকালের মতন রয়ে গেল। এই একুশটি মাসের কীর্ত্তি, জাগতিক জয়-পরাজয়ের উর্দ্ধে, সাময়িক লাভ-লোকসানের হিসাবের উর্দ্ধে, তাঁকে পৌঁছে দিল ভারত-ইতিহাসের সেই মর্ম্মকেন্দ্রে, যেখানে বিরাজ করছেন নিত্যপ্রাণ-উৎসরূপে মৃত্যুহীন ভারতের অমর দেবতারা, ভারতের শাশ্বত প্রতিনিধিরা, ভারতের প্রাণ-পুরুষেরা। এই একুশটী মাসের সাধনা তাঁকে তাঁর সমসাময়িক সহযাত্রীদের স্তর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে এমন এক স্তরে নিয়ে গেল, যেখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাই ওঠে না।

এলগিন্ রোড থেকে ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে যে-সুভাষচন্দ্র বেরিয়ে পড়েছিলেন, তিনি ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর বহু

অনুচরের মধ্যে একজন অনুচর, জওহরলাল-প্যাটেলের সহকর্ম্মী, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিকদের মধ্যে একজন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ; বর্ম্মার রণক্ষেত্র থেকে যে-সুভাষচন্দ্র আবার অনির্দ্দিষ্ট পথে বেরিয়ে পড়লেন, তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধীর ইতিহাস-সহচর, ভারতবর্ষের অনন্য-সাধারণ অতি মানবদের একজন, ভারতবর্ষের কর্ম্মী নন্ ভারতবর্ষের প্রতীক, জীবন্ত ভারতবর্ষ।

১১৮

সিঙ্গাপুর থেকে বর্ম্মা…

তার মধ্যে রয়েছে একটা জীবন-নাট্যের চরম পরিণতি… মানব-মনের একটা পরিপূর্ণ বিকাশ…মানবীয় চরিত্রের রহস্যঘন পরম প্রকাশ…লৌকিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে অলৌকিকের অভিব্যক্তি।

আজাদ হিন্দের সৈন্য সংখ্যা কত, তারা কত যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, কত যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, তাদের নেতারা যুদ্ধে হেরেছে কি জিতেছে, ইংরেজ বা আমেরিকান্ সৈন্যদের তুলনায় তারা বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছে কি কম কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তাদের অভিযানের ফলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে, জাপানী-দের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় নেতাজী ভুল করেছেন না ঠিক করেছেন, এই জাতীয় বিচার-বিবেচনায় নেতাজীর চরিত্রের পরিমাপ হয় না। সেনাপতি হিসাবে তিনি এমন কোন যুদ্ধে জয়ী হন নি, যাতে তাঁর নাম সমর-ইতিহাসে থাকতে পারে ; প্রত্যক্ষ ফলাফলের দিক থেকে তাঁর এই শেষ কয়েক মাসের কীর্ত্তি জাতির লাভের হিসাবের খাতায় না লেখাও হতে পারে, ভারতের স্বাধীনতায় তাঁর দান শুধু সাময়িক বক্তৃতার বিষয় হয়ে থাকতেও পারে ; তাঁর প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ সরকারের পরমায়ু দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বিশালতায় তলিয়ে যাবে না, এমন ঘটনাও নয়, কিন্তু নেতাজীর চরিত্র এই সব ঘটনা বা তার ফলাফলের দ্বারা পরিমেয় নয়, এই সব ঘটনার অন্তরে তিনি যে প্রবল শক্তিকে মুক্তি দিয়ে গিয়েছেন, জীবনের প্রতিটি কাজের সাধারণত্বের ভেতর যে অসাধারণ প্রাণকে জাগিয়ে গিয়েছেন, সামান্য ঘটনার মধ্যে যে অসামান্য ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে গিয়েছেন, যা হয়ত তুচ্ছ জড় হয়ে পড়ে থাকতো, তাকে এমন ভাবে বেগবান

গতিশীল করে গিয়েছেন তাঁর চরিত্রের স্পর্শ দিয়ে, সেই প্রমুক্ত ইচ্ছা শক্তি, সেই প্রজ্বলিত প্রাণ-বহ্নি, আদর্শের সেই দীপ্ত-অনুরাগ, চরিত্রের সেই পাবক গতি, আমাদের সমগ্র জাতীয় চেতনাকে করে তুলেছে আলোকময়; আমাদের অজ্ঞাতে, আমাদের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির বাইরে, প্রভাত-সূর্য্যের দীপ্তির মতন জ্বলছে তরুণ ভারতের মনের আকাশে নেতাজীর চরিত্রের সেই অরুণাভা…ফুল জানুক আর নাই জানুক, সেই সূর্য্য, তারি আলোক, তারি উত্তাপ, তাকে দিয়েছে বর্ণের গৌরব, প্রাণের সৌরভ।

নব-জাগ্রত তরুণ ভারতের চিত্ত-কোরক যে আলোক-রশ্মির দিকে চেয়ে আছে তার পূর্ণ বিকাশের জন্যে, সেই প্রাণ-রশ্মির আধার হলো নেতাজী…নেতাজীর জীবনের শেষতম সেই কয়েকটী দিনের মধ্যে রয়ে গিয়েছে, অগ্রদূতরূপে, নব-জাগ্রত তরুণ ভারতের পূর্ণ সম্ভাবনা। নেতাজীর জীবনের শেষতম অধ্যায় হলো আত্ম-প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম অধ্যায়। সেইখানেই আছে ভারতের নব-অরুণোদয়।

১১৯

ভারতের মাটিতে তখনও ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় নি…ইংরেজ কংগ্রেসের হাতে ভারতবর্ষের শাসন ভার ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, একথা তখন ষোল আনা কংগ্রেসী নেতাও স্বপ্নে ভাবতে পারতেন না…ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তখনো অনিশ্চয়তার দূর আকাশে দূরতম নক্ষত্রের মতন ক্ষীণালোকে স্পন্দিত হচ্ছে…সুভাষচন্দ্র অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করে, সেই স্বাধীন ভারতবর্ষেরই জন্ম দিলেন…যা ছিল স্বপ্ন…হলো বাস্তব।

দূর বিদেশ…সহায় নেই, সঙ্গতি নেই, সৈন্য নেই, অর্থ নেই… চারিদিকে মহাযুদ্ধের অস্থির অনিশ্চয়তা…তার মধ্যে শুধু একজন পলাতক বিপ্লবী…

মাথার ওপর মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের মতন জ্বলছে জয়োল্লাস-দীপ্ত জাপানের বিশ্বত্রাস সামরিক শক্তি…সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়া তার কৃতদাস …কল্পনার অতীত সুদূর লোকে তখন হিরোসিমা…

তার মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখলো, স্বাধীন ভারতের। পরাধীন ভারতে ইংরেজের আইনে স্তব্ধ নিষিদ্ধ বেতার-যন্ত্রে নিশীথে নিভৃত কক্ষের নির্জ্জনতায় কেউ কেউ শুনলো, আকাশ পথে ভেসে আসছে

শুভ্র একটী প্রণাম, যাত্রা আরম্ভের মুখে নেতাজী প্রণাম করেছেন গান্ধীজীকে, নব-ভারতের জনককে···

চারদিকে কাণাঘুষায় ছড়িয়ে পড়লো সংবাদ, সুভাষচন্দ্র সসৈন্যে আসছেন ভারতের দিকে···জাপানী সৈন্যদের নিয়ে আসছেন সুভাষচন্দ্র···ইংরেজ, কংগ্রেস, জনতা সকলেই হয়ে উঠলো সংক্ষুব্ধ··· সকলের মুখে ফুটে উঠলো ব্যঙ্গের হাসি···শার্দ্দুলকে পথ দেখিয়ে আসছে শৃগাল—ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই মর্ম্মান্তিক ভুলেরই পুনরাবৃত্তি।

I. N. A.···প্রভু ইংরেজ বল্লো, Imperial Nippon Army ···কংগ্রেস, কংগ্রেসের নেতারা, অহিংস আন্দোলনের প্রবর্ত্তক তাঁরা, দেখলেন তার মধ্যে কংগ্রেস-বিতাড়িত বিপ্লবীর ভ্রান্ত দুর্ব্বুদ্ধি···সুপবিত্র দায়িত্বে তাঁরা উদ্যত হলেন জনতাকে সতর্ক করতে এই মারাত্মক ঐতিহাসিক ভ্রান্তি সম্পর্কে···জনতার মুখে মুখে আবার সচল হয়ে উঠলো মীরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎশেঠের নাম···জনতার মধ্যে যারা প্রগতিশীল, বিশ্ব-কুম্যুনের সভ্য, তাঁরা বলে উঠলেন, কুইস্‌লিং···

এই পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলো, আর্জি হুকুমৎ আজাদ্ হিন্দ্···স্বাধীন ভারতবর্ষ···

ধাত্রীদেবতার মতন জাপান এই নবজাত শিশুকে আশীর্ব্বাদ করলো·· আদরে কোলে তুলে নিলো।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের মধ্যে এই রকম অনেক পিতৃহীন শিশুই জন্মগ্রহণ করেছে···ধাত্রীদেবতারাই যাদের পালক, অভিভাবক। অভিভাবকেরা আদর করে এই সব অস্থায়ী শিশুরাষ্ট্রের নাম দিয়েছিলেন, puppet government···তাঁদের খেলবার পুতুল বিশেষ···তাঁরা যেখানে রাখবেন সেখানে থাকবে, যেখানে বসাবেন সেখানে বসবে, যেখানে দাঁড় করাবেন সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। বিশ্বরাজনীতিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দান, নতুন ধরণের এক রাজনৈতিক অস্ত্র।

সমগ্র পাশ্চাত্যশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী মহাশক্তিধর জাপান আজাদ হিন্দ্ সরকারকে সেই puppet government রূপেই কোলে তুলে নিলো।

কিন্তু…কোলে তুলে নিতে গিয়ে দেখলো, কাঠের পুতুলের মতন হাল্কা তো নয়, নীরেট সজীব মানুষের মতন ভারী। অভিশপ্ত মাতার মুক্তির মহাশ্বাস স্বরূপ গরুড়ের মতন সে জন্মগ্রহণ করেছে, জননীর গর্ভ থেকেই পূর্ণ অবয়ব আর পূর্ণশক্তি নিয়ে; গরুড়ের মতন দুঃসাহস নিয়ে চোখ খুলেই সামনে দেখে আকাশে লাল-গোলকের মতন রয়েছে প্রভাত সূর্য্য, ক্রীড়নক মনে করে শিশু গরুড় ছোটে সূর্য্যকে কুক্ষিগত করবার জন্যে।

সেই শিশুরাষ্ট্র তেমনি সহজাত দুঃসাহসে জন্মেই দাবী করলো জগতের শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্রের সমকক্ষতা, সমান মর্য্যাদায় মৈত্রী। স্বাধীন ভারতবর্ষ চায় তার উপযুক্ত মর্য্যাদা।

আজাদ হিন্দ সরকার ভূমিহীন হতে পারে, তার রাজকোষে কাণা কড়িও না থাকতে পারে, তার পতাকাবাহী বিরাট সেনাদল বা নৌবহর না থাকতে পারে, কিন্তু সে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতীক, স্বাধীন ভারতবর্ষের মর্য্যাদার সে বাহক, সে-মর্য্যাদাকে সে কিছুতেই হতে দেবে না ক্ষুণ্ণ।

টোকিও-তে জাপ-প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ করে এনেছেন, পূর্ব্ব-এশিয়ায় জাপানের মিত্র-রাষ্ট্রদের। নবজাত আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিনিধি-স্বরূপ এসেছেন সুভাষচন্দ্র। জাপানী সংবাদ-পত্রে এক বাক্যে বিঘোষিত হয়েছে সুভাষচন্দ্রের অনন্যসাধারণতা। জাপানী সামরিক নেতারা বুঝেছেন, ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করতে হলে, সুভাষচন্দ্রের অপেক্ষা শাণিত অস্ত্র আর দ্বিতীয় নেই। তাই সুভাষচন্দ্রকে তোয়াজ করবার জন্য প্রধান মন্ত্রী তোজো প্রকাশ্য সভায় সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করে বলেন, আমি জানি, হিজ হাইনেস্ সুভাষচন্দ্র যখন জয়ী হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করবেন, তখন তিনি হবেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী…

তৎক্ষণাৎ হিজ হাইনেস্ সুভাষচন্দ্র প্রতিবাদ করে ওঠেন, মহামান্য জাপ-প্রধানমন্ত্রী আমার প্রতি স্নেহের আধিক্যে একটা মস্ত বড় ভুল করেছেন, স্বাধীন ভারতবর্ষ কাকে তার প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত করবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে স্বাধীন ভারতের প্রজা-সাধারণের ওপর। আমি সেই স্বাধীন ভারতবর্ষের একজন প্রজা ছাড়া আর কিছু নই। ভারতবর্ষের সেই স্বাধীনতাকে অর্জ্জন

করাই আমার আজাদ হিন্দ সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। এ ছাড়া আমার কোন দ্বিতীয় কাম্য নেই। এশিয়ায় ভারতবর্ষ আর জাপানের দীর্ঘকাল স্থায়ী আত্মীয়তাকে স্মরণ করে আমি দাবী করছি জাপানের মৈত্রী, স্বাধীন ভারতবর্ষ দাবী করছে স্বাধীন জাপানের মৈত্রী।

তৎক্ষণাৎ সেই মৈত্রীর নিদর্শন স্বরূপ জাপ-প্রধানমন্ত্রী ভূমিহীন আজাদ হিন্দ সরকারকে দান করলেন, ইংরেজের কাছ থেকে অধিকৃত আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজ্যাধিকার। আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করলেন, সেই প্রথম স্বাধীন ভারত-খণ্ড। যে আন্দামান দ্বীপের বন্দীশালায় ইংরেজ চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে বাংলার আর ভারতের বিপ্লব-চেতনাকে, সেই নির্য্যাতনের বন্দীশালায় প্রথম উড্ডীন হলো স্বাধীন ভারতের জয়-পতাকা।

আজাদ হিন্দ সরকারের তরফ থেকে নেতাজী বোস মহাগৌরবে এই সামান্য ভূমিখণ্ড গ্রহণ করলেন।

পরিমাণ বা আয়তনের দিক থেকে এই দুটী জনপরিত্যক্ত অনুর্ব্বর বন্য ভূমিখণ্ড নিতান্ত তুচ্ছ। কিন্তু নেতাজী সেই সামান্য বন্য ভূমিখণ্ডটুকুকেই স্বাধীন ভারতের অঙ্গরূপে মাথায় তুলে নিলেন এবং সেই অনুর্ব্বর জনবিরল বন্য দ্বীপে নতুন রাজ্য গড়ে তোলবার জন্যে পথ-প্রদর্শকের সুবিপুল উৎসাহে তাঁর সমস্ত কর্ম্ম-প্রতিভা নিযুক্ত করলেন। সেই বিরূপ আয়তনে সেই স্বল্পকালের মধ্যে তিনি যে কি নিষ্ঠার সঙ্গে স্বাধীন-ভারতের একটা টুকরো গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তা আজ আমরা আজাদ হিন্দ সরকারের কাগজ-পত্র দেখে বিস্মিত হয়ে যাই। সেই অনুর্ব্বর বন্য দ্বীপের শাসনাধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেখানে একটা পরিপূর্ণ শাসনযন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন; স্কুল, সংবাদপত্র, জনস্বাস্থ্য, পুলিশ, হাসপাতাল, যা কিছু দরকার একটা পরিপূর্ণ নাগরিক জীবনের পক্ষে, সেই একান্ত বিরূপ অবস্থার ভেতরে সমস্তই তিনি একান্ত নিষ্ঠা সহকারে গড়ে তুলতে অগ্রসর হন।

যত তুচ্ছ, যত সামান্যই হোক্, এই সময়কার সমস্ত ঘটনা বা কাজের ভেতরে ফুটে উঠেছিল তাঁর সুগভীর কর্ম্ম-নিষ্ঠা আর নিশ্ছিদ্র

গঠন-প্রতিভা। আজাদ হিন্দ সরকারের সেই স্বল্পায়ু সাময়িক অস্তিত্বের শত বাধাবিঘ্ন আর কৃচ্ছ্র তার ভেতর থেকে ফুটে উঠেছে একজন মানুষের লৌহ-চরিত্রের নিষ্ঠা আর নিশ্ছিদ্র কর্ম্ম-শক্তির কৃতিত্ব। যা কিছু তুচ্ছ, যা কিছু মনে হয় সাময়িক, সামান্য, নেতাজী নিজের চরিত্র দিয়ে তাকে করে তুলেছিলেন অসামান্য, নিত্য ও ধ্রুব। তিনি যেটুকু পেয়েছিলেন, যেটুকু করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল না সামান্যতম ফঁাকির অবকাশ, ছিল না তার মধ্যে অপটু বিশৃঙ্খলার বিন্দুমাত্র উদাসীনতা, ছিল না তার মধ্যে ঢেউ-এ ভেসে-চলার এতটুকু অসাহয়তা। সামান্যের মধ্যে তার গাঁথুনি ছিল নিরেট, সুশৃঙ্খল, নিখুঁত, সামরিক বাধ্যতায় বাঁধা। ভারতীয় চরিত্রের সংশোধন। তিনি যতটুকু চলেছিলেন, এগিয়েই চলেছিলেন। নিজের চরিত্র দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন ভারতীয় চরিত্র। আজাদ হিন্দ সরকারের স্বল্পায়ু জীবনের অন্যতম ঘটনা দীপ্যমান হয়ে আছে নেতাজীর চরিত্রের বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে। স্থানীয় শাসক রূপে লেঃ কর্ণেল লোগানাদানের যে সব রিপোর্ট ইংরেজরা বিচারের সময় দাখিল করে, তা থেকে বোঝা যায় কি নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা সেই অনুর্ব্বর বন্য দ্বীপে স্বাধীন ভারতখণ্ড গড়ে তুলতে উদ্যত হয়েছিলেন।

ভারত স্বাধীন হবার আগেই নেতাজী স্বাধীন ভারতের মর্য্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছে ভারতবর্ষের মর্য্যাদা এত বড় জিনিস যে তার বিনিময় জগতে আর কিছু নেই, এই মহাসত্যকে নেতাজী বিশ্ব-যুদ্ধের রক্তাক্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে একান্ত বাস্তব ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

জাপানের সামরিক নেতারা যখন শুনলেন হিজ হাইনেস্ নেতাজী বোস্ ভারত-আক্রমণের জন্যে স্বতন্ত্রভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠিত করবেন, তাঁদের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। একবাক্যে তাঁরা ঘোষণা করলেন, তা হতে পারে না। এই দলের নেতা হলেন জাপানী জেনারেল তারাওচী।

তারাওচী বল্লেন, নেতাজী যে সব সৈন্য নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে চাইছেন, তারা হলো ইংরেজের ভাড়াটে সৈনিক, আমাদের বন্দী…এই সব ভাড়াটে সৈনিক কখনই জাপানের বীর সৈনিকদের সমকক্ষ হতে পারে না…তাই ভারত-আক্রমণের মতন

দুরূহ কাজ তাদের দ্বারা কখনই হতে পারে না, সে কাজ একমাত্র সম্ভব জাপানের বীর সৈনিকদের দ্বারা।

হিজ হাইনেস্ নেতাজী বোস্ সেই কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী তোজোকে স্পষ্টভাষায় লিখে জানালেন, আজাদ হিন্দ সরকারের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম এই কথা আমি জাপ সরকারকে জানাতে চাই, আজাদ হিন্দ সরকার হলো স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতীক এবং এই সরকারের সেনাবাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য হলো, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা। তাই ভারতবর্ষ যদি আক্রমণ করতে হয়, আজাদ হিন্দ বাহিনীই করবে, জাপ-বাহিনী নয়। আমি জাপানের সামরিক নেতাদের স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, অন্য দেশের সৈন্য যতই শক্তিশালী হোক্ তার সাহায্যে স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা দাসত্বের চেয়েও ঘৃণ্য। জেনারেল তারাওচী যাদের ভাড়াটে সৈনিক বলে তুচ্ছ করেছেন, তারা যতই তুচ্ছ হোক্, যতই দুর্ব্বল হোক্, তাদের বুকের রক্ত দিয়েই তারা তাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করবে। আশা করি জাপানের প্রধান-মন্ত্রী আমার এই অন্তরের কথাকে শ্রদ্ধা করবেন।

সেই অগ্নিবাণীকে তুচ্ছ করতে পারলেন না জাপ প্রধানমন্ত্রী। নেতাজীর সেই দীপ্ত আত্মপ্রত্যয়ের সামনে ভেসে গেল জাপ-সামরিক নেতাদের উন্নাসিক প্রতিবাদ।

কিন্তু সেইখান থেকে শুরু হলো, একটার পর একটা প্রতি-বাদের প্রতিবন্ধক। বিজয়ী জাপ-সামরিক নেতারা একজন পলাতক ভারতীয় বিপ্লবীর এই বজ্র-অনমনীয়তাকে সহজে স্বীকার করে নিতে পারে নি। একটার পর একটা এসেছে দম্ভের বাধা, একা অবিচল পাহাড়ের মতন দাঁড়িয়ে নেতাজী প্রত্যেক বাধাকে করেছেন চূর্ণ। এই একটি লোকের বজ্র-অনমনীয়তার সামনে বিজয়ী জাপানের সামরিক প্রভুদের দম্ভ এমন ভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় যে, ভাবতে বিস্ময় লাগে, জাপানের সেই দীপ্ত বিজয় গর্ব্বের যুগে, জাপানীরা হিজ হাইনেস্ নেতাজী বোসকে তাদের পরমদেবতা মিকাডোর মতন সম্মানের চোখে দেখতে শিখে। সেদিন নেতাজী বোস নিজের সাধনায় যে-সম্মান অর্জ্জন করেছিলেন, সে-সম্মান তিনি নিজে গ্রহণ করেন নি, সে-সম্মান তিনি গ্রহণ করেছিলেন

স্বাধীন ভারতবর্ষের হয়ে…তাঁর চরিত্রে সম্মানিত হয়েছিল স্বাধীন ভারতবর্ষ…স্বাধীন ভারতবর্ষের মর্য্যাদা। আজ সেই স্বাধীন ভারতবর্ষ জানে না, জানতে চেষ্টা করে না, কোথায় আছে নেতাজীর দেহ বা দেহাবশেষ। অথচ নেতাজী তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত দিয়ে আমাদের জন্যে গড়ে দিয়েছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের মর্য্যাদাকে।

জাপানে আসবার আগে, জার্ম্মানীতে, বিজয়ী নাৎসী পার্টি মিউনিকে নেতাজীকে প্রকাশ্যে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্যে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করে। সেই উৎসবে স্থির হয়, নেতাজী জার্ম্মান জাতিকে আহ্বান করে বক্তৃতা দেবেন। সেই সময় ঠিক এমনি অবস্থায় এশিয়া থেকে আর একজন পলাতক রাষ্ট্রনেতা এসেছিলেন জার্ম্মানীতে, জেরুজালেমের গ্রাণ্ড মুফতি। কিন্তু তিনি এ সম্মান পান নি।

উৎসবের আগের দিন রাত্রিতে সহসা নেতাজী ঘরে বসে শুনলেন হিটলার বক্তৃতা দিচ্ছেন…রাজনৈতিক স্বার্থে হিটলার সেই বক্তৃতায় ইংরেজ সরকারের মনজয় করবার বুলি আওড়াচ্ছেন…বক্তৃতার এক জায়গায় হিটলার ভারতে ইংরেজ-শাসনের প্রশংসা করলেন…

নেতাজীর বেতার যন্ত্র বন্ধ করে দিলেন। মিউনিকের উৎসব-সভার কর্ত্তাদের জানিয়ে দিলেন, তিনি সেই সভায় যাবেন না এবং কোন বক্তৃতাও দেবেন না এবং হিটলারের জার্ম্মানীতে বসে তিনি হিটলারকে জানিয়ে দিলেন, হিটলার ইংরেজের তোষামোদ করতে পারেন কিন্তু সে-তোষামোদের খেলায় নেতাজী সঙ্গী হতে পারেন না।

১২০

১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাস…জাপ সামরিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে পূর্ব্ব-এশিয়ায় জাপানের মিত্র শক্তিদের প্রতিনিধিদের সম্মিলিত সামরিক বৈঠক বসেছে। এই বৈঠকের শেষে ভারত-আক্রমণের ব্যবস্থার জন্যে একটা সম্মিলিত সামরিক কমিটী গঠিত হলো। ভারতবর্ষের যুদ্ধ ভারত-জাপ-প্রতিনিধিদের সম্মিলিত এই কমিটীর দ্বারা পরিচালিত হবে।

জাপানের সামরিক প্রতিনিধিরা প্রস্তাব করলেন, এই যুক্ত কমিটীর স্থায়ী সভাপতি হবেন একজন জাপ-সেনাপতি।

হিজ হাইনেস্ নেতাজী প্রতিবাদ করে উঠলেন, তা হতে পারে না। ভারত-আক্রমণ সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই একজন জাপ-সেনাপতির নির্দ্দেশ মানতে আজাদ হিন্দের সৈনিকেরা রাজী হবে না।

জাপ-সামরিক নেতারা এই লোকটীর সদাজাগ্রত অনমনীয়তায় বিব্রত হয়ে ওঠে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে তর্ক-বিতর্ক। তেমনি অনমনীয় থেকে যান হিজ হাইনেস্ নেতাজী বোস।

বলেন, যদি একজন ভারতীয়কে এই সম্মিলিত কমিটীর স্থায়ী সভাপতি করতে জাপ-প্রতিনিধিদের মর্য্যাদায় আঘাত লাগে, তাহলে স্থায়ী সভাপতি পদেরই কোন প্রয়োজন নেই। উভয় দলের সভ্যদের মিলিত পরামর্শেই এই কমিটি কাজ করবে। এবং সভার কাজ চালাবার জন্যে প্রয়োজনানুসারে পালা করে এক একজন সভাপতি হবে।

সেই কথাই কমিটি মেনে নিতে বাধ্য হলো।

কিন্তু সেইখানেই এই সমস্যা মিটে গেল না। আবার আর একদিক দিয়ে আসে ঠিক এই সমস্যাই।

জাপ-সরকার থেকে হিজ হাইনেস নেতাজী বোসকে জানানো হলো, আজাদ হিন্দ সরকারে সরবরাহ ও সৈন্য-সংগ্রহ বিভাগে মন্ত্রী মনোনীত করবার আগে, জাপ-সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। জাপ-সরকারের অনুমোদন ছাড়া এই একান্ত প্রয়োজনীয় সামরিক পদে কাউকে মনোনীত করা চলবে না।

আবার সেই মর্য্যাদার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা, জাপানী প্রভুত্বের দাবীর জের।

নেতাজী উত্তর দিলেন, আজাদ হিন্দ সরকার কাকে তার সরবরাহ মন্ত্রী করবে, সে বিষয় হলো সম্পূর্ণ আজাদ হিন্দ সরকারের ঘরোয়া ব্যাপার। তবে মিত্র শক্তি হিসেবে তিনি অবশ্যই জাপ সরকারকে জানাবেন এই প্রয়োজনীয় পদে তাঁরা কাকে মনোনীত করলেন। মনোনয়নের আগে নয়, মনোনয়নের পর যথারীতি অবশ্যই তিনি জানাবেন।

সেই ব্যবস্থা মতই কাজ হলো।

১২১

জাপানের সঙ্গে চুক্তি করে নেতাজী আজাদ ফৌজকে নতুন করে গড়ে তোলবার কাজে লাগলেন।

স্পষ্টভাষায় চুক্তি হলো—ভারত-আক্রমণ করবে আজাদ হিন্দ ফৌজ, আজাদ হিন্দ সরকারের অধানে, জাপ-সৈন্যরা মিত্র হিসাবে দরকার হলে সাহায্য করবে।

এই যুদ্ধে জাপানের নিজের প্রয়োজনে জাপ-সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজকে কোন কাজে বা কোন যুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবেন না।

জাপ-সরকার এই চুক্তিকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু যুদ্ধের তাগিদে কিছুদিন পরেই এমন সময় এলো যখন, স্থানীয় জাপ-সামরিক কর্ত্তারা এই চুক্তিকে মূল্য দিতে ভুলে গেল। যুদ্ধের সময় এই জাতীয় চুক্তির কতখানিই বা মূল্য? আর জাপান যখন আজাদ হিন্দ সরকারের মিত্র তখন মিত্রের প্রয়োজনে আজাদ হিন্দ সরকারের পরিচালক কখনই এই চুক্তির কথা ধরে বসে থাকতে পারেন না। এই কথাই স্থানীয় জাপকর্ত্তারা ধরে নিলেন। তা ছাড়া যুদ্ধের চেহারার সঙ্গে আদর্শবাদিতার চেহারাও বদলায়। প্রতিদিন বদলাচ্ছে।

১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে শ্যামদেশে স্থানীয় বিপ্লবীর একটা দল সেখানকার জাপানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে উঠলো। জাপানী সৈন্যরা বিপন্ন হয়ে পড়লো। স্থানীয় সামরিক কর্ত্তারা হিজ হাইনেস্ নেতাজীকে আবেদন করলেন, বিপ্লবীদের দমন করবার জন্যে আজাদ হিন্দ বাহিনীর একটা অংশকে পাঠাতে।

নেতাজী তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিলেন, এশিয়ার কোন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে তাঁর বাহিনী গঠিত হয় নি, তাঁর বাহিনীর একমাত্র কাজ হলো ভারত-আক্রমণ, ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর একটি সৈন্যও শ্যামবাসীদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত হবে না।

সেই সময় পূর্ব্ব-এশিয়ায় বসে জাপ সামরিক কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে এই আদেশ জারী করা কতখানি হিম্মতের প্রয়োজন, তা আজ কল্পনা করাও শক্ত।

তার পরের বছর মার্চ্চ মাসে বর্মাতেও ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটে। বর্মা তখন জাপানের অধিকারে। এমন সময় বর্মার জাতীয় সৈনিক বাহিনীর একটা অংশ জাপ-সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ওঠে। স্থানীয় জাপ সামরিক কর্ত্তারা নেতাজীকে জানালেন, বর্ম্মী বিপ্লবীদের দমন করবার জন্যে অবিলম্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে নিযুক্ত করা হোক্।

নেতাজী অবিলম্বে সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন।

তাঁর চরিত্রের এই অনমনীয় তেজস্বিতা তখন যে শুধু আজাদ হিন্দ বাহিনীর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা নয়, জাপান সৈনিক আর সেনা-নায়ক-মহলেও তাঁর চরিত্র ইন্দ্রজালের মতন মায়া-প্রভাব বিস্তার করে।

শ্রদ্ধা নিমেষে পরিণত হয় বিস্ময়ে। বিস্ময় সৃজন করে রূপ-কথার নায়ককে। যে রূপকথার নায়ক ঘুমিয়ে থাকে প্রত্যেক মানুষের মনে। প্রতিদিনের পরিচিত মানুষ হয়ে ওঠে অলৌকিক। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রমুগ্ধ মানুষ সৃজন করে কাহিনী। নেতাজীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিমুগ্ধ কাহিনী।

আজাদ হিন্দ বাহিনী পুনর্গঠন করতে গিয়ে নেতাজীর প্রথম দৃষ্টি গিয়ে পড়লো, পূর্ব্ব-এশিয়ার বিভিন্ন কারাগারে। সেখানে জাপানীদের বন্দী হয়ে ছিল বহু ভারতীয় সৈনিক, বৃটিশের সঙ্গে যারা এসেছিল যুদ্ধ করতে।

স্থানীয় জাপ সামরিক কর্ত্তাদের কাছে হিজ হাইনেস্ নেতাজী বোস্ সেই সব ভারতীয় বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করলেন।

স্থানীয় জাপ-কর্ত্তারা নেতাজীর সেই দাবীতে রুষ্ট হয়ে জানালেন, জাপ সরকারের হুকুম ব্যতিরেকে তাঁরা সেই সব বন্দীদের কিছুতেই মুক্তি দিতে পারেন না। এ ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে কোন দাবী শুনতে তাঁরা প্রস্তুত নন্।

নেতাজী জাপ কমাণ্ডারকে লিখে জানালেন, একজন সামরিক কর্ম্মচারীর উচিত ছিল, তাঁর এই দাবীর কথা যথারীতি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে অনুমোদন নিয়ে আসা।

সেই সঙ্গে নেতাজী জাপ কমাণ্ডারকে জানিয়ে দিলেন, আজ আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেরকম প্রস্তুত হয়েছি, প্রয়ো-

জন হলে জাপানের বিরুদ্ধেও সেরকম যুদ্ধ করতে আমরা পরাঙ্মুখ হবো না, এ কথা যেন আপনারা ভুলে যাবেন না।

এই দাবীর সংবাদ যখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌঁছল তখন স্থানীয় জাপ কমাণ্ডারের কাছে হুকুম এলো, জাপানের স্থানীয় সামরিক কর্ম্মচারীরা হিজ হাইনেস্ নেতাজী বোসের হুকুমনামাকে যেন মিকাডোর হুকুমনামার মতই শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

এটা ইতিহাসের অতিরঞ্জন নয়···অকলঙ্ক চরিত্র আর অতি-মানবীয় ব্যক্তিত্বের অর্জ্জিত ফল।

এই চারিত্রিক প্রভাবই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। সামান্যের মধ্যে জাগিয়ে তোলে অসামান্যকে।

জাপানের সেই বিজয়-গর্ব্বের যুগে জাপানের ভাগ্য-বিধাতারা আনন্দে নেতাজী বোস্‌কে তাঁদের অকুণ্ঠ মৈত্রীর সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। একান্ত গূঢ় রাজনৈতিক সমস্যায় তাঁরা নেতাজীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং নেতাজীর প্রভাবেই সেদিন অধিকৃত হতভাগ্য চীনের ওপর জাপানের প্রভুত্বের আতিশয্য প্রশমিত হয়। জগৎ দেখলো, সহসা অধিকৃত চীনে জাপানের দম্ভ-রীতি পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। জাপ সামরিক কর্ত্তারা সর্ব্ব বিষয়ে নেতাজীর আদর্শবাদকে সম্মান দেখিয়ে এসেছেন। স্থানীয় অথবা নিম্নতর শ্রেণীর জাপ সামরিক কর্ত্তাদের সঙ্গে তাঁর যতই বিরোধ ঘটে থাকুক না কেন, জাপানের কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলী সর্ব্বদাই তাঁকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে এসেছেন। এবং নেতাজীও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের দ্বারা সেই সম্মানকে অর্জ্জন ও সংরক্ষণ করে এসেছেন। বিশ্ব-রাজনীতির দুর্দ্দান্ত খেলায় চোখের সামনে আমরা দেখলাম, এই আন্তর্জাতিক সম্মানের আঁচে কত ব্যক্তিত্ব মোমের পুতুলের মতন গলে গেল, কাদার ঢেলার মতন কত লোকের ছাঁচ উল্‌টোলো পাল্‌টালো কিন্তু তার মধ্যে দেখলাম, পর্ব্বতের মতন অপরিবর্ত্তনীয় অটল এই একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব···একজন ভারতবাসী···একজন বাঙালী···

আজাদ হিন্দ সরকারের হেডকোয়ার্টার তখন রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হয়েছে···জাপ সরকার থেকে মিঃ হার্চিয়া এলেন, হিন্দ সরকারের কাছে জাপানের রাষ্ট্রদূত রূপে। যুদ্ধের সেই দুর্দ্দান্ত দ্রুতগতির মধ্যে মিঃ হার্চিয়া এলেন রাষ্ট্রদূত হয়ে কিন্তু যে কোন কারণেই হোক্

সঙ্গে নিয়ে আসতে ভুলে গেলেন যথারীতি রাজকীয় পরিচয়-পত্র। যখনি কোন রাষ্ট্রদূত সর্ব্বপ্রথম অন্য রাষ্ট্রের পরিচালকের কাছে উপস্থিত হন, রাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী তাঁকে নিয়ে আসতে হয় তাঁর রাষ্ট্রের পরিচালকের পরিচয়-পত্র। দুর্ভাগ্য বশতঃ মিঃ হাচিয়া তা না নিয়েই উপস্থিত হলেন রেঙ্গুনে এবং কার্য্যগতিকে দেখা করতে এলেন হিজ হাইনেস্ নেতাজী বোসের সঙ্গে। দ্বাররক্ষী ফিরে এসে মিঃ হাচিয়াকে জানালো, হিজ্ হাইনেস্ পরিচয়-পত্র ছাড়া আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না।

সেই সামান্য আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপতির এই প্রত্যাখানে মিঃ হাচিয়া ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত উত্তেজিত আস্ফালন সত্বেও তাঁকে ফিরে যেতে হলো এবং জাপান থেকে যথারীতি পরিচয়-পত্র তাঁকে আনতেই হলো। পরিচয়-পত্র আসতে যেটুকু সময় লাগলো, তার মধ্যে অস্থায়ী হিন্দ সরকারের আয়ুও শেষ হয়ে গেল। তবু সেই ক্ষণ-স্থায়িত্বের মধ্যে সিংহ সিংহই হয়ে রইলো।

জাপানী সেনাপতিরা বড় বড় পরিকল্পনা তৈরী করেন, কলকাতা সহর এরোপ্লেন থেকে বোমায় ধ্বংস করবার জন্যে। নেতাজী বোসের বাধায় তাঁদের সে-সব পরিকল্পনা সামরিক দপ্তরের ফাইলেই থেকে যায়। মিলিত সামরিক-সভায় হিজ হাইনেস নেতাজী বোস্ অমর ভাষায় ঘোষণা করেন, রূপময়ী কলিকাতার অঙ্গ আমি কিছুতেই দেবো না বোমায় কুৎসিত করতে। আমি যাচ্ছি বাংলা দেশে সেখানকার লোকদের আশা দিতে, উৎসাহ দিতে, মৃত্যু আর ধ্বংস দিতে নয়। ইম্ফল জয় করার পর, আমরা কলকাতায় নিশ্চয়ই এরোপ্লেন পাঠাবো কিন্তু সে সব প্লেন থেকে বোমা বর্ষিত হবে না, বর্ষিত হবে অজস্র ধারায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত আমাদের জাতীয় পতাকা।

সেদিন কলকাতার নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে বসে আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারি নি, আমাদের দুশ্চিন্তায় আমাদেরই নেতা দূরদেশে বসে আমাদের শান্তির কথা স্নেহাতুর জনকের মতন ভাবছেন।

যেদিন বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা বেতার মারফৎ নেতাজীর

কাণে গিয়ে পৌঁছয়, রক্তাক্ত যুদ্ধের কঠোরতার মধ্যে সেই লৌহ-মানবের চোখ অশ্রুতে সজল হয়ে উঠেছিল, বাংলার বেদনায় তাঁর মাতৃ-সচেতন অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠেছিল এবং প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি পূর্ব্ব-এশিয়া থেকে চাল সংগ্রহ করেন, বাংলায় পাঠাবার জন্যে। কিন্তু বৃটিশের রণ-তরী দুর্ভিক্ষের সে অন্ন পৌঁছে দেবার ভার নিতে অস্বীকৃত হলো। অসহায় জননীর অন্তর-ব্যথায় সেদিন আর্ত্তনাদ করেছে নেতাজীর অন্তর।

দুর্ভিক্ষের বন্ধু, দুঃখদিনের বন্ধু, আমরা ভুলবো না তোমাকে... ভুলবো না, আমাদের দুঃখের দিনে, শত দূরে থেকেও তুমি আমাদের ভোল নি ; আজকের বাঙালী কি অন্তরে হাত রেখে করতে পারে এই প্রার্থনা ?

২২

সুভাষচন্দ্রের সামনে ছিল ধ্রুবতারার মতন শুধু একটি আদর্শ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর সেই স্বাধীন ভারতবর্ষের মর্য্যাদা। কটি ধ্যান, একটী জ্ঞান, একটি মাত্র ভালবাসা, ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যাতে ক্ষুণ্ণ হয়, তাই-ই অকার্য্য, অন্যায়। তা ছাড়া আর কোন রাজনীতি নেই। স্বাধীন ভারতবর্ষের মর্য্যাদা যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই-ই একমাত্র কার্য্য, কর্ত্তব্য, আচরণীয় ধর্ম্ম।

এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, শুধু একটা তত্ত্বকথা নয়, শুধু একটা ভাষাগত আদর্শ নয়, নীহারিকার মত ধূম্রদেহে যা জীবনের আকাশের দূরতম প্রান্তে ভেসে বেড়াবে...ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হলো রক্ত-মাংস প্রাণময় দেহের মতন প্রতিদিনের জীবনের বাস্তব ভিত্তি, প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রতিদিনের প্রতিটি চিন্তা ও কাজের উপর যার মর্য্যাদা নির্ভর করছে। প্রত্যেক ভারতবাসীকে তার চরিত্র দিয়ে স্বাধীন ভারতের এই মর্য্যাদাকে গড়ে তুলতে হবে, প্রত্যেক ভারতবাসীর বাস্তব চরিত্রের মর্য্যাদায় গড়ে উঠবে স্বাধীন ভারতের মর্য্যাদা, এই ছিল সুভাষচন্দ্রের জীবনের শেষতম অধ্যায়ের কর্ম্ম-নীতি, জীবন-ধর্ম্ম। তাঁর জীবনের শেষতম অধ্যায় হলো সেই ভারত-মর্য্যাদার জীবন্ত প্রতীক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, স্বাধীন ভারতের মর্য্যাদা, যা এতদিন শুধু ভাষা আর ভাবের সীমানায় আবদ্ধ হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল পুঁথি আর প্রস্তাবের আকাশে,

সুভাষচন্দ্র তাকে দিলেন রক্ত-মাংসের দেহ, দিলেন প্রাণ, নিজের চিন্তায় চরিত্রে কর্ম্মে তাকে করে তুল্লেন সজীবভাবে সত্য। তাঁর প্রতিদিনের চরিত্রের বাস্তবতায়, তাঁর প্রত্যেক চিন্তায়, জীবন্ত বাস্তব মূর্ত্তিতে জেগে উঠলো স্বাধীন ভারতবর্ষের মর্য্যাদার স্বরূপ। দলগত রাজনীতির পঙ্কিলতার উর্দ্ধে, প্রাদেশিক বুদ্ধির সঙ্কীর্ণ প্রাচীর পেরিয়ে, সাম্প্রদায়িকতার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে ভেঙ্গে, সুভাষচন্দ্র প্রত্যেক ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরলেন, সমগ্র ভারতের অখণ্ড কল্যাণ মূর্ত্তিকে।

তিনি জানতেন, তিনি আজ যে-আন্দোলনের নেতারূপে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে ভারতবর্ষে যাচ্ছেন, তার জন্যে সেখানে জাগতে পারে এক ভয়াবহ বিরোধ, ভারতবর্ষের নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ; অহিংস-মতাবলম্বী কংগ্রেস দল কর্ত্তৃক তিনি বিতাড়িত হয়েছেন, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তাঁকে করতে হয়েছে সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব, এবং আজ ভারতবর্ষের ভেতরে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেই গান্ধীজীরই অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক-নায়কত্ব এবং গান্ধীজীরই আদর্শবাদ। স্বভাবতই রাজনীতির ক্ষেত্রে সেখানে জাগতে পারে এক অতিকুৎসিৎ ও মারাত্মক নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এবং সে-দ্বন্দ্ব আঘাত করবে ভারতের হৃৎপিণ্ডকেই। ভারত-অভিযানের পূর্ব্বে সুভাষচন্দ্র তাই সর্ব্বপ্রথমে সজাগ হয়েছিলেন এই মহা-বিরোধের সম্ভাবনাকে মূলেই বিনষ্ট করে ফেলতে। তাই সেদিন সম্পূর্ণ সজাগভাবে তিনি নিজের নায়কত্বের সেই ক্রমবর্দ্ধমান সুবিপুল প্রভাবকে ভারত-কল্যাণের মূর্ত্তির পদতলে বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন, নিজেকে আড়ালে রেখে তুলে ধরেছিলেন ভারতবর্ষকে, প্রতি পদে, প্রতি প্রয়োজনে অন্তরের অকুণ্ঠ ভাষায় নিবেদন করেছিলেন তাঁর প্রীতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা গান্ধীজীর চরণে, জাতির জনকরূপে মহাত্মাজীকেই বরণ করে নিয়েছিলেন ভারতের চরম অধিনায়কের আসনে; তাঁর প্রত্যেক সৈনিককে, তাঁর প্রত্যেক অনুচরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন সেই আদর্শে। সেই সর্ব্বনাশা বিরোধের সম্ভাবনা থেকে জাগ্রত প্রহরীর মতন সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাঁর প্রত্যেক অনুচরকে। আজাদ্ হিন্দ্ অভিযানের প্রত্যেক অগ্র-গতির লগ্নে কংগ্রেস-বিতাড়িত সুভাষচন্দ্র যে-দিব্য ভাষায় ও ভাবে কংগ্রেস-

অধিনায়ক গান্ধীজীকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, বর্ত্তমান জগতের রাজনৈতিক সাহিত্যের হৃদয়হীনতার মধ্যে তা স্মরণ-সুস্নিগ্ধ সুপবিত্র মরু-উদ্যানের মতন বিরাজ করছে। এবং এই আত্মাভিমান-বিসর্জ্জনের দ্বারা সুভাষচন্দ্র যে আত্মগরিমা অর্জ্জন করেছেন, প্রত্যেক ভারতবাসী তার দ্বারা মহিমান্বিত হয়েছেন। স্বাধীন ভারতবর্ষ পেয়েছে তার মধ্যে তার হৃদয়-ধর্ম্মের সন্ধান।

সেই সমর-অভিযানের নিশ্ছিদ্র ব্যস্ততার মধ্যে, শত সমস্যার তিক্ততার মধ্যে সেই সুদূর দেশে থেকেও সুভাষচন্দ্র ভোলেন নি গান্ধীজির জন্মতিথি; সেই সমর-কোলাহলের ভেতর থেকে গান্ধীজির জন্মদিনে পরম শ্রদ্ধায় নিবেদন করেছেন তাঁর প্রণাম, তাঁর ভগ্ন-স্বাস্থ্যের উদ্বেগে হয়ে উঠেছেন ব্যথিত। কস্তুরবার মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে গান্ধীজীকে জানিয়েছেন অন্তরের সমবেদনা। আন্দামানে পদার্পণ করেই অশ্রুসিক্ত বেদনায় স্মরণ করেছেন কস্তুরবাকে। আরাকান অভিযানে পা বাড়াবার আগে বেতারে আগে প্রার্থনা করেছেন জাতির জনকরূপে মহাত্মাজীর আশীর্ব্বাদ। বারবার বেদনায় স্মরণ করেছেন, ইংরেজের লৌহ-কারায় আবদ্ধ সহযাত্রী কংগ্রেস-নেতাদের কথা, একদিন যাঁরা নির্ম্মম রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁকেই করেছিলেন রূঢ় আঘাত। এই প্রসঙ্গে পরম বেদনায় আজ উল্লেখ করতে হচ্ছে, সংগ্রাম-অন্তে যখন এলো জয়-ভাগ্য, যখন সেই কংগ্রেসী সহযাত্রীরা হলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসক, তখন তাঁদেরই আমলে সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে যে কুন্ঠিত শ্রদ্ধার কার্পণ্য ফুটে ওঠে, তাতে ইতিহাস সাক্ষী রয়ে গেল, মানব-ধর্ম্মের বিচারে কে করেছে ত্রুটি।

আজ যাঁরা কুন্ঠিত কার্পণ্যে পারলেন না দিতে ভারত-ইতিহাসের এই অমর মহা-নায়ককে তাঁর প্রাপ্য অর্ঘ্য, তার দ্বারা তাঁরা নিজেদের যতখানি করেছেন ক্ষুদ্র. ঠিক ততখানি মহৎ হয়ে রইলেন সুভাষচন্দ্র।

জীবনের যাত্রাপথে এমন আসে লগ্ন, যখন শ্রদ্ধা পাওয়ার চেয়ে শ্রদ্ধা দেওয়াটাই হয় মহত্তর কাজ। সুভাষচন্দ্র তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা দানের দ্বারা সেই মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন। আজাদ হিন্দ্ অভিযানে কংগ্রেস-নেতা এবং কংগ্রেস-অধিনায়ক মহাত্মাজীর

প্রতি সুভাষচন্দ্রের অকুণ্ঠ ও সজাগ শ্রদ্ধা-নিবেদন, এই লেখকের কাছে অন্তত, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় সুপবিত্র ঘটনা হয়ে রইলো। আজকের জীবনে বড় প্রয়োজন এই মহত্বের। তার মূল্য হয়ত আজকের নগদ লেন-দেনের বাজারে চোখে পড়ে না। কিন্তু জাতির ইতিহাসের স্থায়ী ভাণ্ডারে তা অমূল্য ঐশ্বর্য্যরূপেই সঞ্চিত থাকে। সুভাষচন্দ্রের এই মহত্ব তাঁর জাতির ইতিহাসের ভাণ্ডারেই সঞ্চিত হয়ে রইলো। রাজনৈতিক দলাদলির কুৎসিত আবহাওয়ার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের এই-শ্রদ্ধা-সুমহান চরিত্র আমাদের সামনে বীরত্বের এক অভিনব সুন্দর আদর্শকে জীবন্ত করে তুলে ধরেছে। আজকের হৃদয়-হীন রাজনীতির মরু-রুক্ষতাকে তিনি হৃদয়-ধর্ম্মের প্রাণ-ধারার স্পর্শে শ্যামল করে গিয়েছেন।

১২৩

আজাদ হিন্দ্ অভিযানের সমস্ত সামরিকতার পেছনে ছিল ভারত-বর্ষের কল্যাণের প্রতি সুভাষচন্দ্রের সেই জাগ্রত দৃষ্টি। এই স্বল্প-কালস্থায়ী সামরিক অভিযানের প্রত্যেকটি অঙ্গের ভিতর দিয়ে সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন এক অখণ্ড ভারত-বোধকে জাগিয়ে তুলতে; স্বাধীন ভারতবর্ষের গৌরব, মর্য্যাদা আর দায়িত্বকে সংরক্ষণ করবার উপযুক্ত মনোভাবকে গড়ে তুলতে। তাই এই সামরিক অভিযানের প্রত্যেকটি অঙ্গের মধ্যে আমরা দেখতে পাই একটা সুপরিকল্পিত বিরাট আদর্শের সজাগ অনুসরণ। একটা বিরাট মন এই স্বল্পকাল-স্থায়ী সামরিক আয়োজনের প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনে আলোক-উৎসের মতন দীপ্যমান হয়ে রয়েছে, তার আলোকে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে একটিমাত্র পথ, ভারতের কল্যাণের আর গৌরবের রাজপথ। সে-মন, সে-আলোক-উৎস হলো সুভাষচন্দ্র স্বয়ং। তাই আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের ইতিহাসের মূল্য নির্ভর করে না তার ঘটনার ওপর, তার সমস্ত মূল্য নির্ভর করে আছে সেই একটি মনের অপরূপ প্রকাশের ওপর। আজাদ হিন্দ্ অভিযানের ঘটনা থেমে গিয়েছে, কিন্তু সেই সব ঘটনার পেছনে ছিল যে মন, তার প্রভাব, তার দ্যুতি আজও সমানে আলোক বিকীরণ করে চলেছে।

হিটলার যে জার্ম্মাণীকে জাগিয়ে তোলেন, সে-দেশের প্রত্যেক

জার্ম্মাণের মুখে, দিয়েছিলেন জাগরণ-বাণী স্বরূপ Hail Hitler... নেতাজী যে ক্ষুদ্র আজাদী বাহিনীকে গড়ে তোলেন, তার প্রত্যেক সৈনিকের মুখে দিলেন জাগরণ-বাণী স্বরূপ, Hail Netaji নয়, Hail India...জয় হিন্দ। রাশিয়ার বোমার আঘাতে বাড়ী-চাপা পড়ে গেল সেই Hail Hitlar বাণী...সেই ভগ্নস্তূপের সঙ্গে মিশে ধুলো হয়ে গেল, সেখান থেকে আর উঠতে পারলো না পক্ষ মেলে, কেন না সে বাণী হতে পারেনি মন্ত্র, তপস্বীর বাণীই হয় মন্ত্র, যে মন্ত্র উদ্গাতার জীবনকে ছাড়িয়ে পায় অমরত্ব, পায় অমর পরমায়ু। নেতাজী তাঁর আত্মজয়ী তপস্যার ভেতর থেকেই সৃষ্টি করেছিলেন, জয় হিন্দ্-বাণীকে, ভারতের জাগরণ-মন্ত্রকে। তাই সে-মন্ত্র তাঁকে ছাড়িয়ে, তাঁর আজাদ হিন্দ্ বাহিনীকে ছাড়িয়ে, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের জয়-পরাজয়কে ছাড়িয়ে অমর সত্তা পেলো ভারতের ইতিহাসে, ভারতবাসীর জীবনে। নানা বিভেদে বিচ্ছিন্ন এই ভারত মহাদেশের মন এতদিন বৃথায় অন্বেষণ করে ফিরছিল যে মিলনের কেন্দ্র-বিন্দু, নেতাজী দিলেন তার জন্ম। কল্পনার স্বপ্নকে করলেন জীবনের বাস্তব সত্য। তাঁর সৃজিত এই মন্ত্র নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে তার সৃষ্টিকর্ত্তার নির্দ্দেশে, গড়ে তুলছে ভারতের আভ্যন্তরিক মিলন। নেতাজী আজ অদৃশ্য, কিন্তু তাঁর প্রেরিত রাজদূত নিঃশব্দে পালন করে চলেছে তাঁর অসমাপ্ত কর্ত্তব্যকে।

নেতাজী যখন আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে যুদ্ধের জন্যে পুনর্গঠিত করলেন, তিনি সাধারণ সেনাপতির মতন তাদের শুধু বেয়নেট-ধারী হত্যাকারীর দল রূপে গড়ে তোলেন নি, জাতীয়তার মহাকবির মতন তাদের সৈনিক-বৃত্তির অন্তরে জাগিয়ে তুললেন এক অপরূপ দেশ-প্রেমের বহ্নি, তাদের রক্ত-অভিযানের চারিদিকে রচনা করলেন ভাষা দিয়ে, ভাব দিয়ে, সঙ্গীত দিয়ে, সুর দিয়ে, চরিত্র আর চেতনা দিয়ে এক অপরূপ হৃদয়-ধর্ম্মের পরিবেশ...তারা শুধু সৈনিক নয়, সৈনিকের উর্দ্ধে তারা মানুষ, তারা ভারতবাসী, তারা একটা মহৎ আদর্শের, একটা মহৎ কর্ত্তব্যের ধারক ও বাহক। স্বাধীন ভারতে যাদের হতে হবে সৈনিক, তাদের হতে হবে নতুন ধরণের সৈনিক, এই বৃহৎ কথার নির্দ্দেশ রয়ে গিয়েছে নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গঠনে। তাই আজ যখন পড়ি আজাদ হিন্দ্

ফৌজের গঠনের ইতিহাস তখন মহানন্দে দেখি. সেই সৈনিকের শিবিরের চারদিকে সামরিক কুচকাওয়াজ আর অস্ত্রের ঝংকারের সঙ্গে, সমানে উঠছে সঙ্গীতের সুর, প্রত্যেক বাহিনী গড়ে তুলছে তার স্বতন্ত্র সঙ্গীত, প্রত্যেক সঙ্গীতে বেজে উঠছে ভারতবর্ষের অন্তর, জাগ্রত ভারতবর্ষের অন্তরের স্পন্দন। আজাদ হিন্দ্ বাহিনী যখন এলো আমাদের কাছে, ইংরেজ তাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল তাদের অস্ত্র, কিন্তু তাদের মুখে মুখে তারা নিয়ে এলো এক নতুন সঙ্গীতের প্রবাহ, এক নতুন প্রাণ, তারা এলো সঙ্গে নিয়ে এক ডালা-ভর্ত্তি সঙ্গীত, যে সঙ্গীত দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়লো কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত। যে সঙ্গীত নিস্তেজ কংগ্রেসের দেহে, হতাশ দেশবাসীর মনে যাদুমন্ত্রের মতন জাগিয়ে তুল্লো নতুন প্রেরণা, নতুন শক্তি। বাঙ্গালীর যে-প্রতিভা উনিশ শ' পাঁচে জাতির রাজনৈতিক জাগরণকে সাহিত্যে সঙ্গীতে দিয়েছিল অমর জীবন, আজাদ হিন্দ্ অভিযানের রাজনৈতিকতার মধ্যে আবার দেখলাম সেই বাঙ্গালী প্রতিভার-ই অপরূপ সৃজনশীলতা। সেদিন বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে জেগেছিল যে-আন্দোলনের প্রাণ, আজ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে নেতাজী সর্ব্ব-ভারতীয় ভাষায় তাকে করে তুল্লেন মুখর। আরাকানের রণ-ক্ষেত্র ছাড়িয়ে 'কদম্ কদম্ বাড়হায়ে যা' ধ্বনিত হয়ে উঠলো প্রত্যেক তরুণ ভারতবাসীর কণ্ঠে।

আজাদ হিন্দ্ অভিযানের সেই স্বল্পায়ুর মধ্যে সঙ্গীতে, অভিনয়ে, বেতারে, প্রাচীর-পত্রে, নাটকে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় নেতাজী যে নিরবিচ্ছিন্ন প্রচার ও সাহিত্যিক-প্রচেষ্টা করেছিলেন, সৈনিকদের কাছে তাঁর প্রতিদিনের নির্দ্দেশের মধ্যে তিনি নিজে যে অপরূপ সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা থেকে পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর চরিত্রের আর একটি অবজ্ঞাত দিকের। তাঁর মধ্যে সুপ্ত হয়ে ছিল এক বিরাট সাহিত্যিক, বাঙ্গালীর সাহিত্য-প্রীতির সহজাত অধিকার নিয়েই তিনি জীবনের পথ চলতে সুরু করেন কিন্তু নির্ম্মম স্বামিনীর মতন রাজনীতি সে-প্রীতিকে সার্থক করবার অবকাশ দেয় নি; তাই সে-অবরুদ্ধ শক্তি ছদ্মবেশে তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক অভিব্যক্তিকে সাহিত্যের রঙে রাঙিয়ে তোলে, তাঁর চরিত্রের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে থাকে এক অপরূপ সৃজন-প্রতিভা।

তাই আজাদ হিন্দ ফৌজের পুনর্গঠনের মধ্যে, আজাদ হিন্দের সামরিক অভিযানের মধ্যে আমরা দেখতে পাই রাজনৈতিক রুক্ষতার পরিবর্তে একটা সাহিত্যিক রূপ-শ্রী। আজাদ হিন্দ অভিযানে নেতাজীর বহু বক্তৃতা, বক্তৃতার বহু অংশ, সৈনিকদের কাছে তাঁর বহু সামরিক নির্দ্দেশ জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-অভিব্যক্তির সুষমায় বিমণ্ডিত হয়ে আছে। সিঙ্গাপুর থেকে আরাকান পর্য্যন্ত সামরিক পথের দুধারে পথের ধূলায় সংগোপনে পড়ে আছে অনাদৃত মণি-মরকতের মতন তাঁর বহু উক্তি, যার সাহিত্যিক সৌন্দর্য জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অমর রচনারই অনুরূপ। ফরাসী-বিপ্লবের দিনে যেমন রবেস্‌পীয়ার, দাঁতো আর মারার মুখ থেকে বেরিয়েছে এমন এক-একটা কথা, যা আজ অমর হয়ে আছে ফরাসী ভাষায়, অমর হয়ে আছে স্বাধীনতার সাহিত্যে, তেমনি আজাদ হিন্দ অভিযানে নেতাজীর মুখ থেকে নিমেষের প্রেরণায় নির্গত হয়েছে এক্‌-একটী অমর উক্তি, জীবন দিয়ে করতে হয় যার ব্যাখ্যা। "তুম্‌ হাম্‌কো খুন্‌ দো, ম্যাঁয় তুম্‌কো আজাদী দুঙ্গা," "করো সব্‌ নিচাওয়ার, বনো সব্‌ ফকীর" ইত্যাদি উক্তি হয়ে আছে ভারতের স্বাধীনতার রাজপথের চিরজাগ্রত প্রহরীর মত। একটা সমগ্র জীবনের তপস্যার শক্তি এই সব উক্তিকে দেয় অমর প্রাণ, যার ফলে এই সব উক্তি হয়ে থাকে ইতিহাসের সহযাত্রী।

মানুষের মুখের কথাকে, অভিধানের প্রাণহীন অক্ষরকে যাঁরা দেন অমর গতিশক্তি. তাঁরাই হলেন মহাকবি। সেই মহাকবির মতনই সুভাষচন্দ্র তাঁর দৈনন্দিন সাময়িক নির্দ্দেশের ভাষার মধ্যে দিয়েছেন প্রাণের অমরত্ব। আরাকানের যুদ্ধ কবে হয়ে গিয়েছে শেষ, কিন্তু সেই যুদ্ধের সময়ে নেতাজী তাঁর সৈনিকদের আহ্বান করে দিয়েছিলেন যেসব 'অর্ডার অফ্‌ দি ডে', সেগুলি শুধু সেনাপতির সাময়িক সমর-আদেশ নয়, তার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের ইতিহাস-পুরুষেরই কণ্ঠ। সেদিন সেই মুহূর্ত্তে তিনি শুধু আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের সিপাহ শালার ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারত-আত্মার প্রতিনিধি। তাই তাঁর সেই নির্দ্দেশের ভাষায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছে, ভারতের হৃদ্‌-স্পন্দনই, তাঁর আহ্বানে অনুরণিত হয়ে উঠেছে ভারত-জননীরই আহ্বান,—

"ঐ দূরে, বহুদূরে, ঐ নদীর ওপারে, ঐ বনভূমি আর পর্ব্বত পেরিয়ে রয়েছে আমাদের দেশ, চির-ঈপ্সিত জন্মভূমি, যার কোলে বসে প্রথম এই পৃথিবীকে দেখেছি, আর আজ আবার ফিরে চলেছি যার কোলে।

"ঐ শোন, ভারত ডাকছে, ডাকছে ভারতের রাজধানী, চির-নগরী দিল্লী, ডাকছে আটত্রিশ কোটি আশী লক্ষ ভারতবাসী, ভাই ভাইকে ডাকছে, রক্তে এসে পৌঁছেছে রক্তের ডাক।"

এ ডাক কোন সেনাপতির নয়, এ ডাক কোন রাজনৈতিকের নয়, এ ডাক কোন সাময়িক ঘটনার নয়, এ ডাক হলো জাতির অন্তরের ডাক, ইতিহাসের ডাক, মহাকালের আহ্বান। নিত্যকালের সুরে বাঁধা এর সুর। জাতির জীবনের তামসী রাত্রির ঘন-অন্ধকারে বারে বারে ফিরে আসে যে ডাক। ভারত-পথের যারা চির-পথিক, তাদেরই কণ্ঠকে আশ্রয় করে বারে বারে আসে এই চিরপরিচিত আহ্বান।

"এই তো সম্মুখে রয়েছে পথ, যে পথ তৈরী করে গিয়েছেন আমাদের অগ্রজেরা। সেই পথ ধরেই আমরা করবো যাত্রা। করবো যাত্রা শত্রুর ব্যূহের ভিতর দিয়েই। এই পথ দিয়েই পৌঁছব অন্তরের ঈপ্সিতধামে, নয়তো, ভগবান যদি করেন, এই পথের প্রান্তেই অর্জ্জন করবো ঈপ্সিত অমর মরণ।"

এ পথ পাথর আর খোয়া দিয়ে তৈরী নয়, এ পথ তৈরী হয়েছে স্বপ্ন আর সাধনা দিয়ে, শত সহস্র দেশ-প্রেমিকের সর্ব্বস্ব উজাড়-করা প্রেম দিয়ে। এপথের শেষ প্রান্তে বিরাজ করছে ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী বিশ্বধাত্রী ভুবন-মোহিনী ভারত-জননীর মন্দির।

যতক্ষণ না যাত্রী সে-মন্দিরে গিয়ে পৌঁছচ্ছে, ততক্ষণ তার কানে ধ্বনিত হতে থাকবে এই পথের আহ্বান।

এখনো বহু দূরে সে-মন্দির।

তাই এখনো থেমে যায় নি নেতাজীর নির্দ্দেশের সুরের রেশ।

১২৪

নেতাজীর ভাষায় সেদিন যেমন ফুটে উঠেছিল, সাময়িকতার ঊর্দ্ধে একটা নিত্যকালের সুর তেমনি তাঁর অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কাজের ভেতর দিয়ে, আজাদ হিন্দ্ অভিযানের প্রত্যেক অঙ্গের ভেতর

দিয়ে ফুটে উঠেছিল, আগামী কালের ভারতবর্ষের রূপ। আজকের দৈন্য, অসহায়তা, দারিদ্র্য আর শত বিভেদের ভেতর থেকে গড়ে উঠবে আগামী কালের যে অত্যুজ্জ্বল ভারতবর্ষ, তার জন্যে চাই নতুন বীরত্ব, নতুন নিষ্ঠা, নতুন চরিত্র, নতুন নর ও নারী। সেই আগামী কালের দিকে লক্ষ্য রেখেই নেতাজী তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিভিন্ন অঙ্গকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন, ফৌজের প্রত্যেক বিভাগের চরিত্রকে তিনি চেয়েছিলেন আগামীকালের দাবী অনুযায়ী এক নূতনতর আদর্শের প্রাণের রঙে রাঙিয়ে তুলতে। সেই স্বল্পকালের মধ্যে, সেই স্বল্প আয়োজনের মধ্যে, প্রত্যেক সামান্যতম ঘটনার ভেতর দিয়ে নেতাজী একটা প্রাণবন্ত আদর্শের সুরকে জাগিয়ে তোলেন যার ফলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জীবন শেষ হয়ে গেলেও আজও পর্য্যন্ত আমাদের প্রাণে সেই আদর্শের সুর সমানে অনুরণন জাগিয়ে তুলছে। মহাকবি যেমন সামান্য দুটি লাইনের ভেতর পারেন নিত্যকালের সুরকে জাগিয়ে তুলতে, নেতাজী তেমনি আজাদ হিন্দ ফৌজের সাময়িক আয়োজনের ভেতরে ফুটিয়ে তুলেছিলেন একটা অবিনাশী আদর্শের রূপ। আজাদ হিন্দ্ অভিযান শুধু একটা ঘটনা নয়, আজাদ হিন্দ্ অভিযান হলো একটা আদর্শ, একটা আইডিয়া। আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের প্রত্যেক ঘটনার পেছনে তাই দেখতে পাওয়া যায়, সেই দুঃসাহসিক স্বপ্নচারীর মনের স্পর্শ। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রত্যেক ঘটনা যেন নেতাজীর মনের বিদ্যুতে অভিষিক্ত হয়ে আছে, তাই, তাকে ছুঁতে গেলেই সেই অদৃশ্য বিদ্যুতের স্পর্শে দেহমন সচকিত হয়ে ওঠে। এইখানেই আজাদ হিন্দ অভিযানের বৈশিষ্ট্য।

যেদিন জাপানী সাংবাদিকদের সামনে নেতাজী সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের পুনর্গঠনের সময় তিনি সর্ব্বপ্রথম গড়ে তুলবেন ভারত-নারীর এক সামরিক বাহিনী, জাপানী সাংবাদিকেরা সেই প্রস্তাবকে স্বপ্নচারী বিপ্লবীর খেয়াল বলেই মনে করেছিল। কিন্তু নেতাজীর মনে ছিল আগামী কালের ভারতবর্ষের কথা। যে-ভারতবর্ষকে তাঁরা গড়ে তুলতে চলেছেন, তার দায়িত্ব বহন করবার উপযুক্ত নারীরও প্রয়োজন। স্বাধীন

ভারতের ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে, সামনে যে সুবিপুল সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যেতে হবে, তাতে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-নারীকেও গ্রহণ করতে হবে সংগ্রামের অংশ, রক্তাক্ত বেদনার অংশ। সেই সম্ভাবনাকে সত্য জেনেই নেতাজী আজাদ হিন্দ্ অভিযানে ভারত-নারীকে আহ্বান করলেন, আহ্বান করলেন সম্পূর্ণ অভিনব দায়িত্বে এবং সেই নারী-বাহিনীকে দিলেন, সকলের চেয়ে বেশী প্রচার-প্রাধান্য। একই সমরক্ষেত্রে, একই সামরিক কঠোরতা আর নিয়মানুবর্ত্তিতায় গড়ে তুল্লেন ঝাঁসি-বাহিনীকে। রূপ দিলেন, আগামী কালের ভারতবর্ষের অতি-প্রয়োজনীয় এক অঙ্গকে। ভবিষ্যৎ ভারত-স্রষ্টাদের জন্যে অনুষ্ঠান করে গেলেন এক অতি দুরূহ মানবীয় পরীক্ষা। এতদিন ভারত-নারী সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, একান্ত বাস্তবভাবে সেই ভ্রান্তিকে দূর করলেন, আধুনিক ভারত-নারীকে সামরিক কঠোরতার মধ্যে দিলেন অভিনব এক চরিত্র। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনে ভারত-নারীকে এনেছিলেন পুলিসের লাঠির সামনে, নেতাজী সেখান থেকে ভারত-নারীকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন কামানের মুখে; মহাত্মা গান্ধী ভারত-নারীকে নিয়ে এসেছিলেন অন্তঃপুর থেকে পুরুষের সহকর্ম্মীরূপে কারাগারে; নেতাজী ভারত-নারীকে সঙ্গে নিয়ে চল্লেন যুদ্ধক্ষেত্রে, মৃত্যুর মুখোমুখী। ভারতের পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে ভারত-নারী সার্থক করলো তার ঐতিহাসিক সম্ভাবনাকে। মহাত্মা গান্ধী আর নেতাজী, বর্ত্তমান ভারতবর্ষের দুই মহানায়করূপে আধুনিক ভারত-নারীকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তার পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক সার্থকতায়। জাতির জীবনের বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার দাবীর ক্ষেত্রে বিকশিত করে তুল্লেন ভারত-নারীর চরিত্রের যে-অংশ ছিল সংগোপনে সুপ্ত। ভারত-নারী ডাইভোর্সের অধিকার পাবে না কেন, তা নিয়ে আলোচনা করবার সময় তাঁদের ছিল না। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, ভারত-নারীর চরিত্রকে তার ইতিহাসের স্বক্ষেত্রে আত্মমহিমায় বিকশিত করে তুলতে। দুর্ভিক্ষে, অনশনে, উপবাসে, সংগ্রামে, জাতির জীবনে-মরণে, আজ ভারত-নারীর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হলো ভারতের পুরুষের পাশে থেকে সমানে বহন করা— ঐতিহাসিক দায়িত্বের ভার। ভারতের নারী-প্রগতির যাঁরা বাহক,

তাঁদের স্মরণে রাখা উচিত, আমরা এখনো রয়েছি যুদ্ধের মধ্যে, ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে; তার ভেতরে থেকে আজ ডাইভোর্সের কথা ভাবা মানে, যুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাম্পত্য কলহ করা। স্থান ও কালের দিক দিয়ে ব্যাপারটা কদর্য্য রসিকতা বলে মনে হয়।

১২৫

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। একদিন নিশ্চয়ই হ'বে।

বিজয়ী শাসক-দলরূপে আজ কংগ্রেস তার হুকুমমত ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস যেভাবেই লেখাক না কেন, মহাকালের নিরপেক্ষ প্রতিনিধি যেদিন আসবেন, তিনি দেখবেন সে-ইতিহাসের শেষ-অধ্যায়ে মূল-কেন্দ্ররূপে রয়েছেন দুজন অতিকায় ভারতবাসী, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র…দেখবেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন দাঁড়িয়ে আছে, একটি নয়, দুটি অবলম্বন-স্তম্ভের ওপর, একটি হলো মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস-আন্দোলন, দ্বিতীয়টি হলো নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ অভিযান। সেদিন সেই ঐতিহাসিক আজকের দিনের উত্তেজনা হতে দূরে থেকে এই দুই আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূল্যের যথাযথ বিচার করতে পারবেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রধান বিশেষত্বই হলো, একান্ত কাছে থাকার দরুণ, অঙ্গাঙ্গী লিপ্ত থাকার দরুণ, তার সবখানি রূপ সমসাময়িক মানুষের চোখে ধরা পড়ে না, খানিকটা দূরে সরে না গেলে তার সমগ্র চেহারাটা ভাল করে দেখা যায় না।

তাই অধিকাংশ সমসাময়িক ইতিহাস হলো বিজয়ীর নির্দ্দেশে লেখা ইতিহাস, মুঘল সম্রাটরা যেমন মাইনে-করা ঐতিহাসিক রেখে তাদের নিজস্ব ইতিহাস লেখাতেন এবং সেই ইতিহাসই চলতো সেই যুগের ইতিহাস বলে। কিন্তু আজ আমরা জানি, সে অসম্পূর্ণ ইতিহাস, আধ-খানা ইতিহাস। বিজয়ীর ইতিহাস।

আজ কংগ্রেস বিজয়ী। ইংরেজ প্রত্যক্ষভাবে তার হাতে দিয়ে গিয়েছে ভারতের শাসনের ভার।

নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ অভিযান পরাজিত। নেতাজী নিরুদ্দিষ্ট। আজাদ হিন্দ্ অভিযানের বীরপুরুষেরা কংগ্রেসের প্রয়োজনমত গণ-উন্মাদনার খোরাক জুগিয়ে গলার শুকনো মালা নিয়ে জনতার

ির অন্তরালে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছেন, কৃপাভিক্ষার আশায়। পরাজিতের স্থান নেই সমসাময়িক ইতিহাসে।

কিন্তু জয়-পরাজয়ের বাইরে নেতাজীর আজাদ হিন্দ অভিযানের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসের একটা রক্তের সম্পর্ক আছে।

আঠারো শ' সাতান্ন থেকে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-আন্দোলনের যে ধারা, কখনো তরঙ্গোচ্ছ্বাসে কখনও বা ধীর মন্দগতিতে ভারতবর্ষের মাটির বুক চিরে অবিচ্ছেদভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনে ও সাধনায় সেই ঐতিহাসিক ধারাকেই আঁকড়ে ধরেন। মহাত্মা গান্ধী সেই ঐতিহাসিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের জীবনের ও সাধনার স্বাতন্ত্র্যে এক সম্পূর্ণ নূতন ভাবধারা নিয়ে আসেন।

কংগ্রেস-আন্দোলনের অহিংসবাদ ও ভাবাদর্শের শিকড় ভারতবর্ষের সমসাময়িক ইতিহাসের মাটিতে নেই, তার প্রত্যেকটি শিকড় রস পেয়েছে মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত জীবন ও আদর্শ থেকে। তাই কংগ্রেস আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯০৫ নেই, নেই ১৮৫৭। তাতে ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, সে কথা এখানে বক্তব্য নয়। আমি শুধু এখানে বলছি, যা ঘটেছে তারই কথা।

তাই সুভাষচন্দ্র যেদিন কংগ্রেস থেকে সরে গেলেন, তিনি সরে গেলেন মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক আদর্শের ক্ষেত্র থেকে। সরে গেলেন কোথায়? সরে গেলেন তাঁর দেশের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়, যেখান থেকে সরে এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। সরে গেলেন ১৯০৫-এ, সরে গেলেন ১৮৫৭-এ, সরে গেলেন বিগত সেই একশো বছরে অবিচ্ছেদ ধারাস্রোতে।

১২৬

১৯৪৩, ৯ই জুলাই সিঙ্গাপুরের ঐতিহাসিক জনসভায়, যেদিন তিনি আজাদ হিন্দ অভিযানে ডাক দিলেন প্রবাসী ভারতীয়দের, সেদিন তাই তিনি সর্ব্বপ্রথম আঘাত করলেন একশো বছরের বিদেশী-শাসন-পুষ্ট এক মহা অন্যায়কে......ইংরেজের দেওয়া সিপাহী বিদ্রোহের নাম ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়ে ঘোষণা করলেন ভারত-ইতিহাসের প্রতিনিধির মতন তার আসল পরিচয়,

ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ইতিহাসে এই একটি ঘটনার যে কতখানি তাৎপর্য্য, তা আজও আমরা উপলব্ধি করিনি। এই একটি সামান্য ব্যাপারের ভেতর দিয়ে সুভাষচন্দ্র প্রবেশ করলেন তাঁর জাতির ইতিহাসের অন্তরঙ্গলোকে, সার্থক করে তুললেন বিগত একশো বছরের অক্লান্ত বিপ্লব-সাধনাকে, স্বাধীনতা-প্রচেষ্টাকে। এক নিমেষে সংযুক্ত করলেন ১৯৪৫-এর সঙ্গে ১৮৫৭-কে। যে-বহ্নি একশো বছর ধরে ভস্মাচ্ছাদিত পড়ে ছিল, একটি ফুৎকারে তাকে করে তুল্লেন আবার শিখাময়। সেদিন পলাশীর পরাজয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে যোদ্ধারা মুক্ত ভারতের পতাকা হাতে মৃত্যুপণ করে অগ্রসর হয়েছিল দিল্লীর দিকে নেতাজী তাঁর বিপ্লবী যোদ্ধাদের মুখে দিলেন তাদেরই রণ-হুংকার, দিল্লী চলো। আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় সামরিক কঠোরতায় শিক্ষিত ক'রে গড়ে তুল্লেন ভারত নারীর বাহিনী···তার নাম দিলেন ঝাঁসির রাণী বাহিনী···যে তেজ, যে বীর্য্য, যে অপরাজেয় শক্তির মহিমা নিয়ে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের নায়িকারূপে রাণী লক্ষ্মীবাঈ উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেদিনকার মৃত্যুযাত্রী মুক্তি-যোদ্ধাদের, আজকের ভারত-নারীর বুকে সুভাষচন্দ্র জাগিয়ে তুল্লেন সেই তেজ, সেই মহিমা, সেই শক্তিকে। বর্ম্মার অজানা এক কোণে কোথায় পড়েছিল বিস্মৃত-স্মৃতি স্বাধীন ভারতের শেষ শাসক, হতভাগ্য বাহাদুর শাহ্-র সমাধি চিহ্ন, ভারত-ইতিহাসের মর্ম্মান্তিক ভুলকে সংশোধন করে যে মুসলমান বাদশাহ হিন্দু, শিখ, মুসলমান সকলকেই আহ্বান করেছিলেন এক সম্মিলিত ভারতবর্ষের পতাকার তলে, সুভাষচন্দ্র সেই বিপুল সামরিক দায়িত্বের বিশ্রামহীন ব্যস্ততার মধ্যেও বর্ম্মায় পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাহাদুর শাহ্‌র সমাধি-চিহ্নের সামনে গিয়ে অশ্রুতে আর পুষ্পে অন্তরের অর্ঘ-প্রদান করলেন। সেই অশ্রুজলে ধুয়ে মুছে গিয়েছিল বাহাদুর শাহ্-র জীবনের নিষ্ঠুরতম শত লাঞ্ছনার স্মৃতি। সুভাষচন্দ্রের জীবনে সার্থক হয়ে উঠলো বিগত একশো বছরের শতসহস্র মুক্তিকামী যোদ্ধাদের অসমাপ্ত জীবন-ব্রত, সার্থক হয়ে উঠলো রণক্ষেত্রশায়ী শতসহস্র বীরের অপূর্ণ অন্তর-সাধ। তাই আজাদ হিন্দ অভিযান বর্ম্মার যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও, নেতাজী সেই অভিযানের ভেতর দিয়ে একশো বছরের যে বিপ্লব-শক্তিকে

জাগিয়ে তুলেছিলেন, সেই প্রাণ-বহ্নি সেদিন মূর্চ্ছিত-প্রায় কংগ্রেসকে পর্য্যন্ত সঞ্জীবিত করে তুলেছিল, ভারতের শতধাবিচ্ছিন্ন জনতার অন্তরে প্রদীপ্ত করে তুলেছিল এক-জাতীয়তার শিখাকে, এবং সর্ব্বোপরি, যে মাইনে-করা ভারতীয় সৈন্যদের দিয়ে বিদেশী শাসকেরা ভারতবর্ষের পরাধীনতাকে জীইয়ে রেখেছিল, নেতাজীর আদর্শের বহ্নি-শিখা সযত্নে-তৈরী-করা তাদের স্বদেশ-অচেতনার বুকে দীপ্ত তেজে জ্বালিয়ে তুলেছিল ভুলে-যাওয়া সিপাহী বিদ্রোহের বিপ্লব-অনুপ্রেরণাকে, যার ফলে ইংরেজকে এত দ্রুত কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হতে হয়েছিল।

একটি জীবন জাগিয়ে দিল একশো বছরের ঘুমন্ত আকুতিকে। নেতাজী হলেন সেই একশো বছরের সংগ্রামের, সাধনার, স্বাধীনতা স্পৃহার প্রতীক। সেইভাবেই তিনি বিরাজ করছেন প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতীক। দেহ মৃত্যুশীল। প্রতীক অমর।

১২৭

আজাদ হিন্দ বাহিনীর পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী সৃষ্টি করেন আজাদ হিন্দ্ সরকার, স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র। নেতাজীর রাজনৈতিক প্রতিভা ও দুঃসাহসিকতার চরম নিদর্শন।

রাষ্ট্র-বিহীন সেনাবাহিনী মানেই হলো, ভিক্ষুক-বৃত্তি...অপর রাষ্ট্রের সাহায্য ও নির্দ্দেশের ওপর নির্ভর করে থাকা...অপরের ইঙ্গিতে চলা...পরাধীনতার রূপান্তর। টাকা যার, মত তার। কিন্তু লোহার বদলে সোনার শৃঙ্খল পরবার জন্য সুভাষচন্দ্র সমুদ্র, পর্ব্বত, মেরু-প্রান্তর পেরিয়ে তরঙ্গ আর তুষারঝঞ্ঝা আর মৃত্যুকে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ান নি।

তাই আশ্রয়-দাতা মিত্র-শক্তিকে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, আজাদ হিন্দ্ বাহিনী আদেশ নেবে একমাত্র আজাদ-হিন্দ্ সরকারের কাছ থেকে। এবং এই অস্থায়ী রাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যান্য অস্থায়ী রাষ্ট্রের মতন কারুর দুগ্ধপোষ্য অনাথ শিশু নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালনা করবে ভারতীয় আজাদ হিন্দ্ সৈনিকেরাই, জাপানী সৈনিকেরা নয়।

কিন্তু...স্বাধীন রাষ্ট্রের চাই স্বাধীন রাজকোষ। অর্থ না হলে

রাষ্ট্র চলে না। অর্থ না হলে যুদ্ধ চলে না। আধুনিক যুদ্ধ হলো অজস্র অর্থের অকুণ্ঠ অপব্যয়। আগে মানুষ মারতে যা খরচ হতো, এখন তার সহস্রগুণ খরচ লাগে। মানুষ মারা হলো বর্ত্তমান সভ্যতার সব চেয়ে দামী বিলাসিতা।

আজাদ হিন্দ্‌ সরকারের কোথায় সে-অর্থ? একজন কপর্দ্দক-হীন বিপ্লবী হলো সেই রাষ্ট্রের অধিনায়ক। এবং সে-রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে যুদ্ধ, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে, ইংরেজ আর আমেরিকার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে।

শক্তির মধ্যাহ্ন-গগনে জাপান তখন আশা করেছিল, নেতাজীকে আশ্রয় দিয়ে, নেতাজীকে সাহায্য দিয়ে, রাজনৈতিক ব্যবসায়ে ইংরেজকে ঘায়েল করবার একটা মস্ত বড় সুযোগ তার হাতে আসবে। নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনীকে শিখণ্ডীর মতন সামনে রেখে, জাপান ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজকে তাড়িয়ে ইংরেজের শূন্য স্থান দখল করে বসবে। তাই রাজনীতির ব্যবসায়ে নেতাজীকে অর্থ-সাহায্য করতে তারা প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু নেতাজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একান্ত স্পষ্ট করে সর্ব্ব-প্রথমেই জাপানকে জানিয়ে দিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা জাপানের ব্যবসায়ের পণ্য নয়। এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক প্রবাসী ভারতবাসীকে জানিয়ে দিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রত্যেক ভারতবাসীর সজাগ আত্মদানেই অর্জ্জন করতে হবে। যে অমূল্য জিনিষ আমরা পাবার জন্যে উদগ্রীব হয়েছি, উপযুক্ত মূল্য দিয়েই তাকে পেতে হবে। এবং তার উপযুক্ত মূল্য হলো, নিজেকে দেওয়া, নিজেকে সমগ্রভাবে দেওয়া, নিজের সর্ব্বস্বকে দেওয়া। বিশাল জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বল্লেন, আমি ডাকছি তাকেই, যে দিতে পারবে নিজেকে সর্ব্বরিক্ত করে, ফকীর ক'রে।

ভারতবর্ষের গত কয়েক যুগের রাজনীতিতে কোন নেতাই এমনি ভাবে জনতাকে আহ্বান করেন নি···এমন বলিষ্ঠভাবে তার সর্ব্বস্ব চান নি। ভীরু দোদুল্যমান জনতার কাছে স্বাধীনতার এই পূর্ণগ্রাসী দাবীকে এমন দুঃসাহসিকতায় আর কেউ তুলে ধরেন নি। চরম দুঃসাহসিকের মতন নেতাজী বল্লেন, তুমি দাও তোমার সর্ব্বস্ব···আমি দেবো মৃত্যু···না হয় স্বাধীনতা।

ইংরেজের জেল ভর্ত্তি করা নয়, দিনে এক ছটাক সুতো কাটা নয়, পুকুর থেকে প্রতিদিন দশ মুঠি কচুরীপানা ধ্বংস করা নয়, আধবেলা উপবাস দেওয়া নয়, ধোপা নাপিতের সঙ্গে বসে খাওয়া নয়, মিহি কাপড়ের বদলে ঠেঙ্গো খদ্দর পরা নয়, নেতাজী চাইলেন, সর্ব্বস্ব…

এবং তার বিনিময়ে দিলেন, মৃত্যুর আশ্বাস।

মাঝখানে নেই ফাঁকির এতটুকু অবকাশ।

এই হলো স্বাধীনতার আহ্বান, দুর্লভ পাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্জ্জয়ের আহ্বান। বাইরে নয়, ভেতরে, যেখানে আসলে মন হয়ে আছে ছোট, ভীরু, অলস ; যেখানে জাতি হয়ে আছে পঙ্গু, দুর্ব্বল, যেখানে রয়েছে নিজের তৈরী ছোট বড় হাজার রকমের শৃঙ্খল, এ আহ্বান হলো সেই ভেতরকার বন্ধন-মোচনের আহ্বান। পরম বস্তুর জন্যে চরম আহ্বান। এ আহ্বানের সাড়ায় যে আলো জেগে ওঠে সে হলো আকাশ-বিস্তারী সূর্য্যের আলো, ঘরের কোণের প্রদীপের ছায়াময় আলো নয়।

নেতাজীর কণ্ঠে আমরা শুনেছি সেই স্বাধীনতার আহ্বান। সর্ব্বস্ব দেওয়ার আহ্বান। পরম আহ্বান।

তাই সেদিন দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে যারা শুনলো সে-আহ্বান, যারা সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে উঠলো, তাদের জীবনে আমরা দেখলাম, মানব ইতিহাসের পরম বিস্ময়েরই অকস্মাৎ প্রকাশকে। অতি-সাধারণ নিমেষে হয়ে উঠলো অসাধারণ। সিঙ্গাপুরের সেই জনসভা থেকে কোহিমার রণপ্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত, সেই কয়েকটি মাসের ইতিহাসে দেখলাম মানব-জীবনের এক মহা-কাব্যকে। অতি তুচ্ছ প্রতিদিনকার ঘটনা একটি মানুষের অন্তরের দিব্য স্পর্শে হয়ে উঠলো কাব্যের মত নিত্যকালের মহিমায় মণ্ডিত। দুঃখ, বেদনা, অভাব, আঘাত, এমন কি মৃত্যুও সেই প্রাণ-পরিবেশের মধ্যে হারালো তার তিক্ত বিভীষিকা। যা ছিল অসাধ্য, তা হয়ে উঠলো সহজসাধ্য, স্বাভাবিক। প্রতিদিনের জীবনের চারদিকে ফুটে উঠলো রূপকথার মায়া। প্রতিদিনের বাস্তব জীবনে যা অসম্ভব, দুরূহ, রূপকথার জীবনে তা অনায়াসে হয় সম্ভব, সহজ। পেছনে ফিরে দেখি, নেতাজীর জীবনের সেই ক'টি মাসের

ঘটনাকে ঘিরে রয়েছে সেই রূপকথার আলোক-মণ্ডল, যে রূপকথার জগতে পাথরের নুড়ি নিমেষে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, ফুল অনায়াসে পরিণত হয়ে যায় আলোকবিহারী অপ্সরীতে, শত যোজন দূরের মানুষ ইচ্ছামাত্র এসে বসে পাশে। দেখলাম, কৃপণকে তেমনি অনায়াসে হয়ে যেতে মহাদাতা, চিরসংশয়ী ভীরুকে দেখলাম নিমেষে মৃত্যুর টুঁটি টিপে ধরতে, চির-বিলাসীকে দেখলাম আনন্দে হাঁটতে কঙ্করপথে, ভাগ করে নিতে সকলের সঙ্গে দুঃখের শাকান্ন। বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায়, আনন্দে।

যে শক্তি আমাদের মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে, তা জাগলে যে কি হতে পারে, তারি একটা প্রকাশ সেদিন নেতাজীর জীবনকে কেন্দ্র করে আমরা দেখলাম আজাদ হিন্দ অভিযানে।

আমাদের ইতিহাসের সম্ভাবনার একটা খণ্ড প্রকাশ। কল্পনা নয়, বাস্তব অভিব্যক্তি।

১২৮

আজাদ হিন্দ্ অভিযানে নেতাজী তাঁর সঙ্গীদের যে-সংগ্রামে আহ্বান করেন, সে-সংগ্রাম হলো দুমুখী সংগ্রাম। একটী যুদ্ধের মধ্যে দুটি যুদ্ধ।

একটি যুদ্ধ ইংরেজের বিরুদ্ধে, আর একটি যুদ্ধ হলো নিজেদের বিরুদ্ধে। নিজের আলস্যের বিরুদ্ধে, নিজের ভীরুতার বিরুদ্ধে, নিজের স্বার্থবুদ্ধি আর লোভের বিরুদ্ধে, নিজের প্রাদেশিক-বুদ্ধি আর আত্মতৃপ্তির বিরুদ্ধে। প্রথম যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী প্রত্যেক ভারতবাসীকে, প্রত্যেক আজাদ হিন্দ সৈনিককে সেই দ্বিতীয় যুদ্ধেও প্রণোদিত করেন। কারণ, তিনি জানতেন, ভারত-বাসীর কাছে এই দুই যুদ্ধই সমান প্রয়োজনীয়। তাই তাঁর প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক আচরণে, বর্ত্তমান ভারত-ইতিহাসের এক মহাসত্যকে জীবন্ত করে তুলে ধরেছিলেন, এ অভিযান শুধু ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা নয়, এ হলো নিজেকে স্বাধীন ভারতের যোগ্য করে তোলার অভিযান।

আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রতিদিন যে মর্ম্মান্তিক চরিত্রহীনতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার একমাত্র কারণ হলো, আমরা আমাদের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করেছি বটে কিন্তু তার অনুসঙ্গী দ্বিতীয়

যুদ্ধ থেকে কাপুরুষের মতন পশ্চাৎবর্ত্তন করেছি।' সেই দ্বিতীয় যুদ্ধ এখনও আমাদের সামনেই রয়েছে কিন্তু সেখানে কোথায় আমাদের সেনাপতি ?

১২৯

তাই নেতাজী যেদিন আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি সম্পূর্ণ শূন্য অবস্থা থেকেই প্রত্যেক ভারতবাসীর সজাগ চেষ্টায় সেই রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হন। এবং রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন যা সেই অর্থ, তিনি প্রত্যেক প্রবাসী ভারত-বাসীর কাছেই দাবী করলেন।

তাঁর সেই দাবীর প্রত্যুত্তরে প্রবাসী ভারতবাসীরা বিস্ময়কর-ভাবে সাড়া দিয়ে উঠলো। প্রত্যেক প্রবাসীর মনের অর্গল যেন নিমেষে তাঁর আহ্বানে খুলে গেল। নিজের সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে যে চায়, সেই পারে মানুষের মনের আগল ভাঙতে।

সেদিন দক্ষিণ এশিয়ায় সিঙ্গাপুরে, জাভায়, মালয়ে, ইন্দো-চীনে, প্রবাসী ভারতীয়দের জীবনে নেতাজীর সংস্পর্শে যে ভাবের উন্মাদনা অকস্মাৎ জেগে উঠে, মানুষের ইতিহাসে অনুরূপ উন্মাদনা কচিৎ কখনো ঘটে।

যে মানুষ প্রতিবেশীকে বঞ্চনা করে, বন্ধুকে বঞ্চনা করে, এমন কি নিজেকে বঞ্চিত করে তিল তিল করে সঞ্চয় করেছে অর্থ, অর্থ-লোলুপতা ছাড়া জীবনে যার আর কিছু ছিল না, সে-ও সেদিন নেতাজীর আহ্বানে বিনা দ্বিধায় নিজের হাতে খুলে দিল সিন্দুকের ডালি···নিজেকে রিক্ত করে করলো দান। পুরনারীরা একটি একটি করে গা থেকে খুলে দিল সমস্ত স্বর্ণ-অলংকার···কেরাণী, দোকানী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, যার যা ছিল সঞ্চয় ছুটে এলো নেতাজীর হাতে তুলে দেবার জন্যে।

নেতাজীর সেই অমর উক্তি, "করো সব্ নিচাওয়ার্, বনো সব্ ফকীর"—"সর্ব্বস্ব দিয়ে হও ফকীর", অক্ষরে অক্ষরে সত্য করে তোলেন বহু ধনী, বহু ব্যবসায়ী···তাঁদের আজীবনের সমস্ত সঞ্চয় নেতাজীর হাতে তুলে দিয়ে আনন্দে।

অর্থ-সংগ্রহের জন্যে নেতাজী ঝড়ের মতন দক্ষিণ এশিয়া পরিভ্রমণ করে বেড়ান। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতার পর, অর্থের আবেদন

করেন। সে এক দৃশ্য! ব্যক্তিগতভাবে নেতাজীর হাতে তাঁদের সর্ব্বস্ব দেবার জন্যে শত শত লোক সভার পর লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এক একজন করে এগিয়ে এসে নেতাজীর হাতে সমর্পণ করেন তাঁদের যা দেয় এবং এই রকম এক একটি সভায় সংগৃহীত হতো ১ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা।

তারপর হয় সভায় ফুলের মালার নীলাম। সভায় নেতাজীর গলায় যে-ফুলের মালা দেওয়া হতো, প্রকাশ্য-নীলামে তাকে বিক্রী করা হতো। একটি ফুলের মালা এক লক্ষ টাকা থেকে দর উঠতে উঠতে দশ লক্ষ টাকায় বিক্রী হয়ে যায়।

মানুষের ইতিহাসে একটা ফুলের মালার দাম দশলক্ষ টাকা ক্বচিৎ কখনো হয়।

ক্বচিৎ কখনো প্রতিদিনের বাস্তব জগতের সীমানা যায় রূপকথার জগতের সীমানার মধ্যে হারিয়ে। অপরূপ হয়ে ওঠে প্রতিদিনের তুচ্ছ জীবন।

এক পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী এক সভায় পাঁচ লক্ষ টাকায় সর্ব্বোচ্চ দরে কিনে নেয় গলার মালা। সারারাত সেই মালা বুকে করে জেগে থাকে। প্রভাতে শুকিয়ে আসে মালার ফুল। বুকে জড়িয়ে বসে থাকে ব্যবসায়ী সেই শুকনো ফুলের মালা।

আর এক সভা। শত শত লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন একজন করে নেতাজীর হাতে দিয়ে যাচ্ছে, তাদের যা দেবার। হাজারের নীচে কারুরই দানের সংখ্যা নয়। বহুক্ষণ পরে শেষ হয়ে আসে লাইন। সর্ব্বশেষে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসে এক বৃদ্ধা কুলী-কামিন্, সর্ব্বাঙ্গে ছেঁড়া ময়লা কাপড়। সামনে বেদীতে বসে নেতাজী, পাশে শাহ নওয়াজ। দুজনেই উঠে দাঁড়ান। অবাক হয়ে সেই ছিন্নবাসা বৃদ্ধার দিকে চেয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে কম্পিত-হস্তে ছেঁড়া কাপড়ের আঁচল থেকে বৃদ্ধা তিনখানি ময়লা এক টাকার নোট বার করে নেতাজীর সামনে তুলে ধরে।

যে-দেহ বৃটিশ বেয়নেটে কাঁপেনি, কেঁপে ওঠে সেই পাথরের দেহ।

নেতাজীর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না। নেবেন কি, নেবেন না, ঠিক করতে পারেন না। অতিকষ্টে বলেন, মাঈজী, ও টাকা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও!

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর অশ্রুতে ভেঙ্গে পড়ে। বৃদ্ধা বলে, বিশ্বাস কর, নেতাজী, এ ছাড়া আমার আর কিছু নেই।

বৃদ্ধার ধারণা, কম বলে বুঝি নেতাজী ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

বৃদ্ধার কথায় সহসা নেতাজীর চোখ ফেটে প্রবল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। নীরবে নেতাজী হাত বাড়িয়ে দেন। আনন্দে সেই ময়লা তিনখানি নোট নেতাজীর হাতে দিয়ে বৃদ্ধা চলে যায়।

নেতাজীর দিকে ফিরে শাহ নওয়াজ জিজ্ঞাসা করেন, আপনি বুড়ীকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন কেন? আর কাঁদছেনই বা কেন?

নেতাজী বলেন, জীবনে অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান আমাকে করতে হয়েছে কিন্তু এমন কঠিন সমস্যায় আমি আর পড়ি নি। যখন ভাবলাম, ঐ তিনটে টাকা হলো ঐ ভিখারী রমণীর যথাসর্ব্বস্ব, তার অসহায় জীবনের বহুদিনের উপবাস ও-র সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে, আমি কি করে সে টাকা নিই? তারপর মনে হলো, যদি ফিরিয়ে দিই, তাহলে ও ভাববে, গরীব বলে বুঝি আমি ও-র দান নিলাম না। সকলের মত ও-র মনেও সাধ জেগেছে, যথাসর্ব্বস্ব ও দেবে! তখন আর না নিয়ে পারলাম না। আজ পর্য্যন্ত আমি যা কিছু পেয়েছি, এই ভিখারী নারীর এই তিনটি টাকা রইলো তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্য হয়ে।

আজাদ হিন্দ সরকার যখন সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুণে স্থানান্তরিত হলো, নেতাজী স্থির করলেন, আজাদ হিন্দ সরকারের নিজস্ব ব্যাঙ্ক থাকা দরকার, কারণ এখন দরকার হবে কাগজের মুদ্রার। ব্যাঙ্ক ছাড়া কাগজের মুদ্রার প্রচলন অসম্ভব।

রেঙ্গুণের এক মুসলমান ব্যবসায়ী, গণি মিঞার বাড়ীতে নেতাজী চা-পানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। গণি মিঞা রেঙ্গুণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন।

চা-পান করতে করতে গণি মিঞা লক্ষ্য করলেন, নেতাজী চিন্তান্বিত, গম্ভীর।

জিজ্ঞাসা করলেন, নেতাজী, আপনাকে এত চিন্তান্বিত দেখছি কেন?

নেতাজী বলেন, ভাবছি আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের কথা। ব্যাঙ্ক না হলে আর চলে না। কিন্তু ব্যাঙ্ক চালাবার মতন টাকা কোথায় আমাদের?

গণি মিঞা জিজ্ঞাসা করেন, কত টাকা হলে ব্যাঙ্ক আরম্ভ হতে পারে?

নেতাজী বলেন, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পেলে আপাতত ব্যাঙ্ক আরম্ভ করা যায়।

গণি মিঞা বলে ওঠেন, এর জন্যে আপনি ভাবছেন? আমি এখুনি আপনাকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিচ্ছি আর কুড়ি লক্ষ এক সপ্তাহের মধ্যেই জোগাড় করে দিচ্ছি।

দশ মিনিটের মধ্যে আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্কের পত্তন হয়ে গেল। এবং ব্যাঙ্ক খোলার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে টাকা আসতে লাগলো। আজাদ হিন্দ সরকার নির্ভাবনায় নিজেদের নোট ছাপাতে লাগলেন এবং বাজারে সেই নোট জাপানী নোটের মতনই মর্য্যাদায় গৃহীত হলো।

এবং আজাদ হিন্দ্ সরকারের পরিচালনায় ব্যাঙ্ক এমন সুন্দর ভাবে চলতে থাকে যে, অল্পকালের মধ্যে তিন জায়গায় তার তিনটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হলো এবং অন্য পাঁচটি শহরে শাখা খোলবার জন্যে আয়োজন চলতে লাগলো। কিন্তু যুদ্ধের শেষের দিকের ক্রমান্বয় বিপর্য্যয়ে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

যুদ্ধ যতই ঘোরালো হয়ে উঠতে লাগলো, ততই অর্থ-সঙ্কট দেখা দিতে লাগলো। যুদ্ধের 'সমস্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে নেতাজীকে অর্থ-সংগ্রহের দুশ্চিন্তায়ও বিব্রত থাকতে হতো কিন্তু কোনদিনই তিনি তার জন্যে জাপানের কাছে ভিক্ষুকের মতন হাত বাড়ান নি।

যুদ্ধের শেষের দিকে হঠাৎ একবার বিশেষ অর্থ-সঙ্কট দেখা দিলো। নেতাজী স্থির করলেন, সিঙ্গাপুর থেকে সেই অর্থ তিনি সংগ্রহ করবেন। সেই উদ্দেশ্যে বিমানে সিঙ্গাপুরে যাবার জন্যে রেঙ্গুণের বিমান-ক্ষেত্রে এলেন। সেখানে তাঁকে সী-অফ করবার জন্যে রেঙ্গুণের ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এসেছে।

বিমানে ওঠবার আগে তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ করছেন। হঠাৎ মিঃ চেটিয়ার জিজ্ঞাসা করলেন, মাফ করবেন নেতাজী, হঠাৎ আপনি এমন চিন্তান্বিতভাবে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন কেন?

নেতাজী বলেন, বিশেষ অর্থসঙ্কটে পড়েছি। অবিলম্বে ফৌজের জন্যে কুড়ি লক্ষ নগদ টাকার দরকার। তাই সিঙ্গাপুরে যাচ্ছি।

নেতাজী প্লেনে গিয়ে বসলেন। এঞ্জিন গোলমালের দরুণ প্লেন ছাড়তে দশ মিনিট দেরী হয়ে গেল।

প্লেন ছাড়বার আগে হঠাৎ মিঃ চেটিয়ার প্লেনে গিয়ে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং হাসতে হাসতে বল্লেন, আপনাকে আর সিঙ্গাপুরে যেতে হবে না! কুড়ি লক্ষ টাকার জোগাড় হয়ে গিয়েছে।

নেতাজী প্লেন থেকে নেমে আসেন।

আরব্যোপন্যাসের আলাদীনের গল্পের মতন শোনায়। কিন্তু এই পৃথিবীতে আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

১৩০

এক বছরের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ রাষ্ট্র এবং সেই সঙ্গে এক বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তুলে, নেতাজী ১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুণে তাঁর সামরিক হেডকোয়ার্টার থেকে ভারত-অভিযানের আদেশ দিলেন। জাপ সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতায় আজাদ হিন্দ বাহিনী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ভারত-আক্রমণের জন্যে ভারত-বর্ম্মার পার্ব্বত্য অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হলো।

এবং এই প্রথম আক্রমণের বেগ এমন তীব্র হয় যে, ইংরেজ-আমেরিকান সৈন্যেরা বিপর্য্যস্ত হয়ে তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে প্রত্যা-বর্ত্তন করতে বাধ্য হয়…এক মাসের মধ্যে সেই দীর্ঘ দুরধিগম্য পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করে বিজয়-গর্ব্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের মাটিতে এসে পদার্পণ করে।

নেতাজীর প্লান অনুযায়ী পালেন-টামু রাস্তা ধরে গান্ধী ব্রিগেড অগ্রসর হয়ে আসে, অপর দিক থেকে কালাদান উপত্যকা আর হাকা-কালাম অঞ্চল ছাড়িয়ে বসু বিগ্রেড এসে মিলিত হয়। তাদের পেছনে আসে নেহরু আর আজাদ ব্রিগেড। সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য-কারী হিসাবে এগিয়ে আসে জাপ-বাহিনী।

১৮ই মার্চ্চ আজাদ হিন্দ বাহিনী শাহ নওয়াজের নেতৃত্বে বর্ম্মার সীমান্ত ত্যাগ করে ভারতে মণিপুরে প্রবেশ করে। বিপুল জয় হিন্দ্ ধ্বনির মধ্যে শাহ নওয়াজ স্বাধীন ভারতের মাটিতে প্রোথিত করেন ত্রিবর্ণ রঞ্জিত স্বাধীন ভারতের পতাকা

সেইখান থেকে সুরু হলো, সেই বিষম পার্ব্বত্য অঞ্চলে, এক পর্ব্বত শৃঙ্গ থেকে আর এক পর্ব্বত-শৃঙ্গে এগিয়ে যাবার কঠিনতম সংগ্রাম।

সমতল ক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে এই ঘন জঙ্গলময় পার্ব্বত্য অঞ্চলের যুদ্ধ সম্পূর্ণ বিপরীত। সম্পূর্ণ অপরিচিত পথহীন এই পার্ব্বত্য অঞ্চলের যুদ্ধ নির্ভর করে অসামান্য রণ-প্রতিভার ওপর। আজাদ হিন্দ বাহিনীকে পেছনে যে ঘন জঙ্গলময় পার্ব্বত্য-অঞ্চলকে অতিক্রম করে আসতে হয়েছে, রণ-নীতির দিক থেকে সেই অঞ্চলকে সুরক্ষিত করে রাখার ওপর নির্ভর করে অগ্রবর্ত্তী বাহিনীদের অস্তিত্ব; কারণ যুদ্ধের, বিশেষতঃ বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুদ্ধের জয়-পরাজয় ষোল আনা নির্ভর করে যোগাযোগের রাস্তার ওপর। এবং বর্ম্মার সীমান্তের এই পার্ব্বত্য অঞ্চলের যোগাযোগ নির্ভর করে আছে মাত্র দু'একটা বড় রাস্তার ওপর। এই রাস্তা থেকে বিছিন্ন হয়ে গেলে অথবা এই রাস্তা ব্যবহারের সুযোগ বন্ধ হয়ে গেলে, অগ্রবর্ত্তী বাহিনীর জীবন নিমেষে বিপন্ন হয়ে উঠবে। তাই বর্ম্মার সীমান্তের এই যুদ্ধে নব গঠিত আজাদ হিন্দ্ বাহিনীকে প্রথম অভিজ্ঞতায় জগতের কঠিনতম এক যুদ্ধে ব্যাপৃত হতে হয়। এবং এই যুদ্ধে বিপুলতর শক্তির বিরুদ্ধে অতি সামান্য আয়োজনের মধ্যে আজাদ হিন্দ বাহিনী যে রণ-নৈপুণ্য আর বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং সেই সঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাদের সমরাধিনায়কের অসামান্য রণ-প্রতিভা। এই যুদ্ধে নেতাজী যে রণ-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন, সমর পরিচালকের যে শৌর্য্য, বীর্য্য, গঠন-শক্তি ও নেতৃত্বের আদর্শ রেখে গিয়েছেন, তাতে তিনি নিঃসংশয়ে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের সঙ্গে সমান আসন অধিকার করে আছেন। দুশো বছর ধরে ইংরেজরা আমাদের যে সামরিক-প্রতিভাকে সজ্ঞানে বিনষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল, নেতাজী হলেন তার দুরন্ত প্রতিবাদ। যে মাটীতে জন্মেছিল প্রতাপাদিত্য আর শিবাজী আর তাস্তিয়া টোপী, নেতাজীকে দেখে আমরা বুঝলাম, সে-মাটী আজও যায়নি অনুর্ব্বর হয়ে।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সামনেই মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল।

৩১শে মার্চ্চ ভীষণ যুদ্ধে ইংরেজদের বিপর্য্যস্ত করে আজাদ হিন্দ বাহিনী ইম্ফলের আট মাইল আগে ইম্ফল-কোহিমা সড়কের খানিকটা অংশ দখল করে নিলো।

আর কিছু দূরেই ভারতের সমতল ক্ষেত্র।

বৃটিশ-বাহিনীর মধ্যে জেগে উঠলো আত্মমর্য্যাদা রক্ষার দুর্দ্ধর্ষ পণ। বৃটিশের পক্ষে দুজন বিশ্ব-বিশ্রুত সেনাপতি, জেনারেল ষ্টিল-ওয়েল আর জেনারেল শ্লিম প্রমাদ গুণলেন। সমগ্র ইঙ্গ-আমেরিকান শক্তি তাঁরা বর্মা-ফ্রণ্টে সংহত করলেন। কি বিপুল বিশাল সমর-উপকরণ তাঁরা বর্মা-সীমান্তে সংহত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার পরিচয় আমরা পেলাম যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর। লক্ষ লক্ষ টাকার সমর-উপকরণ আজও পড়ে আছে গোপনে বর্মার সীমান্তে।

কিন্তু ভারতের সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশের মুখে সেই শেষ সংগ্রামে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভাগ্যলক্ষ্মী অকস্মাৎ হলেন বিমুখ। যুদ্ধ-ধারা সহসা গেল বদলে এবং সমস্ত ব্যাপার আজাদ বাহিনীর প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়ে উঠলো। স্বয়ং প্রকৃতি সেই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের হলেন প্রধান নায়িকা।

সেই বন্ধুর পার্ব্বত্য অঞ্চলে, পথহীন অরণ্য-ভূমির মধ্যে সহসা নেমে এলো দুরন্ত পার্ব্বত্য বর্ষা। সেই সুযোগে অসাধারণ প্রতিভা-শালী রণ-নেতা জেনারেল ষ্টিলওয়েল অসামান্য শৌর্যবলে পেছন দিক থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর যোগাযোগের রাস্তা করে দিলেন বিচ্ছিন্ন। রসদের অভাবে মাছি মশার মতন মরতে লাগলো আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্য। রসদের অভাবে তারা গাছের পাতা খেয়ে বুনো ফল খেয়েও টিকে ছিল। এমনি ছিল তাদের দুর্দ্ধর্ষ পণ, নেতাজীর কাছে তারা শপথ গ্রহণ করেছে, মৃত্যু দিয়েও সে-শপথ রাখবে তারা। কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে উঠলো সেই সঙ্কট-লগ্নে জাপানীদের বিশ্বাসঘাতকতা আর বিমুখতা। জাপানীরা তখন নিজেদের জন্যে এত ব্যস্ত আর উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো যে তারা ভুলে গেল আজাদ বাহিনীর প্রতি তাদের কর্ত্তব্যের কথা। ভুলে গেল একান্ত নির্ম্মমভাবে এবং নীচভাবে।

শাহ নওয়াজের সামরিক ডায়েরীর পাতায় দেখা যায় কি দ্রুতভাবে জাপানের এই পরিবর্ত্তন ঘটতে থাকে।

১১ই ফেব্রুয়ারী—বুকিত তিওয়া পাহাড়ের যুদ্ধে জয়লাভের পর জাপানের প্রধান সেনানায়ক মোতোগুচির সঙ্গে দেখা করলাম। মোতোগুচি খুব সহানুভূতি দেখালেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী—নেতাজীর অভিনন্দন পেলাম। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ—জয় হিন্দ্।

তার প্রায় দেড় মাস পরে।

৩০শে মার্চ্চ—বুবি (চর) কেনেডি শৃঙ্গ থেকে ফিরে এসেছে। সে যে বিবরণ দিল, রীতিমত আশঙ্কাজনক। জাপানীরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ক্রাক-রেজিমেণ্টগুলিকে কুলি হিসাবে ব্যবহার করছে। * * এই এক-তরফা সহ-সমৃদ্ধির পরিণতি কোথায় তাই ভাবছি। কালই এ সম্বন্ধে মীমাংসা করতে যাবো।

তার দু'মাস পরে

৭ই জুলাই—আমাদের সৈন্যদের আহার্য্য সরবরাহ হচ্ছে না। চারজন গাড়োয়ালী অনশনে মারা গিয়েছে। বাধ্য হ'য়ে আহার-সরবরাহের উন্নতির জন্যে হিকারী কিকানের দ্বারস্থ হলাম। তাদের বিন্দুমাত্র লক্ষ্য আছে বলে মনে হলো না। আমাদের সৈন্যদের এইভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে অনশনে রাখার পেছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, বুঝতে পারছি না।

এক সপ্তাহ পরে

১৫ই জুলাই—অনশনে মাছি-মশার মতন সৈন্যরা মরছে। অনেকে খাদ্যাভাবে আত্মহত্যা করছে। জাপানীরা কোনরকম সাহায্য দিচ্ছে না।

৮ই আগষ্ট—জাপানী সেনানায়ক বলে পাঠিয়েছে, আমাদের যে-সব সৈনিক পীড়িত হ'য়ে চিকিৎসার অভাবে প'ড়ে আছে, তাদের আত্মহত্যা করা উচিত।

শাহ নওয়াজের ডায়েরী থেকে বোঝা যায়, সঙ্কটলগ্নে জাপান কি জঘন্যভাবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে পরিত্যাগ করলো···রসদের অভাবে, যোগাযোগের অভাবে, নির্দ্দিষ্ট ও প্রতিশ্রুত সমর-উপকরণের অভাবে নেতাজীর সমস্ত প্ল্যান বিপর্য্যস্ত হ'য়ে গেল। তবুও শপথ অনুযায়ী আজাদ হিন্দ-ফৌজ সংগ্রাম ক'রে চল্লো······কিন্তু সর্ব্বশেষ

আঘাত এলো ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভেতর থেকে......বিশ্বাস-ঘাতকতার রূপে .....

শেষ-যুদ্ধের সেই নিদারুণ কঠোরতা সহ্য করতে না পেরে, একদল লোকের ধারণা হলো, এ-যুদ্ধে ইংরেজদের জয় অবশ্যম্ভাবী... ইংরেজদের ক্রমাগত প্রচার-কার্য্যের প্রভাবে তারা গোপনে দলত্যাগ ক'রে ইংরেজদের কাছে প্রাণের বিনিময়ে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অবস্থানের মর্ম্মান্তিক গোপন সংবাদ বিক্রী করতে লাগলো...

যুদ্ধ এবং রাজনীতির ব্যাপারে ইংরেজ ভারতবর্ষে বরাবরই একটি অস্ত্রকে ব্রহ্মাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে এসেছে এবং বহু অভিজ্ঞতায় সেই অস্ত্রের প্রয়োগে অসীম পারদর্শিতা লাভ করেছিল...সে অস্ত্র হলো, বিশ্বাসঘাতকতা।

আজাদ হিন্দ্ অভিযানের ফলে বর্ম্মা আর ভারতের সীমান্তে বিরাট পার্ব্বত্য দুরধিগম্যতার মধ্যে যে-সব পার্ব্বত্য উপজাতিরা এতদিন সভ্যতার সম্পর্ক থেকে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছিল, সহসা তাদের জীবনে এলো এক মহা-আলোড়ন। নেতাজী তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভায় সেই পার্ব্বত্য উপজাতিদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা আনবার বিপুল চেষ্টা করেছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সহায় ও বন্ধুরূপে বহু পার্ব্বত্য-জাতির নায়কের প্রত্যক্ষ সহযোগিতাকে অর্জ্জন করেছিলেন। সেই সব পার্ব্বত্য-নায়কদের সহযোগিতায় নেতাজী সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে পার্ব্বত্য উপজাতিদের নিয়ে এক গেরিলা ও গুপ্তচর-বিভাগ গড়ে তোলেন। নেতাজীর এই প্রভাবকে প্রতিরুদ্ধ করবার জন্যে ইংরেজরাও অজস্র অর্থব্যয়ে এই পার্ব্বত্য-জাতিদের গুপ্তচরের কাজে নিয়োগ করবার চেষ্টা করে। তার ফলে সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন সেই পার্ব্বত্য আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এক বিস্ময়কর চাঞ্চল্য জেগে ওঠে, সংবাদ বেচা-কেনার এক অভিনব ব্যবসা মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে। দুই পক্ষই তাদের সাহায্যে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহে তৎপর হয়ে ওঠে। যুদ্ধের পর আংশিকভাবে জানা যায়, এই কাজের জন্যে ইংরেজকে একটা স্বতন্ত্র বিভাগ খুলতে হয়েছিল এবং সেই বিভাগ থেকে হিসাবহীন কি অজস্র টাকাই না খরচ করা হয়েছিল। নেতাজীর

অবশ্য সে-অর্থসঙ্গতি ছিল না। তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছিল, তাঁর আদর্শবাদের শক্তির ওপরই।

যখন কাগজের অভাবে আমাদের তালপাতার যুগে ফিরে যেতে হচ্ছিল, সেই সময় ইংরেজরা নিয়মিত এরোপ্লেন থেকে লাখে লাখে মুদ্রিত হ্যাণ্ডবিল আর পুস্তিকা গারো আর মিস্‌মি পাহাড়ের জঙ্গলের ভেতর ছড়িয়ে চলেছিল। সেইসব কাগজে ইংরেজদের পক্ষ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের কাছে স্পষ্ট আবেদন করা হতো, তারা যেন অবিলম্বে তাদের দলত্যাগ করে চলে আসে কারণ এ-যুদ্ধে ইংরেজদের জয় অবশ্যম্ভাবী। সেই যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য থাকতো নানারকমের প্রলোভনের প্রতিশ্রুতি। এই ক্রমান্বয়ে প্রচারকার্য্যের ফল যুদ্ধের শেষদিকে, যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ রসদ আর অস্ত্রের অভাবে বিপন্ন, তখন ফলতে থাকে। লক্ষ আদর্শানুগত লোকের মধ্যে একজন যদি বিশ্বাসঘাতক তৈরী হয়, তাহলে সেই একটি লোকই যা ক্ষতি করতে পারে, লক্ষ লোকের আত্মত্যাগ তা নিবারণ করতে পারে না।

সেই পার্ব্বত্য-যুদ্ধের মধ্যে, অবস্থানের বন্ধুরতার জন্যে ইংরেজ-সৈন্যেরা বেয়নেট কিম্বা বাঁশের মাথায় বড় বড় প্লাকার্ড টাঙিয়ে ট্রেঞ্চের ওপার থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে তুলে ধরতো, তাতে অবশ্য লেখা থাকতো, দল ত্যাগের উপদেশ। তার প্রত্যুত্তরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকেরা ঠিক তেমনি ভাবে উঁচু করে তুলে ধরতো নেতাজীর ছবি।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার শক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে নেতাজীর এতটুকুও সন্দেহ ছিল না। ভারতে ইংরেজ আধিপত্যের মোড়ে মোড়ে, নেতাজী দেখেছেন, এই গুপ্ত-সর্পের বিষ-ফণা। তাই সেই সমরক্ষেত্রের মধ্যেও নেতাজী এই বিষস্পর্শ থেকে তাঁর সঙ্গীদের রক্ষা করবার জন্যে রীতিমত একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই ব্যবস্থা থেকে বোঝা যায়, কি অসামান্য ছিল এই লোকটির কর্ম্মশক্তি, কি নিশ্ছিদ্র ছিল তাঁর গঠন-প্রতিভা। এবং বাঙালীর জাতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য স্বরূপ তাঁর প্রত্যেক ব্যবস্থার পেছনে দেখা যায় একটা কালচারের রূপ, একটা শিল্পীমনের প্রকাশ। সেই নিদারুণ যুদ্ধের মধ্যেও আজ তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

আই-এন্-এ বিচারের সময় ইংরেজ পক্ষ থেকে সেই সময়কার নেতাজীর একটি হুকুম-নামা আদালতে উপস্থিত করা হয়। হুকুম-নামাটি হলো,

"হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ !

কাপুরুষতা আর বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরের ঘৃণা আর বিতৃষ্ণাকে প্রকাশ করবার জন্য আমরা স্থির করেছি, প্রত্যেক আজাদ হিন্দ্ শিবিরে একটা দিন নির্দ্দিষ্ট থাকবে, যেদিন সেই শিবিরের সৈনিকেরা নিজেদের চেষ্টায় একটা উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন। এই উৎসবে প্রত্যেক শিবিরের সাধারণ সৈনিক আর সেনা-নায়ক সমান ভাবেই যোগদান করবেন।

এই উৎসবের অনুষ্ঠানকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে প্রত্যেক শিবিরকে আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে এবং অনুষ্ঠানের কার্য্যসূচী এবং বিষয়-বস্তু প্রত্যেক শিবিরের সৈনিকেরা নিজেদের রুচিমত গড়ে তুলবেন।

ভীরুতা আর বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কবিতা, রচনা ও আবৃত্তি থাকবে।

এই মর্ম্মে বিশেষভাবে ছোট ছোট নাটিকা রচনা ক'রে শিবিরের সৈনিকেরা অভিনয় করবেন।

যে-সব বিশ্বাসঘাতক আমাদের দল ছেড়ে চলে গিয়েছে (বিরাজ, মদন, সারবারী, দে, মহম্মদ বক্শ ইত্যাদি) তাদের নামে কার্ডবোর্ড, ঘাস বা মাটি দিয়ে জঘন্য জন্তুর মূর্ত্তি তৈরী করে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের শেষে, তাদের বিরুদ্ধে অন্তরের ঘৃণা ও আক্রোশকে রূপ দিতে হবে।

অতীত ভারতের বীর-পুরুষদের জীবন নিয়ে গাথা তৈরী করে গাইতে হবে এবং আজাদ হিন্দ্ বাহিনীতে যাঁরা বীরত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে অভিনন্দিত করতে হবে।

প্রত্যেক অনুষ্ঠান জাতীয় সঙ্গীত ও সমবেত জয়ধ্বনিতে শেষ হবে।

যে শিবির সব চেয়ে ভাল অনুষ্ঠান করতে পারবে, তাকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করা হবে।

স্বাক্ষর—সুভাষচন্দ্র বসু

সর্ব্বাধিনায়ক আজাদ হিন্দ্ ফৌজ"

১৩ই মার্চ্চ, ১৯৪৫, নেতাজী এই সম্পর্কে আর একটি স্পেশাল "অর্ডার অফ্ দি ডে" জারী করেন। তা' থেকে বোঝা যায়, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ থেকে যারা বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারা তাদের নেতার অন্তরে কি তীব্র আঘাত হেনেছিল। জয়-পরাজয়ের বাইরে নেতাজীর চরম লক্ষ্য ছিল যাতে তাঁর আজাদ হিন্দ্ বাহিনী ভারতবর্ষ এবং জগতের সামনে বৈপ্লবিক দলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবীয় আদর্শকে প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে পারে। যে-চরিত্রের অভাবে ভারতবর্ষ ভেতর থেকে পঙ্গু ও দুর্ব্বল, নেতাজীর চরম লক্ষ্য ছিল যাতে তাঁর এবং তাঁর সন্তানের জীবন থেকে ভারতবর্ষ সেই চরিত্রের সন্ধান পায়, যাতে করে তাঁদের জীবন ও সাধনা নিষ্কলুষ শুভ্রতায় এবং নিশ্ছিদ্র আদর্শনিষ্ঠায় বর্ত্তমান ভারতের সামনে এক উন্নততর জীবনের বাস্তবতাকে তুলে ধরতে পারে।

সেই জন্যে নেতাজী স্পষ্ট ভাবে সেই হুকুমনামায় জানালেন, আমার আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে আমি চাই নিশ্ছিদ্র মানুষের ফৌজ করে গড়ে তুলতে। তাই আমি শেষ বারের মতন প্রত্যেক আজাদ হিন্দ্ সৈনিককে সুযোগ দিচ্ছি যদি কারুর মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ থাকে, বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকে, তা হলে আজ থেকে আমি সাত দিন সময় দিচ্ছি, এই সাত দিনের মধ্যে তিনি বা তাঁরা নির্ব্বিবাদে ফৌজ ত্যাগ করে চলে যেতে পারেন, তার জন্যে কেউ তাঁদের কিছু বলবে না, বা তাঁদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিই প্রয়োগ করা হবে না—কিন্তু সাত দিনের পর যদি ফৌজের কাউকে বিন্দুমাত্র সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করা হয়, তাহলে আমার হুকুম, সেই মুহূর্ত্তে তাকে গুলি করে বধ করা হবে।

এই হুকুমনামার শেষে সুভাষচন্দ্র অগ্নিময়ী ভাষায় ঘোষণা করেন, "for a member of revolutionary army there is no crime more heinous and despicable than to be a coward or a traitor."

"বিপ্লবী সৈনিকের কাছে ভীরুতা আর বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে জঘন্য মারাত্মক পাপ আর কিছু নেই।"

১৩১

ইম্ফলের দ্বার-প্রান্তে এসে থেমে গেল আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগমন···

দুরন্ত পার্ব্বত্য বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাপানীদের অকস্মাৎ পশ্চাদ্‌বর্ত্তন আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের অগ্রগামী দলকে একেবারে বিপন্ন করে তুল্লো ···রসদ নেই, অস্ত্রের সরবরাহ নেই···পেছনের সঙ্গে কোন সংযোগ নেই···সামনে ইংরেজ আর আমেরিকান সৈন্যদের বিপুল সংহত শক্তির প্রচণ্ড আক্রমণ···

সূচ্যগ্র মেদিনীর দখল নিয়ে ষ্টালিনগ্রাদে রেড আর্ম্মির সৈনিকদের অপরূপ বীরত্বের কাহিনী আজ কবিতায়, গল্পে, অভিনয়ে, সিনেমায় জগতে খ্যাত হয়েছে কিন্তু সেদিন কোহিমার প্রান্তরে দলভ্রষ্ট অসহায় মুষ্টিমেয় আজাদ হিন্দ্‌ সেনিকেরা সমস্ত বিরোধিতার বিরুদ্ধে নিজেদের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে যে সংগ্রাম করে, তার কাহিনীকার আজও তারা পায় নি, কোনদিন হয়ত পাবেও না, জগতের বহু অলিখিত মহিমার মত বিস্মৃতির সাগরতলে হয়ত তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যাবে।

কিন্তু সেই বিষম সংগ্রামের মধ্যে আমরা দেখলাম মানুষের অন্তর-শক্তির মহিমা, দেখলাম আদর্শবাদীর প্রাণশক্তির ঐন্দ্রজালিক বিভূতি, দেখলাম আদর্শ-নিষ্ঠা মানুষের মধ্যে বিকশিত করে তুলতে পারে কি দুর্ল্লভ দেবত্ব। দেখলাম, একটী ভারতীয় মনের পরিপূর্ণ বিকাশ···দেখলাম, অনশন, অনটন, আঘাত আর মৃত্যুর পটভূমিকায় জয়-পরাজয়ের উর্দ্ধে অপরাজেয় মানুষকে···দেখলাম, আমার জাতির সমগ্র সম্ভাবনার রূপ একটী মানুষের চরিত্রে···দেখলাম নেতাজীকে···

সেদিন সেই ভয়াবহ বিরূপ অবস্থার মধ্যে, চারিদিকের ঘনায়মান নিরুৎসাহতার মধ্যে, অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের ক্রমবর্দ্ধমান দুর্ল্লক্ষণের মধ্যে, আকাশ থেকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বর্ষিত গর্জ্জমান মৃত্যুর মধ্যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকেরা উৎসাহের জন্যে, শক্তির জন্যে, প্রেরণার জন্যে চেয়ে ছিল একমাত্র তাদের নেতাজীর দিকে···নেতাজীর প্রদীপ্ত চরিত্র, নেতাজীর প্রত্যেকটী আচরণ, প্রত্যেকটী কর্ম্ম তাদের অন্তরে এনে দিয়েছিল সেই সুদুর্ল্লভ

বিশ্বাসকে, যুক্তিহীন বিচারহীন যে বিশ্বাসের বলে মানুষ জয় করে সর্ব্ব ভয়কে, মৃত্যু-ভয়কে।

শুধু মুখের কথায়, বক্তৃতায়, নীতি-বাক্যের উচ্ছ্বাসে নয়, নিজের প্রত্যেকটী আচরণে, প্রত্যেকটী কাজে, চরিত্রের প্রত্যেক অভি-ব্যক্তিতে, সুভাষচন্দ্র সেদিন তাঁর নিজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রত্যেক অনুচরকে উন্নীত করে তুলেছিলেন মনুষ্যত্বের এক বিস্ময়কর উচ্চতম স্তরে। সেই মৃত্যু-পথ-যাত্রায় তাদের পাশে থেকে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাদের সঙ্গে সমানে ভাগ করে নিয়ে দুঃখের অন্ন, বিপদের বিভীষিকা, সুভাষচন্দ্র রেখে গিয়েছেন নেতৃত্বের এক অভিনব আদর্শ। সেই মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে বার বার মৃত্যুর মুখোমুখি তাঁর উদাসীন নির্ভীকতাকে দেখে, তাঁর অনুচরদের মনে জেগে ওঠে তাঁর সম্বন্ধে এক অলৌকিক বিশ্বাস। .যেদিন আজাদ হিন্দের সৈনিক আর সেনা-নায়কেরা যুদ্ধাপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে আবার ফিরে এলেন আমাদের মধ্যে, সেদিন তাঁদের প্রত্যেকের মুখে, নেতাজীর নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি সেই অলৌকিক বিশ্বাসের, সেই সুগভীর ভালবাসার নিঃসংশয় চিহ্নকে।

অকস্মাৎ মাথার ওপর আকাশ থেকে বিমান বহর বোমা বর্ষণ করতে থাকে...আবক্ষ কাদায় আর বর্ষার জলে দাঁড়িয়ে সর্ব্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র নিজে ট্রেঞ্চ থেকে আহত সৈনিকদের একে একে অপ-সারণ করবার ব্যবস্থা তদারক করছেন···

সেনা-নায়কেরা কাতরে তাঁকে অনুরোধ করে, অবিলম্বে সেল্-টারে চলুন···নইলে এখুনি বোমায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন......

সামনে, পাশে, পেছনে সরবে আকাশ থেকে বোমা ফেটে পড়ে···

নির্ভীক, নিশ্চল দাঁড়িয়ে সর্বাধিনায়ক। সমস্ত কাতরতার উত্তরে স্থির কণ্ঠে বলেন, শেষ আহত সৈনিকটী নিরাপদে স্থানান্তরিত না হলে, তিনি কিছুতেই নিজের প্রাণরক্ষার জন্যে সেখান থেকে সরে যাবেন না...

সে-প্রস্তর-মূর্ত্তির দিকে চেয়ে সেনানায়কেরা আর অনুরোধ করতে পারেন না। এই রকম ঘটনা ঘটে একবার নয়, বহুবার।

বনের মধ্যে আহত সৈনিকদের জন্যে অস্থায়ী হাসপাতাল

গড়ে তোলা হয়েছে। সর্ব্বাধিনায়ক প্রতিদিন হাসপাতালে এসে প্রত্যেক আহত সৈনিককে নিজে পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁর ছায়া বিছানায় এসে পড়লে আহত সৈনিক নিজেকে ধন্য মনে করে, তার বিশ্বাস হয় অচিরেই সে সেরে উঠবে, চুম্বন করে সেই ছায়াকে পরম শ্রদ্ধায়।

এমন সময় সেই হাসপাতালকে ঘিরে সুরু হয় বোমাবর্ষণ। প্রত্যেক কর্মী হয়ে ওঠে সজাগ নেতাজী সামনে দাঁড়িয়ে। তারা ভুলে যায় নিজেদের বিপদের কথা। অচঞ্চলভাবে একে একে স্থানান্তরিত করে রোগীদের শেষ রুগীটি স্থানান্তরিত হলে তবে সেখান থেকে সরে যান সর্ব্বাধিনায়ক।

দুঃসাহসিকের দুর্জ্জয় বিশ্বাসে বলেন, ইংরেজের হাতে এমন বোমা নেই, যাতে তিনি আহত হতে পারেন।

তাঁর এই নির্ভীক কর্ম্মনিষ্ঠা, মৃত্যু-উদাসীনতা সংক্রমিত হয়ে যায় অনুচরদের মধ্যে।

ছোট্ট অস্থায়ী হাসপাতাল। প্রায় পঞ্চাশ জন আহত সৈনিক আছে। হাসপাতালের অধিনায়িকা হলেন ঝাঁসির রাণী-বাহিনীর বেলা দত্ত। অকস্মাৎ সুরু হয় বোমা-বর্ষণ। কাছেই ফাটতে থাকে বোমা। কেঁপে কেঁপে ওঠে হাসপাতাল। নির্ভীক নারী একে একে সমস্ত আহত সৈনিকদের স্থানান্তরিত করতে থাকেন। এমন সময় সোজা হাসপাতালের ওপর সুরু হয় বর্ষণ। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায় হাসপাতাল। পড়ে থাকে চুণ সুরকী আর ইটের স্তূপ।

বর্ষণ থেমে গেলে সৈনিকেরা সেই ভগ্নস্তূপ সরিয়ে দেখে, পড়ে আছে তার তলায় কার্য্য-রত নারীর অচৈতন্য দেহ।

পর্য্যবেক্ষণ করতে বেরিয়েছেন সর্ব্বাধিনায়ক। দেখেন, শীতে কাঁপছে একজন আহত সৈনিক। তার গায়ে নেই কোন জামা। তৎক্ষণাৎ নিজের গা থেকে কোট খুলে পরিয়ে দেন তাকে।

নিদারুণ খাদ্যাভাব। রসদ আসার পথ পর্য্যন্ত গিয়েছে বন্ধ হয়ে। মজুত আছে যতটা রুটি, কালো পাউরুটি, রেশন করে প্রত্যেক সৈনিকের জন্যে দেওয়া হয়েছে, প্রতিদিন লোক পিছু দু'টুকরো রুটি।

শিবির থেকে রণ-ক্ষেত্রে যাবার জন্য সুভাষচন্দ্র পরেন সেনাপতির পোষাক। হঠাৎ নজরে পড়লো, তাঁর রেশন-ব্যাগ। দেখেন, তাতে একখানা আস্ত শাদা পাউরুটি।

তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠান, শিবিরের খাদ্য পরিচালককে।

—আমার রেশন-ব্যাগে নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে কে রেখেছে একখানা পুরো রুটি ?

খাদ্য পরিচালক কাতরভাবে জানায়, নেতাজী, আপনি হলেন আমাদের সব। অন্তত একখানা পুরো রুটি না খেলে আপনার শরীর থাকবে কি করে ?

নেতাজী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'আমার সৈনিকেরা যদি দু'টুকরো কালো রুটী খেয়ে যুদ্ধ করতে পারে, তুমি কি ভাবো আমি তা পারি না ? যে-নিয়মে সব সৈনিক বাঁধা, আমিও সেই নিয়মে বাঁধা।

দু'টুকরো কালো রুটী ব্যাগে নিয়ে যাত্রা করলেন সর্ব্বাধিনায়ক।

যুদ্ধের সেই সুকঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে, অনিবার্য্য হৃদয়হীন নৈর্ব্যক্তিতার মধ্যে, শিবিরের জীবনে যে কেউ এসেছে তাঁর সংস্পর্শে, নেতাজী অগাধ স্নেহের ব্যক্তিগত স্পর্শে তাকে করেছেন পরমাত্মীয়।

কি কোমল গৃহগত-প্রাণ-ভারত-নারী! নেতাজী তাদের টেনে এনেছিলেন সেই ঘরের স্নেহ-মায়া থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রাণহীন মৃত্যুর কঠোরতায়! কিন্তু ঝাঁসির রাণীর প্রত্যেক নারী সৈনিক, যখনি ব্যক্তিগত ভাবে এসেছে সংস্পর্শে, পেয়েছে পিতার স্নেহ, পিতার ব্যাকুল অনুরাগ।

গভীর রাত্রি···সংবাদ পেলেন ঝাঁসির রাণী বাহিনীর এক নারী-সৈনিক আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল...সকালে সে খবর পেয়েছে তার স্বামীর মৃত্যুর···স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে যোগদান করে এই যুদ্ধে। তৎক্ষণাৎ নেতাজী নিজে সেই নারীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পিতার মত স্নেহে ব্যথিতা নারীকে সান্ত্বনা দিলেন। গোপনে দুজন নারী সৈনিককে আদেশ দিলেন, সর্ব্বদাই তার কাছাকাছি থাকতে।

শিবিরে প্রায়ই তিনি সেনানায়কদের আমন্ত্রণ করে আনতেন।

তখন আর তিনি সর্ব্বাধিনায়ক নন্। স্নেহবিগলিত গৃহস্বামী। নিজে তাদের হাতে জল ঢেলে দিতেন, তাদের জন্যে তোয়ালে হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকতেন, বন্ধুর মত, একান্ত আপনার জনের মত।

তাঁর সর্ব্বব্যাপ্ত মন, যুদ্ধের শত দুশ্চিন্তার মধ্যেও, তাঁর অনুচরদের সুখশান্তির কথা এতটুকু ভুলতো না। সেনাপতি হয়ে তিনি যেমন রণ-ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করতে যেতেন, তেমনি নিয়মিত যেতেন শিবিরে শিবিরে রান্নাঘরে, নিজে দাঁড়িয়ে পর্য্যবেক্ষণ করতেন রান্না। সামান্য ব্যাপার কিন্তু অসামান্য তার সার্থকতা।

তাই জীবনে ভুলবো না সে-দৃশ্য, যখন আমাদের মধ্যে ফিরে এসে, বহু যুদ্ধের যোদ্ধারা, নেতাজীর নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে বালকের মতন কেঁদেছেন। জানি না, জগতের আর কোন সেনাপতি, তাঁর সৈনিকদের কাছ থেকে এমন অযাচিত ভালবাসা পেয়েছেন কি না।

সেই সঙ্গে ভাবি, জগতের আর কোন সেনাপতিকে এমন দুরূহ ও বিচিত্র দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল কি না···বর্ত্তমান যুদ্ধের ক্ষমাহীন নৃশংসতার মধ্যে তিনি টেনে নিয়ে এসেছিলেন, একান্ত কোমলা ভারত-নারীকে এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধ-ঐতিহ্য-বিস্মৃত বালকদের।

আজাদ হিন্দ অভিযানে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা থেকে বোঝা যায়, তিনি শুধু যুদ্ধের সাময়িক প্রয়োজনে সেই বিরাট অভিযান গড়ে তোলেন নি, তাঁর সেই অভিযানের পেছনে ছিল ভারতবর্ষের সামগ্রিক চরিত্র-বোধকে উন্নত করবার অন্যতর একটা উদ্দেশ্য। তিনি জানতেন, স্বাধীনতা পাওয়া এক জিনিস, স্বাধীনতাকে উপভোগ করা আর এক জিনিস। আজকে স্বাধীন ভারতে যে চারিত্রিক অরাজকতা প্রতিদিনই বেড়ে উঠেছে, তাঁর দূরদৃষ্টিতে তিনি নিশ্চয়ই তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই নারী, পুরুষ ও বালক, তিন স্তরের ভিতর দিয়েই তিনি একটা আদর্শবান জীবনের উদাহরণ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তাঁর বাহিনীর সৈনিকদের স্বাধীন ভারতের আদর্শ নাগরিকের মডেলরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই বাল-সেনা গঠনের ভেতর দিয়ে স্বাধীন ভারতের কিশোর-কিশোরীদের জীবনে স্বাধীন অস্তিত্বের নবতর চেতনাকে জাগাতে চেয়ে-

ছিলেন। আজাদ হিন্দ্ অভিযানে তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনার আড়ালে লুকিয়ে আছে, স্বাধীন ভারতের বহু পথের নির্দ্দেশ।

কোন সাময়িক অথবা সামরিক খেয়ালের বশে তিনি ঝাঁসির রাণী বাহিনী কিম্বা বালসেনা গঠন করেন নি। এই দুই বিচিত্র সমর-বাহিনী গঠনে স্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁর দৃষ্টি বহু দূর এগিয়ে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে প্রসারিত ছিল। আমাদের দেশের বাল্য-শিক্ষার নিদারুণ দুরবস্থা সম্বন্ধে তাঁর কোন ভ্রান্তি ছিল না। তাই বালক-কাল থেকেই স্বাধীন দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করবার উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যেই—তিনি বাল-সেনার পরিকল্পনাকে সৃষ্টি করেন এবং টোকিওতে তাদের নিয়মিত শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্যে তিনি একটা স্বতন্ত্র cadet school-এরও বন্দোবস্ত করেন।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণ-অধিকারের সময় রুশ কিশোর-কিশোরীরা গেরিলা-যুদ্ধে যে কিভাবে তাদের দেশকে সেবা করেছে, তার বিস্ময়কর কাহিনী আজ সোভিয়েট সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হয়ে আছে। নেতাজীর অধীনে এই বাল-সেনার বালক-যোদ্ধারাও তাদের অগ্রজদের সঙ্গে থেকে তাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুরূপ দায়িত্ব পালন করেছে। বর্ম্মার পাহাড়ে আর জঙ্গলে তাদের কিশোর প্রাণের বহু মহিমা বুনো ফুলের মতন ঝরে শুকিয়ে পড়ে আছে। কে তার কাহিনী লেখে?

কি সুগভীর পিতৃ-স্নেহে নেতাজী এই বাল-সেনার দলকে অভিসিঞ্চিত করেছিলেন, বোঝা যায়, যখন দেখি, নেতাজীর নির্দ্দেশে হাসতে হাসতে মৃত্যুঞ্জয়ী এই বালকেরা জেনে শুনে নিজের পিঠে মাইন বেঁধে শত্রুর ব্যূহের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে!

আজ আমি, আমার চারদিকে রয়েছে যেসব কিশোর কিশোরী, সিনেমা দেখবার জন্যে যারা এক ঘণ্টা রাস্তায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে উদ্বুদ্ধ করছি সেই নামহীন অমর বালকদের আত্মাকে!

নেতাজীর প্রেরণায় সেদিন বর্ম্মার পার্ব্বত্য জঙ্গলে নামহীন সেই কিশোরের দল সংবাদ-পত্রের ঘোষণার বাইরে, ইতিহাসের স্বীকৃতির বাইরে, যে শৌর্য্য, বীর্য্য আর দেশ-প্রেমের পরিচয় দিয়ে

গেল, হয়ত তার বিবরণ কোন দিন প্রচারিতও হবে না কিন্তু তাদের সেই বিস্ময়কর অভিব্যক্তির মধ্যে স্বাধীন ভারতের কৈশোরের মহা-সম্ভাবনার রূপ অগ্র-বিকশিত হয়ে রইলো। যাদুকরের স্পর্শের মতন নেতাজীর আদর্শের স্পর্শে পুষ্পহীন অরণ্যের মধ্যে অকস্মাৎ বর্ণে, সুষমায়, সৌরভে বিকসিত হয়ে ওঠে কিশোর প্রাণের সেই ক'টি অম্লান ফুল।

১৩২

বর্মার সীমান্তের যুদ্ধে ইংরেজ আর আমেরিকানদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, সুভাষচন্দ্র…সেই পলাতক দুর্বিনীত বিপ্লবীকে বন্দী করা।

গুপ্তচর আর বিশ্বাসঘাতকদের কাছ থেকে সব চেয়ে চড়া মূল্যে তারা কিনতে রাজী ছিল একটী সংবাদ, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবস্থান।

বারবার সেই সীমান্ত-যুদ্ধে অকস্মাৎ বিমান থেকে তাঁর অবস্থান-শিবিরকে ঘিরে হয়েছে বোমা-বর্ষণ কিন্তু প্রত্যেক বারই শত্রুর আক্রমণ তাঁর পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে, তাঁকে সরাসরি স্পর্শ করতে পারে নি। বারবার এই বিস্ময়কর নিষ্কৃতির ফলে, আজাদ হিন্দ সৈনিকদের ধারণা হয়, নেতাজীর জীবন দৈব রক্ষিত।

আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ ছাড়াও, সামনাসামনি প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে হত্যা করারও বহু চেষ্টা হয়। বর্ম্মার সীমান্তের সেই পার্ব্বত্য জঙ্গলের হিংস্র শ্বাপদদের মতন বহু-রক্তব্যবসায়ী হিংস্র নর-ঘাতক তাঁর রক্তের জন্যে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রত্যেক বারই তাদের চেষ্টা সফল হবার মুখে কোন না কোন দৈব-বাধায় ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। বারবার মৃত্যু তাঁর সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে…তার উষ্ণ বিষ-নিঃশ্বাস প্রত্যক্ষভাবে তাঁর অঙ্গকে ঝলসে দিয়ে গিয়েছে…

বর্ম্মার যুদ্ধের সময় তাঁর বাস-ভবনের সামনে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা থাকতো। দু'দল রক্ষীর ওপর এই পাহারার ভার ছিল। একদল যথারীতি ইউনিফর্ম পরে পাহারা দিত, আর একদল সাধারণ নাগরিকের মতন অসামরিক পোষাকে পাহারা দিত। প্রত্যেকের কাছেই অবশ্য রিভলভার থাকতো।

তাছাড়া বাড়ীর বাইরে পাঁচ জন করে রক্ষী সাধারণ পোষাকে

টহল দিত, বাড়ীর ভেতরের প্রাঙ্গণে থাকতো আটজন রক্ষী। এই রক্ষীদলের নায়ক ছিলেন বিশ্বম্ভর দাস বাহাদুর।

সেদিন অন্ধকার রাত্রি ; ঘোর অন্ধকার। রাত প্রায় এগারোটা বাজে। রক্ষী বদল হবার সময়। যথারীতি একদল রক্ষী ব্যারাকে চলে গেল, তার জায়গায় ব্যারাক থেকে আর একদল রক্ষী এলো।

হঠাৎ বিশ্বম্ভর দাসের মনে সন্দেহ হলো, এই রক্ষী বদলের সময় অন্ধকারে বাইরে থেকে কোন লোক ভেতরের প্রাঙ্গণে যেখানে রক্ষী সেনাদের শিবির, সেখানে প্রবেশ করেছে।

তৎক্ষণাং গেট বন্ধ করে দিয়ে বিশ্বম্ভর দাস প্রাঙ্গণের সৈন্যদের লাইন দিয়ে দাঁড়াতে আদেশ দিলেন। আদেশ মাত্রই প্রাঙ্গণের রক্ষীদল লাইন দিয়ে দাঁড়ালো। বিশ্বম্ভর দাস একে একে তাদের রোল-কল করেন। দু'জন লোক একই নাম আর একই সংখ্যা বল্লো। তৎক্ষণাৎ বিশ্বম্ভর দাস তাদের গ্রেফতার করবার হুকুম দিলেন। নিমেষের মধ্যে লোক দুটি রিভলভার বার করে ছুড়তে আরম্ভ করে দিল এবং পালাবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না।

শব্দ শুনে নেতাজী বারান্দায় বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার ?

দেখলেন, অন্ধকারে দুটি লোকের চক্ষু হিংস্র শ্বাপদের মতন তাঁর দিকে চেয়ে জ্বলছে।

সেদিন থেকে রক্ষী নিবাসের ওপর আরো কড়া নজরের ব্যবস্থা হলো।

একজন দু'জন করে দলত্যাগীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

সেই মাসেই···তেমনি অন্ধকার আর এক রাত্রিতে, বিশ্বম্ভর দাস গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, কথা বলছেন একজন রক্ষীর সঙ্গে। হঠাৎ অন্ধকারে একটা বৃহৎ মোটর লাগলো। মোটর থেকে সামরিক পোষাকে একজন সম্ভ্রান্ত লোক নামলেন, দেখতে ঠিক রাসবিহারী বসুর মতন···অন্ধকারে পার্থক্য ধরা দুরূহ।

একান্ত পরিচিতের ভঙ্গীতে লোকটি সোজা গেটের দিকে পা বাড়ালো···রাসবিহারী বলে বিশ্বম্ভর দাসের স্পষ্ট প্রত্যয় হলো··· তবুও সামরিক নিয়মের মর্য্যাদায় নিয়মনিষ্ঠ বিশ্বম্ভর দাস পথ আটকালেন, নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

লোকটি গম্ভীরভাবে জবাব দিলো, রাসবিহারী বসু। টোকিও থেকে আসছি…নেতাজীর সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করা দরকার।

নিয়মনিষ্ঠ সৈনিক নিয়ম মত লোকটিকে অপেক্ষা করতে বল্লেন। বল্লেন, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি নেতাজীকে খবর দিচ্ছি।

এই বলে বিশ্বম্ভর দাস ভিতরে চলে গেলেন। নেতাজীকে বল্লেন, রাসবিহারী বসু দেখা করতে এসেছেন।

নেতাজী স্থিরকণ্ঠে বল্লেন, এখুনি গ্রেপ্তার কর…এইমাত্র বেতারে তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো…

বিশ্বম্ভর ছুটে এসে দেখেন, লোক নেই, মোটর নেই।

যে ভাগ্য কলকাতা থেকে তাঁকে মরু-পর্ব্বত, গহন প্রান্তর পার করিয়ে, দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়ে এনেছিল বর্ম্মার সীমানায়, ভারতের প্রবেশ-দ্বারে, তাঁর জীবনের কামনার মোক্ষ-ধামের দ্বারে… সেই দ্বার-প্রান্ত থেকে সে ভাগ্য-লক্ষ্মী ফিরে গেল আবার।

অকস্মাৎ যুদ্ধের ধারা গেল বিপরীত হয়ে।

প্রকৃতি আর মানুষ, উভয়ই হলো বিরূপ।

সে-বিরূপতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ক্রমশ নিরর্থক হয়ে উঠতে লাগলো।

পেছন দিকে যোগাযোগের লাইন থেকে বিচ্যুত হয়ে, রসদহীন অস্ত্রহীন আজাদ হিন্দ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো…

দলত্যাগীদের গুপ্ত সংবাদের ফলে অতর্কিত আক্রমণে গোপন ঘাঁটি বিধ্বস্ত হতে থাকে…

অভিজ্ঞ সেনাপতি অগ্রসর হবার লগ্ন যেমন জানেন, তেমনি জানেন প্রত্যাবর্ত্তনের লগ্ন। অসম্ভব বিরোধিতার বিরুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী অকারণ লোকক্ষয় নিবারণ করাই উপযুক্ত সেনাপতির অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য।

অসীম বেদনায় সর্ব্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেন, এসেছে সেই প্রত্যাবর্ত্তনের লগ্ন…

সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে সশরীরে এসেছেন ফ্রন্টে… সীমান্তের রণক্ষেত্রে।

সমস্ত শক্তি সংহত করে করেন শেষ চেষ্টা। ইম্ফলের চারিদিকে

গড়ে তোলেন আজাদী সৈনিকের লৌহ-বেষ্টনী…সামনেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে মৃত্যু-আহবে…সমস্ত প্ল্যান তার তৈরী…

এমন সময় একদিন রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে গোপনে আজাদী সৈনিকদের লাইন থেকে বেরিয়ে গেল বিশ্বাসঘাতক লেফ্‌টেন্যাণ্ট সিং…মিথ্যা অজুহাতে করলো শেষ-শান্ত্রীকে বিভ্রান্ত। অন্ধকারে মশালের হাত-ছানিতে এগিয়ে মিশে গেল শত্রুর লাইনের ভেতর…

ভোর না হতেই সুভাষচন্দ্র জানতে পারলেন। বিশ্বাসঘাতক সিং তার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে আজাদী সৈন্যদের অবস্থান-মান-চিত্র, প্ল্যানের বিবরণ…একান্ত গূঢ় সব সংবাদ…

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুভাষচন্দ্র বদলে ফেল্লেন সমস্ত প্ল্যান… সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন গোলা-বারুদের গুদাম…

কিন্তু তার চেয়ে দ্রুত এগিয়ে এলো বিশ্বাসঘাতকতার আক্রমণ …ঝড়ের মতন চারদিক থেকে বেষ্টন করে এলো বিপক্ষের বিমানবহর…আকাশ ফেটে পড়তে লাগলো বোমা…

সর্ব্বাধিনায়ক আদেশ দিলেন, রিট্রিট।

আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনীর পশ্চাদ্‌বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ আর আমেরিকান সৈন্যরা জেনারেল শ্লিমের অধিনায়কত্বে বিপুল বিক্রমে বর্ম্মা আক্রমণ করলো…একটার পর একটা যুদ্ধে জাপ-সৈন্যদের পরাজিত করে শ্লিমের ইতিহাস-খ্যাত চতুর্দ্দশ বাহিনী ক্রমশ রেঙ্গুণের দিকে এগিয়ে চল্লো…

মাঝখানে পড়ে বিপর্য্যস্ত আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনী বিভিন্ন ছোট ছোট দলে অসহায়ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো…

১৯৪৫, ২৩শে এপ্রিল, জাপ-সেনাপতি সমস্ত জাপানী সৈন্যদের নিয়ে দ্রুত রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করে গেলেন। রেঙ্গুণের ভারতীয় নাগরিকরা একদিকে ইংরেজ সৈন্য অপর দিকে বর্ম্মার দস্যুদের নির্ম্মম অত্যাচার, তার মাঝখানে অসহায়ভাবে পড়ে রইলো। দ্রুত আগুয়ান চতুর্দ্দশ বাহিনীর গোলা রেঙ্গুণে এসে পড়তে লাগলো।

তখনও নেতাজী রেঙ্গুণে। অসহায় ভারতীয়দের জীবন ও সম্মান রক্ষা করবার ভার একজন আজাদ বাহিনীর ওপর দিয়ে সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুণ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

ইংরেজ আর আমেরিকান বাহিনী দ্রুত আসছে রেঙ্গুণের দিকে, বন্দী করতে দুর্বিনীত বিপ্লবীকে।

বিদায়ের দিন আজাদ হিন্দ সৈনিকদের আহ্বান করে সুভাষচন্দ্র বলে গেলেন, গত এক বছর ধরে তোমরা যে বীরত্ব দেখিয়েছ, পরাজয়ে তা ম্লান হয়ে যাবে না। যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায়ে আমরা পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করলাম কিন্তু এখানেই জয়-পরাজয়ের শেষ কথা নয়, যুদ্ধের শেষও এখানে নয়। এখনো সামনে আছে বহু সংগ্রাম, তারই প্রস্তুতির জন্যে আমি ফিরে যাচ্ছি আবার।

...পরাজয় আমাকে নিরাশ করে না। আমি যোদ্ধা, আশা আমার চিরসঙ্গী। আমি বিশ্বাস করি, আমরা আবার প্রস্তুত হয়ে নবতর সংগ্রামে করবো জীবন উৎসর্গ, যতক্ষণ না পাই অন্তরের চির-ঈপ্সিত ধন, ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। ইন্‌কলাব্ জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ্!

বর্ম্মার রণ-ক্ষেত্র ত্যাগ করে বিমান চল্লো ফিরে সিঙ্গাপুরে।

ইংরেজ-বাহিনী রেঙ্গুণে প্রবেশ করে দেখলো, তাদের বেড়াজাল থেকে আবার পালিয়ে গিয়েছেন সুভাষচন্দ্র।

যে দুর্বিনীত শক্তি ইংরেজের সমস্ত বন্ধনকে তুচ্ছ করে কণ্টকিত করে তুলেছে ভারতে ইংরেজের অস্তিত্বকে, বন্ধনহীন মুক্ত রয়ে গেল সে-শক্তি।

সমগ্র আজাদ হিন্দ্ বাহিনী আর তার সেনানায়কেরা বাধ্য হয়ে ইংরেজের কাছে আত্ম-সমর্পণ করলো...

রাজদ্রোহীরূপে ইংরেজ বন্দী করে নিয়ে এলো নেতাজীর বীর অনুচরদের...শৃঙ্খল পরাতে পারলো না শুধু তাদের নেতাজীকে।

ভারতের স্বাধীন আত্মার প্রতীক রূপে নেতাজী রইলেন শৃঙ্খলহীন চিরমুক্ত।

দিল্লীর লাল কেল্লায় সুরু হলো ঐতিহাসিক বিচার। সামরিক বিচার।

কিন্তু প্রতিষ্ঠিত প্রভু-শক্তির আইনগত সমস্ত ক্ষমতাকে তুচ্ছ করে, সেদিন মানব-ইতিহাসের অভ্যস্ত ধারার অন্তরালে ঘটে গেল এক বিচিত্র ব্যাপার...পরাজিতের বিচার করতে গিয়ে বিজয়ীকেই শেষ-পরাজয় নিতে হলো পরাজিতের কাছ থেকেই।

জয়ী হলো নেতাজীর অপরাজেয় প্রাণ-শক্তিই। জাতির অন্তর-লোকে তার নিঃশব্দ মহা-প্রভাব ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ অধ্যায়কে করে তুললো দিব্য তেজে বহ্নি-মান...

সে-বহ্নি-স্পর্শে বিংশ শতাব্দীর ধূম্রল চিতায় ভস্মীভূত হয়ে গেল ভারতে ইংরেজ-শাসনের পুষ্পিত শব-দেহ।

সে আর এক কাহিনী।

অসমাপ্ত ব্রতের অন্তর্জ্বালা নিয়ে ফিরে এলেন সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে।

পরাজয় আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর হয়েছে। তাঁর নয়।

একদিন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ নিঃস্ব অবস্থা থেকে করেছিলেন যাত্রা সুরু, সেদিন তাঁর পৃথিবীতে ছিল শুধু তিনি, আর তাঁর অন্তরবাসী ইষ্টদেবতা...একটা রূপার কৌটার ভিতর ছিল সে-ইষ্ট-দেবতার মন্দির...সদা সর্ব্বদা সে কৌটা থাকতো তাঁর সঙ্গে...

আজ আবার নতুন করে সুরু হলো গোড়া থেকে সেই যাত্রা... সেই বিপুল বিশ্ব...সেই তিনি আর তাঁর ইষ্টদেবতা...

১৩৩

সিঙ্গাপুরে ইহুদী ধনকুবের মায়ারের প্রাসাদ। বর্ম্মা থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সেখানে শেষবার আমরা দেখি সুভাষচন্দ্রকে...

ইতিমধ্যে বিস্ময়কর দ্রুত ছন্দে বদলে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধারা...এক মহা-আকস্মিকতায় আলোড়িত হয়ে উঠলো বিশ্ব-মানবের চেতনা।

পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আমেরিকার স্বর্ণ-স্তূপ থেকে সৃজন করলো মানব-সভ্যতার ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন্‌কে...এটম্ বোম্...

সে-ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের একটা আঙ্গুলের চাপে মোমের পুতুলের মতন নিমেষে ভেঙ্গে দুমড়ে গেল জাপানের এশিয়া-ব্যাপী দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ...

ভীত, আতঙ্কিত জাপান নতজানু হয়ে আমেরিকার কাছে করলো আত্মসমর্পণ...

সুভাষচন্দ্র বুঝলেন, যাদের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন, তাদের সমস্ত শক্তি দুর্ব্বার বেগে ছুটে আসছে তাঁর দিকে...যে

কোন মুহূর্ত্তে তাঁর গতি হবে শৃঙ্খলিত…বিপুল বিশ্বে আজ অনাশ্রয় তিনি।

একদিন চতুর ইংরেজের সমস্ত সজাগ পাহারাকে তুচ্ছ করে তাঁকে কূট পরিকল্পনার আশ্রয়ে অনির্দ্দেশের পথে বেরুতে হয়েছিল …আজ আবার অনুরূপ কূট পরিকল্পনায় সৃজন করতে হবে সংগোপন অন্তরাল।

এবং আজ সে কাজ দুরূহতর, কঠিনতর।

এমন কোন রাষ্ট্র নেই, যেখানে তিনি নির্ভাবনায় আশ্রয় পেতে পারেন। এবং বসে ভাববারও সময় নেই…যে কোন মুহূর্ত্তে সিঙ্গাপুরে তিনি অবরুদ্ধ হয়ে পড়তে পারেন।

সিঙ্গাপুর ত্যাগ করবার আগের দিন শেষবারের মতন প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে তাঁর আশ্বাসবাণী রেখে যাবার জন্যে তিনি সিঙ্গাপুরের জাপানী বেতার-কেন্দ্রে উপস্থিত হলেন।

অকস্মাৎ দেখেন, সেখানকার জাপানী বেতার-কর্ত্তাদের মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে। নেতাজীর বক্তৃতাকে সেন্সর করবার জন্যে তারা আগে দেখতে চায়।

নেতাজী উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করেন। বুঝতে পারেন, আর এক দিনও এখানে থাকা নিরাপদ নয়। উপস্থিত জাপানী অফিসরদের জানান, তিনি টোকিও যাচ্ছেন, জাপ-সরকারের সঙ্গে জরুরী পরামর্শের জন্যে।

সেইদিন ভোর হতেই একখানি এরোপ্লেন সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে জাপানের দিকে যাত্রা করলো।

১৩৪

কয়েক দিন পরে রয়টার সংবাদ দিল, ফরমোসা দ্বীপের তাইহোকু বিমান-ঘাঁটি থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর ষ্টাফ অফিসর হবিবুর রহমানকে শুধু সঙ্গে নিয়ে যখন জাপানের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন, সেই সময় বিস্ফোরণের দরুণ সেই বোমারু প্লেন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মাটীতে পড়ে যায়।

হবিবুর রহমানের শুধু হাত আর মুখ পুড়ে যায় কিন্তু নেতাজীর

নাকি সমস্ত পোষাকে আগুন ধরে যায় এবং মাথায় কঠিন আঘাত লাগে। যার ফলে তিনি অচৈতন্য হয়ে যান।

সেই অবস্থায় ১৯শে আগষ্ট তাঁদের দুজনকেই হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং একই কক্ষে তাঁদের দুজনকে রাখা হয়।

দুজনের শয্যার মাঝখানে কিন্তু ছিল একটা পর্দার ব্যবধান।

হাসপাতালে নিয়ে আসবার ছ'ঘণ্টার পর নাকি নেতাজী মারা যান। তখন মধ্যরাত্রি।

হবিবুর রহমানের তখন জ্ঞান ফিরে এসেছে। তাঁকে খবর দেওয়া হলো, নেতাজী মারা গিয়েছেন। যদি ইচ্ছা করেন, তাঁর মৃতদেহ দেখতে পারেন!

যদি ইচ্ছা করেন!

হবিবুর রহমান উঠে পর্দার ওপারে গিয়ে দেখলেন, শাদা-চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা একটী মৃতদেহ…মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে একজন মাত্র প্রহরী।

এবং সংবাদে প্রকাশ যে, মৃত নেতার অন্তিমমূর্ত্তি সেইভাবে দেখে হবিবুর রহমান আবার ফিরে আসেন!

এই সংবাদের ওপর আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম জেনারেল মোহন সিং বলেন, নেতাজী মৃত…তাঁর মুখ না দেখে কোন আজাদী সৈনিক, বিশেষত হবিবুর রহমান যে সেইভাবে ফিরে আসতে পারে, এর চেয়ে অসম্ভব ব্যাপার জগতে আর কিছু নেই!

এবং আরো বিস্ময়কর কথা হলো, এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর মৃত্যু-সংবাদ মৃত্যু-দিনের পাঁচদিন পরে রয়টার জগতে ঘোষণা করে।

১৫৫

সেই ঘটনার পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন। নেতাজীর একদিনের সহকর্ম্মীরাই আজ ভারতের ভাগ্য-বিধাতা।

স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছেন, নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ সত্য।

অথচ বারংবার কাতর-অনুরোধ সত্ত্বেও, ভারতের জনসাধারণ আজও পর্য্যন্ত তার রাষ্ট্রের কাছ থেকে, তার রাষ্ট্রপরিচালকদের কাছ

থেকে, তাদের প্রিয়তম নেতার এই অন্তিম সংবাদের কোন নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ পায়নি।

যাঁরা এই সংবাদ সত্য বলে ঘোষণা করেছেন, কোন্ তথ্যের ওপর নির্ভর করে তাঁরা এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে সত্য বলছেন, তার কোন বিবরণই আজও পর্য্যন্ত তাঁরা দেন নি।

যদি সত্য বলেই তাঁদের বিশ্বাস হয়, তাহলে বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার যোদ্ধার শেষ-বিশ্রামস্থল আজ পাঁচ বৎসর অচিহ্নিত আছে কেন?

স্বাধীন ভারতবর্ষের কাছে তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধার এই কি শেষ প্রাপ্য?

মহাত্মা গান্ধীর দেহভস্ম ভারতের নগরে নগরে তীর্থে তীর্থে নদীতে নদীতে, দূর দুর্গম মানস-সরোবরের তীরে যাঁরা শ্রদ্ধায় বহন করে নিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা বীরপূজা করতে জানেন না, এ অপবাদ তাঁদের দেওয়া যায় না।

অথচ আজ পাঁচ বৎসরে তাঁরা সন্ধান নিয়ে উঠতে পারলেন না নেতাজীর দেহভস্মটুকু কোথায় আছে?

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-নায়কদের অন্তর-কথা আমরা জানি না, কিন্তু স্বাধীন ভারতের অগণন জনতার অন্তরের কথা আমরা জানি।

তারা বিশ্বাস করে না, তাদের নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ। বিশ্বাস করবার মত, কোন বাস্তব প্রমাণ আজও পর্য্যন্ত তারা পায় নি। এবং যতক্ষণ তা না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ ভারতের অগণন জনগণের অন্তরে প্রতিদিন সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অন্তরে এই মহৎ আশার সূর্য্য জেগে উঠবে, অস্তহীন রবির মতন একদিন আবার ফিরে আসবেন নেতাজী…ফিরে আসবে ভারতে, ভারতের মুক্ত কেশরী…প্রবাস থেকে ফিরে আসবে জননীর ক্রোড়ে জননীর প্রিয়-সন্তান…

ভারতের জনগণের অন্তরে আজ তাই জেগে আছেন মৃত্যুহীন নেতাজী, তাদের সমস্ত অপূর্ণ আশার প্রতীক হয়ে…

বাস্তবতার জগৎ থেকে আজ তিনি চলে গিয়েছেন রূপকথার

জগতে···মিশে গিয়েছেন জাতির অন্তরের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে···

নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ বহন করে আনেন ভারতবর্ষে, ব্যক্তিগত-ভাবে হবিবুর রহমান, কথিত বিমান-দুর্ঘটনায় তাঁর একমাত্র যাত্রা-সঙ্গী।

আই-এন্-এ বিচারে জেরার সময় ভুলাভাই দেশাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি বলেছেন, নেতাজী মৃত···তার কি প্রমাণ দিতে পারেন?

তার উত্তরে তখন হবিবুর রহমান শুধু বলেছিলেন, আমি সৈনিক। আমার ওপর যা আদেশ, আমাকে তাই-ই মেনে চলতে হয়।

আজ সমগ্র ভারত নির্নিমেষ বিস্ময়ে চেয়ে আছে নেতাজীর অসমাপ্ত জীবন-মহা-কাব্যের দিকে···

সে-মহা-কাব্যের শেষ-অধ্যায়ে লেখা হবে কোন্ স্বর্ণ-বাণী, কে তা জানে?